জাহ্নবী।

মাসিক পত্রিকা

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ
যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।"

প্রথম ভাগ।

১২৯১।৯২

কলিকাতা।

সিমুলিয়া শুকিয়া ষ্ট্রীট, নং ২০

বিজ্ঞান যন্ত্রে

শ্রীগণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯২ সাল।

প্রথম খণ্ড জাহ্নবীর সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
আদ্যাশক্তি	৬৪
আপ্তবাক	৪৯
ঈশ্বর ও ধর্ম্ম	১৬
ধর্ম্মশাস্ত্রের আবশ্যকতা	১৪৫, ১৯৯; ২২০
নিষ্কাম ধর্ম্ম	১২১
পরকাল ও আপ্তবাক্য	২৫
পাতঞ্জল দর্শন	১২৮
পৌত্তলিক ধর্ম্ম	৯১, ১৭২
পৌরাণিক সাকার উপাসনা	২৪১
মানবের উদ্দেশ্য ও নিষ্কাম ধর্ম্ম	৭৩
যোগ বা নিত্যানন্দ লাভেরউপায়	৬, ৪৩
বেদ অনাদি কেন ?	৯৭
বেদ রহস্য	১০, ৩৯, ৬৭, ১১১, ১৩৫, ১৬০, ১৬৯, ২৪৭, ২৬৫
শরীরের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ	১৯৩, ২১৭, ২৬৮
শাস্ত্র আন্দোলন	৪৫
শিব সংকীর্ত্তন	৮৯
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১১৪, ১৪০, ১৬৪, ১৭৯, ২১০, ২৩৭, ২৫৯
সাধন সঙ্গীত	৫
সুখ দুঃখ ও নিষ্কাম ধর্ম্ম	১০০
সূচনা	১

হিন্দু-ধর্ম্ম বিষয়ক আন্দোলন ৩৩

হিন্দু-ধর্ম্ম আন্দোলন বিষয়ে কয়েকটী কথা ৭০

হিন্দু-ধর্ম্ম ও নাস্তিকতা ২৫১, ২৭১

জাহ্নবী।

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ
যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে"
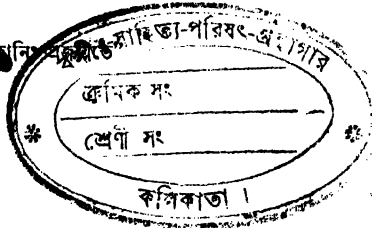
প্রথম ভাগ।] ১২৯১ [প্রথম সংখ্যা।

সূচনা।

আজি ঊনবিংশ শতাব্দী। পৃথিবীর আজি উন্নতির দিন। মানব এক্ষণে অত্যন্ত উন্নত। পশ্চিম ভূমির মানবগণের প্রতাপে আজি পৃথিবী কম্পিত। মানব আজি উন্নতিবলে সমস্ত অধীনতাশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়াছে। আজি মানব সম্পূর্ণ স্বাধীন। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভয়ানক জন্তু সকলও আজি মানবের ক্রীড়াসামগ্রী। জল, বায়ু, অগ্নি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি প্রাচীন দেবগণ আজি মানবের ভৃত্য। এক্ষণে মানব না করিতে পারে এমন কার্য্যই নাই। মানব এখন এত উন্নত ও এত স্বাধীন যে কোন রকম অধীনতা স্বীকার করিতে চায় না।

পিতা মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, আচার্য্য, রাজা, ধনী, বলবান কাহারও অধীন হইতে আজি মানব ইচ্ছুক নহে। পিতা মাতা আপন সুখ সম্ভোগ সাধন জন্য পুত্রোৎপাদন ও স্বাভাবিক স্নেহের বশবর্ত্তী বা ভবিষ্যৎ আশার অধীন হইয়া পুত্রের প্রতিপালন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে কেন? জ্যেষ্ঠভ্রাতা অগ্রে জন্মগ্রহণ করিয়া কিএমন

অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন যে তজ্জন্য তাঁহাকে সম্মান করিতে হইবে? আচার্য্য অর্থলাভ বা অন্যবিধ স্বার্থসাধনজন্য বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে মান্য করার আবশ্যক কি? রাজা হয় দস্যু, না হয় সাধারণের ভৃত্য, সুতরাং তাঁহার অধীনতা স্বীকার করা কখনই কর্ত্তব্য নয়। স্ত্রী ও স্বামী উভয়েই যখন আপনাপন সুখ সাধন জন্য মিলিত হইয়াছে, তখন স্ত্রী স্বামীর অথবা স্বামী স্ত্রীর মুখাপেক্ষা বা অধীনতা স্বীকার করিবে কেন? ইত্যাদি বাক্য আজি ঘরে ঘরে আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। আজি সকলেই সর্ব্বপ্রকার অধীনতা শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আজি মানবমনে স্বাধীনতাস্পৃহা এত বলবতী হইয়াছে যে, ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিতেও আজি মানব ইচ্ছুক নহে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানবের এইরূপ উন্নতি ঘোষিত হইতেছে; কিন্তু বাস্তবিক কি মানব এইরূপ উন্নত হইয়াছে? প্রত্যক্ষদর্শনে কি মানবের এইরূপ উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়? মানব কি এখন বড় সুখী হইয়াছে? সকলে কি বিনাক্লেশে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ ও ইচ্ছামত সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেছে? সত্য সত্যই কি মানব আজি পৃথিবীকে স্বর্গ ও আপনাকে দেবতুল্য করিয়াছে? আমাদের বোধ হয় এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কেন না আজি মানবের দুঃখ দেখিলে পাষাণও আর্দ্র হয়, মানবের আচরণে পশুরও মনে ঘৃণা জন্মে!

আজি মানব সিংহ ব্যাঘ্র হইতেও ভয়ানক হইয়াছে, বায়স শৃগাল হইতেও প্রতারক হইয়াছে, ভ্রমর মধুমক্ষিকা হইতেও মত্ত হইয়াছে। স্বার্থসাধন আজি মানবের প্রধান ব্রত। যে সুখলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য মানবের এই নীচতা সে সুখের আস্বাদ মানব এক দিনের জন্যও পায় না। শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া, প্রীতি, শান্তি, তৃপ্তি, সংযম, বিশ্বাস প্রভৃতি মানবহৃদয় হইতে এককালে উন্মূলিত হইয়াছে। স্বার্থপরতা, অবিশ্[illegible], ইন্দ্রিয় চরিতার্থতারূপ পশুত্ব এক্ষণে মানব হৃদয়ে লব্ধাধিকার হই[illegible]মানব এখন এতই আত্মানুরাগী হইয়াছে যে, নিজ সুখলালসা চরি[illegible]র জন্য পরের অনিষ্ট করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না, সুতরাং [illegible] কাহাকে বিশ্বাস

করে না, এমন কি, পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে বিশ্বাস করে না, স্বামী স্ত্রীকে ও স্ত্রী স্বামীকে বিশ্বাস করে না। ইহাতে কি মানব সুখী হইয়াছে? কখনই না। অন্নের জন্য, বস্ত্রের জন্য, আরামের জন্য, তৃপ্তির জন্য সকলেই দিবা রাত্রি চিন্তা ও শ্রমজ্বরে জর্জ্জরিত, কাহারও কিঞ্চিন্মাত্র বিশ্রাম বা তৃপ্তি নাই। এই অবস্থা মানবের কি নিতান্ত শোচনীয় নয়? মানব কি কেবল চির-জীবন দুঃখভার বহন ও পরানিষ্টসাধনরূপ ইষ্টমন্ত্র জপ করিবার জন্য শ্রেষ্ঠ প্রাণীরূপে আবির্ভূত হইয়াছে? ইহারই নাম কি উন্নতি? এই জন্য কি উনবিংশ শতাব্দীর এত গৌরব? ইহা অপেক্ষা কি পশু-জীবন উৎকৃষ্ট নয়?

কিন্তু এই উনবিংশ শতাব্দীতে—এই উন্নতির সুবর্ণ যুগে মানবের এরূপ দুরবস্থার কারণ কি? এ কথার উত্তর দিতে হইলে বলিতে হইবে ধর্ম্ম ভাবের শিথিলতা এবং বাহ্যিক চাকচিক্যময় অন্তঃসারশূন্য পাশ্চাত্য সভ্যতানুকরণ-প্রিয়তাই ইহার কারণ। পাশ্চাত্য গুরুর নিকট আজি মানব শিখিয়াছে ধর্ম্ম একটী সকের জিনিস, উহার আশ্রয় লইলেও চলে, না লইলেও চলে, এবং যিনি যেরূপ পছন্দ করেন তিনি সেইরূপ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন, ইহাতে অন্যের কথা কহিবার অধিকার নাই। পাশ্চাত্য গুরু বলিয়াছেন, সমাজ ও নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিলে অধর্ম্ম হয় না—নীতি প্রভৃতি ধর্ম্মের অন্তর্গত নহে—ধর্ম্মের সংজ্ঞা স্বতন্ত্র। এই শিক্ষা পাইয়া মানব দিশাহারা হইয়াছে—ধর্ম্মে দৃঢ়তা শিথিল হইয়াছে। নীতি ও সামাজিক নিয়ম ধর্ম্মের বহির্ভূত এইরূপ বুঝিয়া ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিগণও দুর্নীতি-পরায়ণ ও সমাজদ্রোহী হইতে ভয় করিতেছে না। পরের সর্ব্বনাশ, পরদারগমন প্রভৃতি নিতান্ত দূষিতকার্য্য করিয়াও হিন্দু হরিনামের মালা জপ, খ্রীষ্টান গির্জাঘরে উপবেশন, ব্রাহ্ম চক্ষু মুদিত করিয়া ধার্ম্মিকনাম গ্রহণ করিতেছে। কিন্তু এরূপ ধর্ম্ম কত দিন থাকিতে পারে? বুদ্ধিমান লোকে বুঝিল ধর্ম্ম একটা জুয়াচুরিমাত্র। বিশেষতঃ বাণিজ্য প্রধান ইংরাজ জাতির সঙ্গে যেমন নানাবিধ বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া বহুতর দ্রব্যের বণিক আসিয়াছেন, সেইরূপ ধর্ম্মেরবণিকও অনেক আসিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই বলিতেছেন আমাদের ধর্ম্ম ভাল, ইহা লও তোমাদের অভীষ্টসিদ্ধ হইবে, অপর সমস্ত

ধৰ্ম্ম মিথ্যা ও কল্পনাপূর্ণ, তদবলম্বনে অনিষ্ট ঘটিবে। ইহা শুনিয়া সকলের বহিশ্চক্ষুর ন্যায় মনশ্চক্ষেও ধাঁধা লাগিয়াছে; কেহ স্থির করিতে পারিতেছে না কাহার কথা সত্য—কোন ধর্ম্ম সত্য। অবশেষে নাস্তিকদল মধ্যস্থ হইয়া বলিয়া দিতেছে, সকলেরই বাক্য মিথ্যা—ধৰ্ম্ম নাই, ঈশ্বর নাই—ধৰ্ম্ম-বণিকগণ কেবল আপন আপন স্বার্থসাধন জন্য আপন আপন ধৰ্ম্মকে অত্যন্ত কল্যাণকর বলিতেছে; কিন্তু প্রকৃত কথা এই মানব সম্পূর্ণ স্বাধীন, মানবের উপরে কেহ নাই। একে নানা গোলমালে মানবের ধাঁধা লাগিয়াছে, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না, তাহার উপর আপাতরম্য স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচারের প্রলোভন পাইয়া মানব একবারে অন্ধ হইয়াছে। আস্তিক নাস্তিক সকলেই স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছে। ধৰ্ম্ম দূরে পলাইয়াছে,—নীতি নামমাত্রাবশিষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং মানব মানবত্ব হারাইয়া স্বাধীনপশু হইয়াছে—পতিত হইয়াছে।

সর্ব্বথা আজি মানব পশুভাবাপন্ন বা পশু হইতেও নিকৃষ্ট, সুতরাং পতিত। পতিত উদ্ধার করিবার জন্যই জাহ্নবীর অবতারণা। জাহ্নবী যদি এই পতিত হিন্দুজাতির—এই শাপদগ্ধ ভস্মাবশিষ্ট পদদলিত সগর সন্তানগণের উদ্ধার সাধন ও আৰ্য্য কুলের পূর্ব্বগৌরব পুনরানয়ন করিতে পারেন, তবেই ভারতের মঙ্গল ও আমাদের জন্ম সার্থক।

আমাদের ভরসা আছে—

"—কৃতবাগ্দ্বারে——অস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥"

মহর্ষিগণের আশীর্ব্বাদে শঙ্করাচার্য্য যেমন একবার বৌদ্ধ ও নাস্তিক নিরাশ করিয়াছিলেন, আমরা সেই ব্রহ্মর্ষিগণের আশীর্ব্বাদ ও নিষ্কাম করুণার গুণে আশা করি জাহ্নবী পবিত্রতোয়া হইয়া পতিত উদ্ধারে সমর্থ হইবেন।

সাধন-সঙ্গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়াঠেকা।

১

পূজিতে তোমারে তারা কিবা প্রয়োজন—
  ধূপ দীপ কোশাকুশি কুণ্ড কুশাসন ?
নেত্রবারি গঙ্গাজলে ভক্তি রূপ শতদলে
  শ্রদ্ধার চন্দনে গো মা অর্চ্চিব চরণ।

২

বৈরাগ্যঅনল জ্বালি মোহ হবি দিব ঢালি
  ষড়রিপু বলি রূপে করিব ছেদন।
  মহাভেরী দুর্গানাম করিয়া বাদন।

৩

প্রাণভ'রে দরশন করিব গো শ্রীচরণ
  হৃদয়মন্দিরে করি তোমারে স্থাপন।
তোমার চরণ সম কি আছে মা মনোরম
  শান্তিময় তব পদ সাধনের ধন—
  প্রণত ভকত-মন-পঙ্কজ-তপন।

৪

কিবা সূক্ষ্ম কিবা স্থূল তুমি সকলের মূল
  আত্মার আত্মীয় তুমি বিজ্ঞান কারণ।
"মা নাই" দারুণ বাণী—শুনিলে শীহরে প্রাণী—
  তবু বলে অভিমানী কুতার্কিকগণ—
  সাধকে মরম-পীড়া দেয় অকারণ॥

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী।

যোগ বা নিত্যানন্দ লাভের উপায়।

আমাদিগের উদ্দেশ্য কি?—আমরা কেন লেখাপড়া শিখি?—কেন বিদ্যা উপার্জ্জন করি?—কেন অর্থ উপার্জ্জন করি?—কেন অপরকে বন্ধু বলিয়া তাঁহাকে প্রাণের সহিত—মনের সহিত ভাল বাসি? কেন বিবাহ করি?—কেন স্ত্রীর প্রণয়ে উন্মত্ত হইয়া গলিয়া যাই?—এসকল 'কেনর' কি কিছু উত্তর আছে?—যথার্থই কি আমাদিগের কিছু উদ্দেশ্য আছে?—আছে! কি? সুখ—চিরসুখ—নিত্যসুখ—।

মনুষ্য মাত্রেই সুখের জন্য লালায়িত; কিসে সুখী হইবে তাহার জন্যই ব্যতিব্যস্ত। সুখের জন্য আমেরিকা হইতে ইউরোপে যাইতেছে। ইউরোপ হইতে আসিয়ায় আসিতেছে; তরঙ্গসঙ্কুল আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের পরপারে গমন করিতেছে; প্রাতঃকাল হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতেছে; অতলস্পর্শ সমুদ্রে ডুবিয়া মুক্তাপুট উত্তোলন করিতেছে; গোলার মুখে, তলোয়ারের মুখে, বন্দুকের মুখে, অনায়াসে অবলীলাক্রমে অগ্রসর হইতেছে; পর্ব্বতে পর্ব্বতে, অরণ্যে অরণ্যে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে বিচরণ করিতেছে; সর্পের সম্মুখে, ব্যাঘ্রের সম্মুখে, মত্তহস্তীর সম্মুখে অকুতোভয়ে দণ্ডায়মান হইতেছে; শীত গ্রীষ্ম বর্ষা অনায়াসে সহ্য করিতেছে; স্বাধীনতা, সত্যপ্রিয়তা, পরোপকারিতা, প্রভৃতি সুন্দর প্রবৃত্তি সকলকে জলাঞ্জলি দিতেছে; আবার সাহসিকতা। দয়ালুতা, ন্যায়পরায়ণতাকেও হৃদয়ের সহিত—মনের সহিত বরণ করিতেছে।

এই সমুদায় কার্য্য এবং অন্যান্য অনেক কার্য্যই মনুষ্যের দ্বারা সুখের জন্য সম্পাদিত হইয়া থাকে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এ সকল কার্য্য সম্পাদনে

কি প্রকৃত সুখ আছে? অবশ্যই বলিতে হইবে—না—এ সমুদায় কার্য্যে সুখ নাই—না, সুখ নাই।

মনে করিলাম বিদ্যা উপার্জ্জন করিলে সুখী হইব। বিদ্যা উপার্জ্জন করিলাম, বিএ, হইলাম, এম, এ হইলাম, কিন্তু কৈ সুখ কৈ—বি,এ, এমএতে সুখনাই। সুখ থাকিলে বিএ, এমএরা কাঁদে কেন? অবশ্য বলিতে হইবে সুখ নাই তাই কাঁদে। সুখ থাকিলে কখনই কাঁদিত না। মনে করিলাম মানে সুখ আছে ● মান উপার্জ্জন করিলাম; অর্থে সুখ আছে, অর্থ উপার্জ্জন করিলাম। কিন্তু দেখিলাম মানেও সুখনাই, ধনেও সুখনাই। যদি সুখ থাকিত তাহা হইলে মানী ও ধনীরা কখনই দুঃখের কান্না কাঁদিত না। অনেকে মনে করেন যাঁহাদিগের অকপট সুহৃদ্ আছে তাঁহারাই যথার্থ সুখী। তাঁহাদিগের এরূপ মনে করা বিড়ম্বনা মাত্র;—সুহৃদে সুখনাই—সুহৃদ্ আপনার নয়—আপনার হইতে পারে না—আপনার শরীরই যখন আপনার নয়, সুহৃদের কথা দূরে থাকুক। যাহা আপনার নয় তাহাতে সুখ নাই; যাহা আত্মীয় নহে তাহাতে সুখ হইতে পারে না। তবে কি সংসারে সুখ নাই? সুখ আছে। লোকে কি উপায় অবলম্বন করিলে সুখ হয় তাহা জানে না—দুঃখের সাগরে কেন হাবুডুবু খায় তাহা বুঝে না। তাহা যদি জানিত, তাহা যদি বুঝিত, তাহা হইলে সুখী হইতে পারিত, সুখী হইবার জন্য দুঃখের গভীর সাগরে ডুবিত না।

বস্তুতঃ প্রকৃতরূপে সুখী হইতে হইলে প্রথমতঃ সুখ কাহাকে বলে জানা নিতান্ত আবশ্যক; কেবল জানিলেই হইবে না, যেসকল উপায় অবলম্বন করিলে নিত্যসুখ—নিত্যানন্দ সম্ভোগ করা যায়, সে সকল উপায় বিশেষ করিয়া জানা উচিত—সে সকল উপায় অভ্যাস করা উচিত—সে সকল উপায়ানুসারে কার্য্য করা উচিত। আমরা সেই জন্য, কি হইলে সুখ হইতে পারে এক্ষণে তাহাই দেখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কাহাকেই বা সুখ বলে, কেমন করিয়াই বা নিত্য সুখী—নিত্যানন্দময় হইতে পারা যায় তাহাই বলিতে অগ্রসর হইলাম।

প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি অথবা নিবৃত্তির নামই সুখ। আমার প্রবৃত্তি হইল

জল পান করিব; জল পান করিলাম, প্রবৃত্তির তৃপ্তি হইল—জলপান প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইল, আমি সুখী হইলাম। প্রবৃত্তি হইল আহার করিব, আহার করিলাম, প্রবৃত্তির তৃপ্তি হইল, আমি সুখী হইলাম। প্রবৃত্তি হইল ইঁহাকে বন্ধুত্বে বরণ করিব, অহরহঃ ইঁহার সহবাস করিব; বন্ধুত্বে বরণ করিলাম, অহরহঃ সহবাস করিলাম প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইল, সুখ হইল।

কিন্তু আমাদিগের প্রবৃত্তি নিতান্ত চঞ্চল, আমরা নিতান্ত অব্যবস্থিতচিত্ত। সেই জন্যই আজ যাহাকে সুখ বলিয়া বোধ হইতেছে কাল আবার তাহাই দুঃখের কারণ হইয়া উঠিতেছে। এই মুহূর্ত্তে যাহাতে সুখ হইতেছে, পর মুহূর্ত্তে আবার তাহাতেই দুঃখ হইতেছে। এই বায়ু সেবন করিয়া সুখ বোধ হইতেছে আবার তৎপরক্ষণেই সেই বায়ু এতদূর দুঃখের কারণ হইয়া উঠিতেছে যে, পাছে শরীরে বায়ু লাগে বলিয়া গৃহের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিতেছি; গুরু অথবা উষ্ণবসন দ্বারা শরীরকে বিশেষরূপে আবৃত করিতেছি। এই রৌদ্রের জন্য লালায়িত, আবার তৎপরক্ষণেই রৌদ্র বিষ বলিয়া বোধ করিতেছি।

আবার দেখ আমার যাহাতে সুখ হয় অন্যের কিন্তু আবার তাহাই দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। আমি যাহা ভালবাসি, আর একজন তাহা ভাল বাসে না। আমি নিরামিষ ভোজন ভালবাসি, আর একজন নিরামিষ ভোজন ভোজনই নয় বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করে। যিনি আমার প্রকৃত প্রিয় সুহৃদ, তিনিই আবার আর একজনের মহান্ শত্রু। আমার যে স্থান স্বর্গ বলিয়া বোধ হয়, আর একজন আবার সেই স্থানকেই নরক বলিয়া বোধ করেন। এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, পৃথীবির কোন সামগ্রীই, কোন বিষয়ই সুখ দুঃখজনক বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। জগতের সুখ দুঃখ বস্তুগত নহে। বস্তুতে সুখও নাই বস্তুতে দুঃখও নাই। সুখ দুঃখ প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। যাহার যে রূপ প্রবৃত্তি, তাহার সেইরূপ সামগ্রী-দ্বারা,—সেইরূপ কার্য্য দ্বারা সুখলাভ হইয়া থাকে। কাহারও বা চঞ্চল

ভাবে পরিভ্রমণ করিলে সুখ হয়, আবার কাহারও বা অচলভাবে বসিয়া থাকিতে পারিলে সুখ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সুখ চঞ্চলতাতেও নাই, অচল ভাবে উপবেশনেতেও নাই,—সুখ প্রবৃত্তির আয়ত্বাধীন। প্রবৃত্তি যাহা-দ্বারা নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয় তাহাই সুখ; প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত না হইলে—নিবৃত্তি প্রাপ্ত না হইলে, কোন প্রকার সুখই লাভ হইতে পারে না। কিন্তু এস্থানে একটু প্রণিধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য; প্রণিধান করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইলে যে সুখ হয় সে সুখ ক্ষণস্থায়ী, নিতান্ত ক্ষণিক—সে সুখ নিত্যসুখ নহে-তাহা চিরসুখ হইতে পারে না। কারণ একটী প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি হইতে না হইতে আবার অভাবনীয় শত শত প্রবৃত্তি আসিয়া মনে উদ্ভূত হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সে সমুদয় প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি বা নিবৃত্তি হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মনে সুস্থিরতা নাই, হৃদয়ে সুখ নাই, হৃদয় কাতরতায় পরিপূর্ণ, হৃদয় দুঃখে পরিপূর্ণ, হৃদয় ভাবনাসাগরের অধস্তম প্রদেশে নিমগ্ন।

প্রবৃত্তি অনন্ত,—প্রবৃত্তি অসীম; সুতরাং সমুদায় প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে; এমন কি হইতেই পারে না। কাযে কাযেই প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত করিয়া নিত্যসুখ উপার্জন করা আর মরীচিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া পিপাসা শান্তি করা উভয়ই সমান।

প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তিতে যদি নিত্যসুখ হইল না, যদি—আত্যন্তিক চিরসুখ হইল না, তবে কিসে আমরা চিরসুখী—নিত্যসুখী হইতে পারি? আবার লোকের মনে ইহাই দৃঢ় প্রতীতি আছে যে, চিরসুখ আদৌ সম্ভাব্য হইতেই পারে না। কারণ যখন দুঃখ না হইলে সুখকে সুখ বলিয়াই বোধ হয় না,—কোন সুখেরই অনুভূতি হয় না, রৌদ্র সন্তাপে সন্তপ্ত না হইলে যখন ছায়ার মাধুর্য্য, ছায়ার সুখ সম্ভোগ করা যায় না, গ্রীষ্মে প্রপীড়িত না হইলে যখন প্রবাত সেবনের সুখ অনুভব হয় না তখন চিরসুখ কিরূপে সম্ভাব্য হইতে পারে? চিরসুখ আকাশ কুসুম।

উপরে উপরে দেখিলে—চিন্তাসাগরের উপরে ভাসিয়া থাকিলে,—দুঃখ না হইলে সুখের অস্তিত্বই উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, সুখের

সম্ভোগই হইতে পারে না সত্য, কিন্তু একবার চিন্তাসাগরে নিমজ্জিত হইয়া যাও, একবার চিন্তাসাগরের অধস্তম প্রদেশে ডুবিয়া যাও—জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে, প্রজ্ঞার আলোকে সমুদয় আলোকিত হইবে—তখন দেখিবে, তখন বুঝিবে, তখন স্পষ্ট অনুভূত হইবে দুঃখ অনুভূত না হইলেও সুখসম্ভোগ করা যাইতে পারে—ক্ষণিক সম্ভোগ নহে—নিত্যসম্ভোগ—চিরসম্ভোগ। এক্ষণে তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার কেমন করিয়া সে সুখ হইতে পারে? কেমন করিয়া সে নিত্য-সুখ-সম্ভোগ লাভ করা যাইতে পারে? তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি শ্রবণ কর—মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর—মনের সন্দেহ বিদূরিত হইবে। স্থির বিশ্বাস আছে, নিত্য সুখ সম্ভাব্য বলিয়া বোধ করিতে পারিবে।

ক্রমশ ——

শ্রীহরিচরণ রায় কবিরত্ন।

বেদরহস্য।

ভারতবর্ষে বেদ একটী অমূল্য রত্ন। এই রত্নের আলোকমালা এককালে ভারতের সমুদয় স্থান সমুজ্জ্বল করিয়া এক্ষণে সপ্তসমুদ্র ত্রয়োদশ নদী লঙ্ঘন পূর্ব্বক পাশ্চাত্যদেশ প্রদীপ্ত করিতেছে। আমাদের যথাসর্ব্বস্ব বেদ এখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের পাঠ্য পুস্তক—কিন্তু আমরাই আবার ঐ বেদোক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। মোক্ষমূলর সাহেব বেদের শুদ্ধাশুদ্ধ ও পাঠাপাঠ বলিয়া দিবেন, আর আমরা যজুর্ব্বেদী, সামবেদী বা ঋক্‌বেদী হইয়া চক্ষে কখন বেদ দর্শন ও করিব না। বোধ হয় স্বচক্ষে বেদ দর্শন করা অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটিয়াছে। যখন বেদ পাঠ করা

এ জীবনে ঘটিল না—অবশেষে যখন বেদদর্শন পর্য্যন্ত দুর্লভ হইল, তখন আমাদের তুল্য হীনচেতা ব্যক্তি জগতে আর কে আছে ?।

"বেদ" এই সুধাসুললিত বাক্যটী উচ্চারণ করিলে আর্য্যবংশপ্রসূত কোন্ ব্যক্তির হৃদয়ে না আনন্দপ্রবাহ প্রবাহিত হয় ? কোন্ আর্য্যসন্তানের না শ্রবণলালসা বলবতী হয় ? আর্য্যজাতির কথা দূরে থাকুক—অনার্য্য-জাতি পর্য্যন্ত "বেদ" এই অমৃতময় বাক্যের জগদ্ব্যাপী তেজস্বিতাগুণে অদ্যাপি অবনতমস্তক ও সম্ভ্রমচকিত চিত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বেদসম্বন্ধে কোন বিষয় জানিবার জন্য এক্ষণে আমাদের আর বাসনা হয় না। হায় ! এক্ষণে আর আমাদের দেশে সেরূপ মুনিঋষি নাই !—যাঁহারা কৃপা করিয়া বেদের উন্নতি সাধন করিবেন। এখন "তে হি-নো দিবসাঃ গতাঃ" আমাদের সে সকল দিন গত হইয়াছে। যখন ব্রহ্ম-তেজে দেদীপ্যমান যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিধুরন্ধরেরা আর্য্যাবর্ত্ত পরিত্যাগ করিয়া আত্মলীন হইয়াছেন, তখন আর কাহার সাধ্য যে সেই আত্মতত্ত্বে পরিপূর্ণ বেদরহস্য ব্যক্ত করে বা সমালোচনা করে ? বস্তুতঃ সুখদুঃখাদি বিশিষ্ট জীবাত্মার আশ্রিত এবং স্থূলদেহধারী অস্মদাদির মতন সামান্য মানবে বেদের তত্ত্ব উল্লেখ করিলে কেবল অনধিকারচর্চ্চা করা হয় মাত্র। কেননা আত্মসাক্ষাৎকার না হইলে আত্মতত্ত্বের সমালোচনা একেবারে অসম্ভব। বিশেষতঃ মনুতে বেদের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

ন তেন বৃদ্ধোভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যোবা যুবাঽপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ। ২।১৫৬।

অর্থাৎ মস্তকের কেশ পক্ক হইলে বৃদ্ধ হয় না, কিন্তু যুবা হইয়াও যিনি বিদ্বান্ হন, দেবতারা তাঁহাকেই বৃদ্ধ বলেন। সুতরাং আমাদের যদি বিদ্যাবল না থাকে, তবে বেদের কথা কিরূপে ব্যক্ত করিব। মনু আরও বলিছেন—

"যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়োমৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি।
যথা ষণ্ঢোঽফলঃ স্ত্রীষু যথা গৌ র্গবি চাফলা।
যথা চাজ্ঞেঽফলং দানং তথা বিপ্রোঽনৃচোঽফলঃ। ২।১৫৭,১৫৮।

অর্থাৎ যেমন কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তী এবং চর্ম্মনির্ম্মিত মৃগ কোন উপকারক বা কার্য্যকারক নহে, তদ্রূপ যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন না করেন তিনিও কোন কার্য্যক্ষম নহেন, কেবল উহাদের ন্যায় নাম ধারণ করেন মাত্র। ক্লীব যেমন স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদন করিতে পারে না, স্ত্রীজাতীয় গাভী যেমন স্ত্রীজাতীয় গাভির নিকটে নিষ্ফলা হয়, অজ্ঞ ব্যক্তিকে দান করা যেমন বিফল হয়, তদ্রূপ বেদাধ্যয়ন হীন ব্রাহ্মণ কোন কার্য্যকারক হয়েন না।

সুতরাং আমরা কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তীর মতন বৃথা। কারণ, আমাদের বেদে অধিকার নাই। তবে নৈষধকার বলিয়াছেন—"ইতঃ স্তুতিঃ কা খলু চন্দ্রিকায়া যদ্যব্ধিমপ্যুত্তরলীকরোতি।" অর্থাৎ জ্যোৎস্নার ইহা অপেক্ষা আর কি স্তুতি হইতে পারে, যখন ঐ চন্দ্রকিরণ গম্ভীরপ্রকৃতি সমুদ্রকেও চঞ্চল করিয়া থাকে। এক্ষণে এই সামান্য কথাটীর উপর দৃঢ়তর নির্ভর করিয়া যথাসাধ্য বেদতত্ত্বের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। সমুদ্রকে উদ্বেলিত করিয়া জ্যোৎস্নার যদি কোন দোষ না ঘটে, তবে আমাদের মতন সামান্য অজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা বেদতত্ত্বের সমালোচনা হইলে অখ্যাতির আশঙ্কা হইবে না, প্রত্যুত চন্দ্রিকার ন্যায় সুখ্যাতিভাজন হওয়া যাইতে পারিবে।

এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করা যাইতেছে। যথা—বেদ যে কোন্ সময়ে কোন্ ব্যক্তি দ্বারা প্রথমে রচিত হয় তাহা কিছুতেই স্থির করিতে পারা যায় না। বেদের গ্রন্থকর্ত্তা কি রচনাকাল সম্বন্ধে কোন পুস্তক বিশেষ হইতে কিছু অবগত হওয়া কঠিন ব্যাপার। তবে অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করার ন্যায় অনুমানে যতটুকু স্থির করা যাইতে পারে, তাহারই প্রমাণ প্রয়োগ কি যুক্তি উল্লিখিত হইবে। প্রথমে যজুর্ব্বেদের টীকাকার মহীধর এবং ঋগ্বেদের টীকাকার সায়ণাচার্য্য বেদ সম্বন্ধে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা অবিকল তাহার অনুবাদ করিয়া পাঠকবর্গের গোচর করিতেছি।

মহীধর বলেন, বেদ প্রথমে ব্রহ্মাপরম্পরায় জগতীতলে অবতীর্ণ হয়। অনন্তর করুণাময় মহামুনি বেদব্যাস মানবদিগকে মূঢ়মতি দর্শন করিয়া অনুকম্পাপূর্ব্বক অবিভক্ত বেদকে ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিভাগে বিভক্ত করেন। বেদবিভাগ করিয়া আপনার চারি জন প্রিয়শিষ্যকে ঐ চারিখানি বেদ

অধ্যয়ন করান। তন্মধ্যে ঋক্‌বেদে পৈল, যজুর্বেদে বৈশম্পায়ন, সামবেদে জৈমিনি এবং অথর্ব্ববেদে সুমন্ত শিক্ষিত হন। শিষ্যগণ গুরুর নিকট হইতে বেদশিক্ষা করিয়া ক্রমশঃ আপন আপন শিষ্যদিগকে ঐ সমস্ত বেদের উপদেশ দেন। এইরূপে পরম্পরাক্রমে বেদের সহস্র সহস্র শাখা হইয়া উঠে।

মহামুনি বেদব্যাসের যজুর্বেদের শিষ্য বৈশম্পায়ন, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি আপনার শিষ্যদিগকে যজুর্বেদ অধ্যয়ন করান। একদা দৈবাৎ কোন কারণে ক্রোধান্বিত হইয়া বৈশম্পায়ন মুনি আপনার শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন তুমি আমার নিকট হইতে যে সমস্ত অধ্যয়ন করিয়াছ, অচিরাৎ তৎসমুদয় পরিত্যাগ কর। যাজ্ঞবাল্ক্য যে সমস্ত বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, যোগবলে অবিকল শরীরধারিণী সেই সমস্ত বিদ্যা উদ্‌গীরণ করিয়া দিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য যে সময়ে যজুর্বেদ বমন করেন, তৎকালে বৈশম্পায়ন অন্যান্য শিষ্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, তোমরা এই সমস্ত যজুর্বেদ গ্রহণ কর। তখন শিষ্যগণ গুরুবাক্য অপরিহার্য্য ভাবিয়া তিত্তিরি নামক পক্ষী হইয়া ঐ উদ্‌গীর্ণ যজুর্বেদ ভক্ষণ করেন। শিষ্যগণের বুদ্ধিমালিন্য বশতঃ ঐ যজুর্বেদ কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিল। অনন্তর জাজ্ঞবল্ক্য দুঃখিতমনে বহুকাল পর্য্যন্ত সূর্য্যের আরাধনা করিয়া অন্য আর একখানি প্রদীপ্ত এবং শুক্লবর্ণ যজুর্ব্বেদ সূর্য্যের নিকট হইতে লাভ করেন। সূর্য্যের নিকট হইতে যে শুক্ল যজুর্বেদ প্রাপ্ত হন, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাহা আপনার জাবাল, গৌধেয়, কণ্ব, মধ্যন্দিন প্রভৃতি পনর জন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি যে, সূর্য্যের নিকট হইতে শুক্ল যজুর্বেদ সকল লাভ করিয়া আপনার শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতেন, তাহা বৃহদারণ্যক উপনিষদের মাধ্যন্দিনী শাখাতে (৫,৫,৩৩) উক্ত হইয়াছে। যথাঃ—

"আদিত্যানীমানি শুক্লানি যজূংষি বাজসনেয়েন যাজ্ঞবল্ক্যেনাখ্যায়ন্তে"।

অস্যার্থ—বাজ শব্দে অন্ন, সন শব্দে দান, অন্নদান করিতেন বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের পিতার নাম "বাজসন" ছিল। বাজসনের পুত্র বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য আপনার শিষ্যদিগকে শুক্লযজুর্বেদ সকল উপদেশ দিতেন। এইরূপে জগতে প্রথমে কৃষ্ণযজুর্বেদ এবং শুক্লযজুর্বেদের প্রচার হয়।

তন্মধ্যে মধ্যন্দিন নামক কোন মহর্ষি যজুর্বেদের কোন শাখা লাভ করাতে তাহার নাম মাধ্যন্দিন হয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আপনার সমুদয় শিষ্যদিগকে যজুর্বেদ শিক্ষাদেন, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে মধ্যন্দিনের যজুর্বেদে বিশেষ সম্বন্ধ থাকাতে জগতে তিনি মাধ্যন্দিন বলিয়া বিখ্যাত হন। অনন্তর ঐ মাধ্যন্দিন যজুর্বেদ যাঁহারা অধ্যয়ন করিতেন অথবা যাঁহারা মাধ্যন্দিন যজুর্বেদ জ্ঞাত ছিলেন কিম্বা যাঁহারা শিষ্য পরম্পরায় এখনও ঐ যজুর্বেদে লিপ্ত আছেন, তাঁহারা সকলেই মাধ্যন্দিন বলিয়া উক্ত হয়েন।

বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকে অনেক তর্কবিতর্ক করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উদ্দেশে এক্ষণে ঋক্‌বেদের টীকাকার সায়নাচার্য্যের মন্তব্য বিষয় উদ্ধৃতকরা যাইতেছে। যথা—বেদের মধ্যে কোন্ বেদ অগ্রে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার মীমাংসা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। কেবল বেদমন্ত্র দর্শনে বেদের উৎপত্তিকাল স্থির হইয়া থাকে। বেদের অনেকস্থানে প্রথমে ঋক্‌বেদের উৎপত্তি নির্ণীত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। বেদের আদিম উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীনদিগের যেরূপ মত আছে তাহা নিম্নে ক্রমশঃ দর্শিত হইতেছে। যথা—পুরুষসূক্ত মন্ত্রে আছে—

তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত।"

অস্যার্থ।—সকলের যজনীয় অর্থাৎ পূজ্য, সকলের হবনীয়—সেই পরমেশ্বর হইতে ঋক্, সাম, ছন্দ ও অবশেষে যজুর্বেদের উৎপত্তি হয়। তৈত্তিরীয়েরা পাঠ করিয়া থাকেন—

"যদ্বৈ যজ্ঞস্য সাম্না যজুষা ক্রিয়তে তচ্ছিথিলম্ যদৃচা তদ্দৃঢ়মিতি।"

অস্যার্থ।—সামবেদ দ্বারা কি যজুর্বেদদ্বারা যজ্ঞের যে সমস্ত কার্য্য করা যায়, তৎসমুদয় শিথিল। কিন্তু ঋক্‌বেদ দ্বারা যজ্ঞের যে কার্য্য করা হয়, তাহা অত্যন্ত দৃঢ়।

ছান্দোগ্যেরা সনৎকুমারের প্রতি নারদীয় বাক্য সম্বন্ধে এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন। যথা—

"ঋগ্‌বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চেতি।"

অস্যার্থ।—হে ভগবন্! আমি ঋক্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিব। মুণ্ডক উপনিষদে আছে——

"ঋগ্‌বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদ ইতি।"

অস্যার্থ।—ঋক্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ব্ববেদ। তাপনীয় উপনিষদে মন্ত্ররাজপাদে যথাক্রমে যেরূপ অধ্যয়নের রীতি আছে, তাহা দর্শিত হইতেছে। যথা——

"ঋগ্‌যজুঃ সামাথর্ব্বাশ্চত্বারো বেদাঃ সাঙ্গাঃ সশাখাশ্চত্বারঃ পাদা ভবন্তীতি।"

অস্যার্থ——শিক্ষাকল্প প্রভৃতি ছয়টি বেদের অঙ্গ—বিবিধ শাখাসমন্বিত ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিখানিকে বেদ বলে এবং যথাক্রমে উহাদিগের প্রত্যেককে এক একটি পাদ বলে।

এইরূপে বেদের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, সর্ব্বাগ্রে ঋক্‌বেদের উৎপত্তি হইয়াছে। যাহাই হউক, বেদের উৎপত্তিকালের অগ্রপশ্চাৎ লইয়া আমাদের মস্তক ঘূর্ণিত করিবার কোন ফলোদয় নাই। আমাদের প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য—বেদ কাহাকে বলে?। সুতরাং বেদ কাহাকে বলে, তাহার নিমিত্ত প্রমাণ ও লক্ষণাদির যেরূপ আবশ্যক হইবে, ক্রমশঃ তাহারই সমালোচনা করা যাইবে।

প্রথমতঃ কথা এই——বেদ আছে কি না সন্দেহ। যদি বেদের অস্তিত্বে সন্দেহ করা যায়, তখন ঋক্‌বেদ, যজুর্বেদ ইত্যাদি বেদের অবান্তর বিশেষ লইয়া আলোচনা করিলে ফল কি?। অগ্রে বেদ কাহাকে বলে? ইহার বিশদ সূত্র থাকা আবশ্যক। যদি বেদ আছে স্বীকার করা যায় তবে বেদের লক্ষণ কি? বেদের প্রমাণ কি? অর্থাৎ বেদের লক্ষণ ও প্রমাণ সম্বন্ধে সমালোচনা আবশ্যক। জগতে যে বস্তুর লক্ষণ নাই—যে বস্তুর কোন প্রমাণ নাই— এরূপ বস্তু স্বীকার করা আর না করা সমান কথা।

"লক্ষণ প্রমাণাভ্যাং বস্তুসিদ্ধিরিতি ন্যায়বিদাং মতম্।"

নৈয়ায়িকেরা বলেন—লক্ষণ এবং প্রমাণদ্বারা জগতে সমুদয় বস্তুর সিদ্ধি হইয়া থাকে। ক্রমশঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ।

ঈশ্বর ও ধর্ম্ম।

ঈশ্বর ও ধর্ম্ম লইয়া আজ মানবমণ্ডলীমধ্যে বড় গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে। বিজ্ঞান নাকি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অপ্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছে—ধর্ম্মশাস্ত্রকে আষাঢ়ে গল্প বা আরব্য উপন্যাস নামে অভিহিত করিতে পারিয়াছে। বিজ্ঞান নাকি প্রমাণ করিয়াছে, মানব স্বাধীন, মানবের উপর কথা কয় এমত কিছুই বিদ্যমান নাই, ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলে মানব সমস্তই সম্পাদন করিতে পারে! কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, মানব চেষ্টা করিলে যদি সমস্ত সম্পন্ন করিতে পারে, তবে করে না কেন? মানব আহার পাইবার জন্য দিবানিশি রৌদ্রে, জলে, শীতে ভয়ানক কষ্ট করিতেছে; দুর্গন্ধ ন্যক্কারজনক বিষ্ঠামূত্রাদি বহন করিতেছে; চৌর্য্য, দস্যুতা, প্রতারণা, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি অকার্য্যসকল করিতেছে; উপাসনা, চাটুবাদ, ভিক্ষা প্রভৃতি নীচকার্য্য করিতেছ, তথাপি উদরপূর্ণ করিয়া অন্ন পাইতেছে না কেন? প্রাণপ্রতিমা স্ত্রী ও প্রাণাধিক পুত্রকে মনের মত করিতে, আপন আয়ত্বে সচ্ছন্দ ও জীবিত রাখিবার জন্য সমুদায় প্রয়াস বৃথা হইতেছে কেন? যে ইয়ুরোপ ও আমেরিকা মানবশক্তিবাদের সৃষ্টিকর্ত্তা সেই ইয়ুরোপ ও আমেরিকাবাসীগণ এত চেষ্টা করিয়াও ইচ্ছা সকলের চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে পারিতেছে না কেন? পশু পক্ষ্যাদি ইতরপ্রাণীগণত ইচ্ছা সম্পাদন জন্য এত ব্যাকুলিত নয়! বল দেখি কোন্ পশু উদরান্নের জন্য মানবের ন্যায় লালায়িত? তাহারা কি মানবের ন্যায় পরের অধীনতা স্বীকার করে, পরের দাসত্ব করে, ভিক্ষা করে, না বিষ্ঠামূত্র বহন করে?

নাস্তিকগণ! অগ্রসর হও, উত্তর দাও। যখন ঈশ্বর নাই বলিতেছ অর্থাৎ যখন বলিতেছ মানবের কার্য্যের বাধা প্রদান করে এমত কিছুই নাই, তখন মানব ইচ্ছামত কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না কেন? যদি বল উচিত চেষ্টা করে না বলিয়া মানব কৃতকার্য্য হয় না, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, কি জন্য উচিত চেষ্টা করে না? যখন সফল হইবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে

ও তজ্জন্য যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে তখন উচিত মত হয় না কেন? মানব কি ইচ্ছা পূর্ব্বক উচিত চেষ্টা করে না? না শক্তির অভাবে বা বুঝিতে না পারিয়া উচিত চেষ্টা করিতে পারে না? যদি অক্ষমতাই প্রকৃত কারণ হইল, তবে মানব যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে কি প্রকারে বলা যায়? আর উচিত শব্দেরই বা অর্থ কি? উচিত কাহার সম্বন্ধে? সেই উচিতই বা মানব করিতে বাধ্য কেন? এইখানে নাস্তিক স্বভাবের নিয়ম বলিয়া উত্তর শেষ করিয়া দেন। যদি বড় আঁটা আঁটি করিয়া স্বভাব কাহাকে বলে জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহা হইলে শক্তিবিশেষ বলিয়া বুঝাইয়া দেন। অর্থাৎ তাঁহারা বলেন মানব ও বিশ্বের সমস্ত পদার্থ স্বাভাবিক নিয়মের অধীন, সেই শক্তির অতীত কার্য্য করিতে মানব বা কেহই সক্ষম নহে। তবে নাস্তিক মহাশয়! আপনি ঈশ্বর স্বীকার করিলেন না কেন? যখন আপনি বলিতেছেন মানব শক্তি বিশেষের নিয়মাধীন, তখন মানব স্বাধীন কৈ? যে শক্তিবিশেষের অধীন হইয়া সকলকেই চলিতে হয়, সেই শক্তিবিশেষ ঈশ্বর নয় কেন? শক্তিবিশেষকে ঈশ্বর বলিলে কি দোষ হয়? যখন তুমি বলিতেছ, মানব শক্তিবিশেষ, ইতরপ্রাণী শক্তিবিশেষ, উদ্ভিদ্ শক্তিবিশেষ, জড়পদার্থ সকল শক্তিবিশেষ, আবার জড় সংজ্ঞার বহির্ভূত কতকগুলি শক্তি স্বীকার করিতেছ, (যেমন তাপ, আলোক, তাড়িত, আকর্ষণ ইত্যাদি) সমস্তই শক্তিবিশেষ, তখন ঈশ্বর শক্তিবিশেষ হওয়ায় দোষ কি? তবে যদি 'ঈশ্বর' এই শব্দে তোমাদের আপত্তি থাকে বলিতে পারি না। কিন্তু সে আপত্তির কারণ কি? ঈশ্বরের লক্ষণ কি? অনাদি, অনন্ত, সর্ব্ব কারণই অবশ্য ঈশ্বর পদবাচ্য। তোমার কথিত শক্তি কি অনাদি অনন্ত ও সর্ব্ব কারণ নহে? তুমি বলিতেছ চিরকাল এইরূপ হইয়া আসিতেছে, অর্থাৎ শক্তির অনুরূপ কার্য্য চিরকাল হইতেছে, চিরকাল হইবে। ইহাও বলিতেছ যে যাহার যে শক্তি সে তদনুরূপ কার্য্য করে, অর্থাৎ শক্তিই সকলের সমস্ত কার্য্যের কারণ। সুতরাং তোমার কথিত শক্তি বিশেষও ত অনাদি অনন্ত ও সর্ব্বকারণ হইল। তবে তোমার শক্তি বিশেষ ঈশ্বর নহে কেন? তবে তুমি বলিবে ঈশ্বরের আর একটী কল্পিত গুণ আছে, তাহা শক্তিতে নাই অর্থাৎ

ঈশ্বর দণ্ড ও পুরস্কার দান করেন; কিন্তু শক্তি কাহাকেও দণ্ড বা পুরস্কার দান করে না। আমার বোধ হয়, একথা তোমার বিবেচনাপূর্ব্বক বলা হয় নাই। কেন না তুমি এইমাত্র বলিলে মানব যে শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য না করিলে দুঃখ পায়। কে দুঃখ দেয়? সেই শক্তিই কি দুঃখ দানের কারণ নহে? ঐরূপ শক্তি অনুসারে কার্য্য করিয়া যখন মানব সুখী হয়, তখন কি শক্তিই ঐ সুখদানের কারণ নহে? অগ্নিতে হাত দিলে হাত পোড়ে কেন? বিষপান করিলে প্রাণ যায় কেন? ঐ সকল দুঃখের কারণ কি? শক্তি বিশেষ কি ঐ সকল দুঃখের কারণ নহে? তবে শক্তি দণ্ড প্রদান করে না কেন? পুরস্কার দেয় না কেন? দণ্ড পুরস্কারের অর্থ কি? ঈশ্বরাজ্ঞা প্রতিপালন করিলে পুরস্কার বা সুখ তাঁহার আজ্ঞার অবহেলা করিলে দণ্ড বা দুঃখ পাইতে হয়। যখন তোমার কল্পিত শক্তিবিশেষের আজ্ঞা বা নিয়ম পালনাপালনের উপর সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে, তখন সেই শক্তিবিশেষ দণ্ড পুরস্কার দাতা নহে কেন?

এক্ষণে নাস্তিকগণ বলিতে পারেন, আস্তিক সম্প্রদায়ের ঈশ্বর ও এই শক্তিরূপ যুক্তিমূলক ঈশ্বর একবিধ নহে, আস্তিকগণ এরূপ ঈশ্বরে তুষ্ট নহেন; এরূপ ঈশ্বর স্বীকার করা আর না করা সমান কথা। কেননা ধর্ম্ম-শাস্ত্রবিশেষ আস্তিক দিগের প্রধান অবলম্বন, কিন্তু নাস্তিকগণ তাহা মানিতে বাধ্য নহে, বিজ্ঞানই শক্তিরূপ ঈশ্বরবাদী ও নাস্তিকদিগের একমাত্র অব-লম্বন। বিজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্র যখন পরস্পর সম্পূর্ণ বিরোধী, তখন ধর্ম্মশাস্ত্রের জীবন্ত ঈশ্বর ও বিজ্ঞানের শক্তিময় ঈশ্বর একরূপ হইবে কি প্রকারে? আমরা বলি একথা নাস্তিকদিগের নিতান্ত ভ্রমোচ্চারিত। কেননা তাঁহারা জানেন না যে ধর্ম্মশাস্ত্র বিজ্ঞান ভিন্ন কিছুই নহে। বিজ্ঞানদর্পণের 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-দর্পণ' প্রবন্ধে একথার আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। যে ধর্ম্মশাস্ত্র বিজ্ঞানবাচ্য নহে, আমরা তাহাকে ধর্ম্মশাস্ত্র বলি না। পণ্ডিতেরা অগ্রে বিজ্ঞানবলে স্থির করিয়াছেন কোন কার্য্য ঈশ্বরানুমোদিত ও মানবের কর্ত্তব্য, পরে তাহা গ্রন্থবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্র বিজ্ঞান বিরুদ্ধ নহে। অন্ততঃ হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র যে ঐরূপ তাহা আমরা পরে সপ্রমাণ করিব।

বিজ্ঞানের প্রকৃত অর্থবোধ না থাকাই নব্যগণের এই ভ্রমের কারণ। জড়ের স্থূলশক্তি ও তাহার সহিত সম্বন্ধ জ্ঞানকে এক্ষণকার লোকেরা বিজ্ঞান বলিয়া থাকেন। সূক্ষ্মানুসন্ধানে তাঁহাদের মন আজিও কৌতূহলী হয় নাই। তাঁহারা জানেন বিবাদই জয়ের কারণ, সদ্ভাব যে জয়ের কারণ তাহা তাঁহারা জানেন না। তাঁহারা জানেন শরীরে তাপ লাগিয়াছে, শীতল করিলে তাপ যাইবে, অর্থাৎ শরীরস্থ তাপের সহিত হিমের দ্বন্দ্ব বাধাইতে পারিলেই—হিমের বৃদ্ধি করিয়া দিয়া হিমের জয়লাভ করাইতে পারিলেই, তাপের দমন হয় বা তাপজনিত শারীরিক কষ্ট বিদূরিত হয়। তাঁহারা ইহা জানেন না যে তাপের সহিত তাপের সম্মিলনে অর্থাৎ তাপের উপর তাপ লাগাইতে পারিলে শারীরিক তাপজনিত কষ্ট নিবারিত হয়। "বিষস্য বিষমৌষধম্" এই সারবান বাক্য তাঁহারা জানেন না।—তাঁহাদের বিজ্ঞানও জানে না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে যে কোন দুঃখের ব্যাপার উপস্থিত হউক, তাহা নিবারণ করিতে হইলে, তাহার বিপরীত অর্থাৎ সম্ভোগ দ্বারা নিবারণ করিতে হইবে। সুতরাং কাম-রিপু-জনিত কষ্ট হইলে স্ত্রীসম্ভোগ আবশ্যক, ক্রোধরিপু উত্তেজিত হইলে পরানিষ্ট করা আবশ্যক, লোভরিপুজনিত কষ্ট দূর করিতে হইলে লোভনীয় পদার্থ প্রাপ্তির আবশ্যক, তাপ নিবারণ করিয়া শীতল করিতে হইলে শীতল বায়ু ও বরফ-জলের আবশ্যক ইত্যাদি। তাঁহারা জানেন না যে, ঐরূপে ইচ্ছা সকলের যত চরিতার্থ করা যায়, ততই সেই ইচ্ছা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং পুনরায় সেই ইচ্ছা পূরণের জন্য নূতন চেষ্টার আবশ্যক হয়। তখন একটী রমণীদ্বারা কাম চরিতার্থ হয় না, একজনের অনিষ্ট দ্বারা ক্রোধ নিবারিত হয় না, অল্প দ্রব্য প্রাপ্তিতে লোভ চরিতার্থ হয় না, অল্প বায়ু বা এক গ্লাস বরফজলে তাপ দূর হয় না, অল্প মদে নেশা হয় না ও অল্প কুইনাইনে জ্বর সারে না। যে ইচ্ছার যত চরিতার্থ করা যায়, সে ইচ্ছা তত* বলবতী হয় এবং সেই ইচ্ছা পূরণ করিতে তত অধিক ব্যগ্র হইতে হয়। সুতরাং দুঃখেরও পরিমাণ অধিক হইতে থাকে।

* নিস্বোবষ্টিশতং শতীদশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো।

লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ ॥
চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতি ব্র্হ্মাস্পদং বাঞ্ছতি।
ব্রহ্মাবিষ্ণুপদং পুনঃ পুনরহো আশাবধিং কোগতঃ ॥

শান্তিশতক।

দরিদ্র ব্যক্তি শত মুদ্রা পাইলে তুষ্ট হইবে বিবেচনা করে, শত মুদ্রা-বান সহস্র পাইলে সুখী হইবে ভাবে, সহস্রবান লক্ষ প্রার্থনা করে, লক্ষপতি রাজত্ব কামনা করেন, রাজা সার্ব্বভৌম হইতে চাহেন, সার্ব্বভৌম ইন্দ্রত্বপদ, ইন্দ্র ব্রহ্মার পদ এবং ব্রহ্মা বিষ্ণুপদ বাঞ্ছা করেন। এই প্রকারে উত্তরোত্তর আশার বৃদ্ধি হইতে থাকে।

আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই। সুতরাং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যাহা বলিল, তাহা সত্য নহে। চরিতার্থ বা সম্ভোগ দ্বারা মানবের অভাবদুঃখ নিবৃত্ত হয় না।

"ন জাতু কাম কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ো এবাভি বর্দ্ধতে ॥"

মহাভারত।

উপভোগ দ্বারা কামনা প্রশমিত হয় না; প্রত্যুত ঘৃত দ্বারা যেমন বহ্নি প্রদীপ্ত হয় সেইরূপ ভোগ দ্বারা কামনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সম্মিলন বা সহ্য করিলে যে দুঃখ নিবারিত হয়, তাহা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা জানেন না। যাহা পাইয়াছি, ঈশ্বর যাহা দিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করার নাম সম্মিলন। ঐ সম্মিলন সহ্য করিতে অভ্যাস করিলে দুঃখ নিবারিত হয়। সহ্য করিতে পারিলে রৌদ্র আজি যে কষ্ট দিতেছে, কল্য তাহা দিবে না, পরশ্ব তাহাও দিবে না; কামাদি রিপু আজি যে কষ্ট দিতেছে, কালি তাহা দিবে না, পরশ্ব তাহার কষ্ট আরও নিবৃত্ত হইবে। জ্বর হইয়াছে, সহ্য কর দুই দিন পরে সারিয়া যাইবে। এই প্রকারে যে দুঃখের নিবৃত্তি হয় সেই নিবৃত্তিই প্রকৃত নিবৃত্তি। সম্ভোগ দ্বারা যে দুঃখের নিবৃত্তি, তাহা বাস্তবিক নিবৃত্তি নহে। উহা অধিক দুঃখেরই কারণ মাত্র। এই জন্য অভ্যাস বা যোগই প্রকৃত দুঃখ নিবারণের উপায়।* কিন্তু আজি ঊনবিংশতি শতাব্দীতে

* ইহাতে অনেকে বলিতে পারেন নিবৃত্তিই যদি দুঃখ নিবারণের প্রকৃত হেতু হয়,

উহার চেষ্টা না হইয়া যাহাতে মনুষ্যের দুঃখভার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহারই চেষ্টা হইতেছে। সকলকেই বলা হইতেছে তোমরা সম্ভোগ কর,—কৃষক রৌদ্র ত্যাগ কর, ধীবর জল ত্যাগ কর, সকলে বাবু হও, বিজ্ঞান শেখ, মনুষ্য হও ইত্যাদি।

এইত গেল বিজ্ঞানের দশা। নাস্তিক মহাশয়! আপনি কি ঐ বিজ্ঞানে ঈশ্বর পান না বলিয়া ঈশ্বর মানেন না? উহা কি বিজ্ঞান? কখনই নহে। উহা হাতুড়ের পুথি—উহা বিজ্ঞানের সূত্রপাত—বিজ্ঞানের বর্ণপরিচয়। আর্য্য ঋষিরা প্রকৃত বিজ্ঞানের প্রকৃত চর্চ্চা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়া ছিলেন দুঃখ নিবারণের দুইটী মার্গ—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। তাঁহারা প্রথমে প্রবৃত্তিপথে বহুদিন বিচরণ করিয়া যখন দেখিলেন উহা প্রকৃত পথ নহে, তখন তাঁহারা নিবৃত্তিপথের অনুসরণ করেন। নিবৃত্তি মার্গানুসরণ হইতেই যোগের উৎপত্তি। আমরা যোগের বিষয় পরে আলোচনা করিব। এক্ষণে আমরা নাস্তিক মহাশয় দিগের সহিত আর দুই চারিটী কথাকহিয়া অদ্যকার প্রবন্ধ শেষ করিব। নাস্তিক মহাশয়! পূর্ব্বে তুমি স্বীকার করিয়াছ, তোমার শক্তি বিশেষ অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বকারণ ও দণ্ড-পুরস্কার-দাতা। এক্ষণে তুমি বুঝিলে যে, যে বিজ্ঞানবলে তুমি ধর্ম্ম শাস্ত্রকে অসত্য বলিয়া অশ্রদ্ধাকর তাহা আদৌ বিজ্ঞান নহে—বিজ্ঞানের বর্ণপরিচয় মাত্র। সুতরাং আস্তিকেরা ধর্ম্মশাস্ত্রমতে চলিয়া অন্যায় কার্য্য করেন আর তোমরা বিজ্ঞানমতে চলিয়া ন্যায্য কার্য্য কর একথা বলিবার তোমার অধিকার নাই। তবে এক্ষণে তোমার ঈশ্বর

তবে আহার না করিলে ক্ষুধারূপ দুঃখ অবশ্য নিবারিত হইবে। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? এ প্রবন্ধে সে বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে অত্যন্ত দীর্ঘ হয় এই জন্য এই বলিয়াই এক্ষণে ক্ষান্ত হইতেছি যে, দামুরহুদা নামক গ্রামে একটী স্ত্রীলোক আহার করিত না।—১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ভূকৈলাসে একটী যোগী আনীত হয়, তিনি কিছুই আহার করিতেন না। এবং রণজিৎ সিংহের নিকট এক যোগী উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি বায়ু সেবনও করিতেন না। তাঁহাকে বহুকাল মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। সুতরাং আহার নিবৃত্তিদ্বারা ক্ষুধারূপ দুঃখ নিবারিত হইতে পারে না একথা বলা যায় না।

স্বীকার করিয়া আস্তিকদলে প্রবেশ করিবার বাধা কি? তোমার শেষ আপত্তি ছিল যে, ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে চলিলে ইন্দ্রিয়সংযম, স্বার্থনাশ, দান, ব্রত প্রভৃতি কঠোর কার্য্য করিয়া অনর্থক আত্মাকে কষ্ট দিতে হয়, আর বিজ্ঞান-পথে চলিলে আপনার শরীর সচ্ছন্দ হয়, উন্নতি হয় ও সুখী হইতে পারা যায়। কিন্তু এক্ষণে আর তোমার সেকথা বলিবার অধিকার নাই। কেন না তুমি স্পষ্ট বুঝিলে বৈজ্ঞানিক সম্ভোগ বা প্রবৃত্তি দুঃখের নিদান ও ধর্ম্ম বিজ্ঞানের সংযম বা নিবৃত্তিই প্রকৃত দুঃখনাশের হেতু। যখন দুঃখ নিবারণ করা তোমার মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন তুমি কেন না ধর্ম্মশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া চলিবে? নাস্তিক মহাশয়! এখনও বোধ হয় তোমার আস্তিক হইবার প্রবৃত্তি হয় নাই। তোমার যেন মনে হইতেছে, ঈশ্বর বলিলে যেন কোনও এক প্রকার উচ্চ জীব বিশেষ বুঝায়—তাঁহার যেন দয়া আছে, তাঁহার যেন বিবেচনা আছে, তাঁহার যেন ইচ্ছা আছে, তাঁহাকে যেন উপাসনা করিলে তিনি সন্তুষ্ট হন; শক্তি বিশেষ বলিলে ত তাহা বুঝায় না? বাস্তবিক ঈশ্বরের দয়া, বিবেচনাদির ত কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না? এবং উপাসনায় তুষ্ট হওয়া যখন মানবের পক্ষে দোষাবহ তখন ঈশ্বরের সে গুণ কত অসম্ভব?

এ সন্দেহ তোমার হইতে পারে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানানুশীলনই তোমার এরূপ সন্দেহের মূল কারণ। এই স্থলে তোমাকে আমরা একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। যখন তুমি কোন কার্য্য করিতে গিয়া বিফলমনোরথ হও তখন তুমি পুনরায় সে কার্য্য করিবার চেষ্টা কর কেন? যখন তুমি স্পষ্ট জানিলে যে, তুমি উহা পারিলে না, তখন পুনর্ব্বার তাহার চেষ্টা কর কেন? অবশ্য তুমি মনে ভাব যে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলে তুমি ঐ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবে; অর্থাৎ উপাসনায় শক্তি তোমার প্রতি অনুকুল হইবে—তোমাকে দয়া করিবে। তবে শক্তির উপাসনা নাই কেন? শক্তির দয়া নাই কেন? যখন তুমি সাধনা ব্যতীত কোনও কার্য্য সমাধা করিতে পার না, তখন শক্তির সাধনা নাই কেন? যখন তুমি বলিতেছ সাধিলে সিদ্ধি, তখন তোমার শক্তি বিশেষ সাধনায় বা উপাসনায় তুষ্ট নহেন কেন? তুমি বলিতেছ আস্তিকদিগের ঈশ্বর যেন জীব ভাবাপন্ন। তোমার শক্তিবিশেষ কি জীবভাবাপন্ন নহে?

যে শক্তিবলে তুমি জীব, সমগ্র মানব মণ্ডলী জীব, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ জীব, কীটাণু জীব, উদ্ভিদ্ জীব সে মূল শক্তি জীব ভাবাপন্ন নহে? সে শক্তি কি জীব হইতে নিকৃষ্ট? মানব হইতে নিকৃষ্ট—কীটাণু হইতে নিকৃষ্ট, উদ্ভিদ হইতেও নিকৃষ্ট? যে বুদ্ধি দাতা তাহার বুদ্ধি নাই? যাহা হইতে দয়া উৎপন্ন তাহাতে দয়া নাই? যাহা হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি তাহার চৈতন্য নাই? তাহা যদি হইল তবে সে শক্তি হইতে কি প্রকারে ঐ সকল উৎপন্ন হইল?

আমাদের প্রবন্ধক্রমে বাড়িয়া গেল, সুতরাং এ প্রবন্ধ শেষ করা আবশ্যক। এরূপ গুরুতর বিষয় একটী প্রবন্ধে বুঝান যায় না। ক্রমে আমরা এই পত্রিকায় ইহার স্পষ্ট আলোচনা করিব। আমরা এক্ষণে কেবল ইহাই সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম যে, "ঈশ্বর আছেন একথা প্রমাণ করা যায় না" বাক্যটী সম্পূর্ণ মিথ্যা। ঈশ্বর আছেন ইহা উত্তমরূপে প্রমাণিত হইতে পারে। তবে তাঁহার স্বরূপ কি, উদেশ্য কি, কার্য্য কি তাহা আমরা বুঝি না। এই জন্য ঋষিগণ পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে অবাঙ্মনসোঽগোচর বলিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন "বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ"। ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝা যায় না বলিয়া যদি নাস্তিকেরা ঈশ্বর নাই বলেন, তবে তাহা তাঁহাদের মূর্খতা ভিন্ন নহে। সম্মুখস্থ দ্রব্য অপহৃত হইলে শিশুরা যেমন নাই বলে, নাস্তিকেরাও সেইরূপ ঈশ্বরের স্বরূপ স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে না পারিয়া 'নাই' বলিতেছেন, সুতরাং উহা বালকত্ব ও মূর্খতা ভিন্ন কিছুই নহে।

ঈশ্বর আছেন বুঝিলাম। কিন্তু তাহাতে ফল কি? নাস্তিক যদি এই প্রশ্ন উত্থাপিত করেন তাহা হইলে আমরা বলিব যখন জানিলাম ঈশ্বর আছেন, আমরা স্বাধীন নহি, যাহা মনে আইসে তাহা করিতে পারি না, ঈশ্বর যে নিয়ম করিয়াছেন তদনুসারে চলিতে আমরা বাধ্য, তখন আমরা ঈশ্বরের নিয়ম সকল জানিতে ও তদনুসারে কার্য্য করিবার জন্য চেষ্টা পাই, সুতরাং আমরা সর্ব্ব বিষয়ে সফল-মনোরথ হই। নচেৎ যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারি বিবেচনায় কার্য্য করিলে অশেষ দুঃখ ভাগী হইতে হয়।

আমাদের কার্য্য কি? অর্থাৎ কোন কার্য্য করিবার জন্য ঈশ্বর আমাদের

নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কি করিলে আমরা দুঃখ পাইব না ইত্যাদি জিজ্ঞাসা হইতে আমাদের বিজ্ঞান বা ধর্ম্ম শাস্ত্রের সৃষ্টি। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্র কোনও একটী বিষয় লইয়া নহে। য়ুরোপ যেমন ধর্ম্ম ও কার্য্য ভিন্ন বলেন, বাস্তবিক ধর্ম্ম সেরূপ নহে। যখন ঈশ্বরাভিপ্রেত কার্য্য করার নাম ধর্ম্ম, তখনআমাদের সমস্ত কার্য্যই যে ধর্ম্মের অন্তর্গত হইবে তাহাতে আর কথা কি? শয়ন, উপবেশন, আহার, নিদ্রা, গমন, স্থিতি, বিশ্রাম, কার্য্য, ক্রীড়া সকলই আমাদের ধর্ম্ম বা বিজ্ঞান সম্মত হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ যেরূপ ভাবে ঐ সকল কার্য্য করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত, যেরূপে করিলে আমরা সফলকাম হইতে পারি,—দুঃখ না পাইয়া সুখ প্রাপ্ত হই, সেইরূপ ভাবে সমস্ত কার্য্য করাই আমাদের উচিত। এই জন্য মহর্ষিগণ হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে সকল প্রকার কার্য্যের ব্যবস্থা প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। যখন সকল কার্য্যের সহিতই আমাদের সুখ ও স্বাস্থ্য নির্ভর করে, তখন সকল কার্য্যই যথানিয়মে বা ধর্ম্মভাবে হওয়া আবশ্যক। প্রাতঃস্নান করা উচিত দিবানিদ্রা উচিত নয়, পুনঃ পুনঃ আহার করা দোষ, সকল সময়ে স্ত্রী পুরুষ সম্মিলন অবৈধ, দ্রব্যবিশেষ খাইও না ইত্যাদি ব্যবস্থা মনঃকল্পিত নহে। ঋষিগণ বিজ্ঞানবলে যে সকল কার্য্য প্রকৃত কল্যাণকর ও যাহা করিলে অনিষ্ট হয় বুঝিয়াছিলেন, তাহার করণ ও অকরণ কর্ত্তব্য বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে প্রবেশিত করিয়াছেন। এইজন্য হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র বিজ্ঞানময় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পৃথিবীতে যত ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, তাহার অধিকাংশই কেবল উপাসনা ও কএকটী বিষয়মাত্র লইয়া গঠিত। সুতরাং সে সকলকে প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র অথবা পূর্ণ ধর্ম্মশাস্ত্র বলা যাইতে পারে না। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রই প্রকৃত ও পূর্ণধর্ম্মশাস্ত্র। সামান্য ফুৎকার প্রদান কার্য্যের সহিতও ইহার সম্বন্ধ আছে। এমত কার্য্যেই নাই যাহার করণ বা অকরণ সম্বন্ধে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যবস্থা নাই। যখন স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইল, যে কার্য্যমাত্রেরই সহিত আমাদের সুখ দুঃখ সংসৃষ্ট রহিয়াছে তখন প্রত্যেক কার্য্যেই আমাদের কর্ত্তব্যপর হওয়া আবশ্যক। যে কার্য্য কর্ত্তব্যপর হইয়া না করিব, তাহাই আমাদের দুঃখের কারণ হইবে।

পরকাল ও আপ্তবাক্য।

আমরা গত বারে ঈশ্বর ও ধর্ম্মপ্রবন্ধে যাহা বলিয়াছি—তাহাতে নাস্তিক-গণ তুষ্ট হইবেন বোধ হয় না। কেন না এখনও তাঁহাদের সকল কথার উত্তর হয় নাই। তাঁহারা বলিবেন, মানিলাম এমন শক্তিবিশেষ আছে—তাহার সর্ব্বপ্রকার অধীনত্বে আমাদের থাকিতে হয়, তাহার সাধনা আবশ্যক, সে শক্তি জীবভাবাপন্ন ও দণ্ডপুরস্কারদানশীল, তাহার নিয়ম অনুসারে আমরা চলিতে বাধ্য এবং সেই নিয়মজ্ঞাপক গ্রন্থই মহাবিজ্ঞান বা ধর্ম্মশাস্ত্র; এবং মানিলাম সেই শক্তিই ঈশ্বর। কিন্তু আস্তিকগণ কি বিজ্ঞান বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র মানেন? না ঈশ্বরবাক্য বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রকে মান্য করেন? আর আস্তিকেরা যে মঙ্গলকর সুখকর কার্য্য করিবার চেষ্টা করেন, সে কি ইহকালের মঙ্গল জন্য না পরকালের মঙ্গল জন্য? অবশ্যই বলিতে হইবে, যে আস্তিক-গণ পরকালের মঙ্গল জন্যই ব্যস্ত, এমন কি অনেক আস্তিক ইহকালকে এককালে গ্রাহ্যই করেন না, পরকালের জন্য তাঁহারা ইহকালের সমস্ত সুখ সম্ভোগই পরিত্যাগ করেন। নাস্তিকগণ যখন পরকাল মানেন না মানিতে বাধ্যও নহেন, (কেননা তাহার কোন প্রমাণ নাই) তখন নাস্তিক ধর্ম্মশাস্ত্র মানিবে কেন? আস্তিকদের পরকালের সুখদুঃখদাতা ঈশ্বর মানিবে কেন? ভয়ানক কঠিন কথা! এ প্রশ্নের উত্তর কি হইবে? পরকাল ও আপ্তবাক্যের সত্যতা কি আস্তিক প্রমাণ করিতে পারিবেন? আমাদের বোধ হয় ঈশ্বরপ্রসাদ প্রাপ্ত হইলে আস্তিক ইহার উত্তর প্রত্যক্ষবৎ দেখাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু আমাদের সেরূপ সাধনা নাই, সুতরাং আমরা তাহা পারিব না। তবে পরমপিতার যত টুকু করুণা প্রাপ্ত হইয়াছি

তাহারই বলে আমরা যথাসাধ্য পরকাল ও আপ্তবাক্য সম্বন্ধে বিচার করিবার চেষ্টা করিব।

নাস্তিকমহাশয়! আপনি কি পরকাল মানেন না?—পূর্ব্বকাল মানেন না? আপনার গর্ভ জন্মই কি আপনার আদি ও মৃত্যুই আপনার শেষ? আপনি কি শূন্য হইতে হইয়াছেন? এবং শূন্যেই পরিণত হইবেন? আপনি কোন্ জ্ঞানে কোন্ অভিজ্ঞতাবলে কোন্ বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে পাইয়াছেন যে 'কিছু না' 'কিছু' হয় এবং 'কিছু' কিছু না' হয়? আপনার বিজ্ঞানের যদি এরূপ শক্তি থাকিত তাহা হইলে কখনই বিজ্ঞান পরমাণুতে যাইয়া নিবৃত্ত হইত না। কেন বিজ্ঞান পরমাণুকে বিভাগ করিল না? অবশ্য বলিতে হইবে যে, বিজ্ঞান বুঝিল যতই বিভাগ করা যাউক না কেন পদার্থ বা 'কিছু' কখনই শূন্যে অথবা 'কিছুনাতে' পরিণত হইবে না। সুতরাং উহাকে একটী স্থিতিশীল অবস্থায় রাখা আবশ্যক, নচিলে অনন্ত হইয়া পড়ে। ক্ষুদ্র বিজ্ঞান অনন্তের ভাবধারণ করিতে পারিল না—অনন্তের অন্তকল্পনা করিল। কিন্তু ইহা বুঝিল যে, 'কিছু' কখনও 'কিছু না' হয় না, 'কিছু না' কখনও 'কিছু' হয় না। নাস্তিকমহাশয়! যে বিজ্ঞান আপনার মূলমন্ত্র সে বিজ্ঞান ত 'কিছু না' হইতে 'কিছুর' উৎপত্তি দেখাইতে পারিল না। তবে আপনি কোথায় এরূপ দেখিয়াছেন? 'ভোজবাজিকরেরা—সুনিপুণ বাজিকরেরা অনেক সময়ে 'কিছু না' 'কিছু' করে ও 'কিছু,' 'কিছু না' করে বটে কিন্তু তৎসমস্ত তাহারা মন্ত্রবলে সাধিত হয় বলিয়া থাকে! আপনি কি ভোজ-বাজি—মন্ত্রতন্ত্র বিশ্বাস করেন? কখনই না। তবে আপনি 'কিছু' 'কিছুনা' হয় এবং 'কিছু না' 'কিছু' হয় বলেন কি প্রকারে? ঐ যে বৃক্ষে কদলীটী ফলিয়াছে, উহা যে সময়ে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল সেই সময়েই কি উহার অস্তিত্ব হইল? তাহার পূর্ব্বে কি উহার সত্ত্বা ছিল না? আর ঐ যে কদলীটী তুমি গপাস্ করিয়া খাইয়া ফেলিলে, তাহাতেই কি উহার অস্তিত্বের লোপ হইল? ঐ যে শিশুটী মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া হস্তপদাদি সঞ্চালন করি-তেছে, এইক্ষণেই কি উহার অস্তিত্ব হইল? এবং ঐ শিশু শৈশবে হউক যৌবনে হউক বা বৃদ্ধ বয়সে হউক যখনই হস্তপদাদি সঞ্চালনশক্তিশূন্য হইবে তখনই

কি উহার অস্তিত্বের বিলোপ হইবে? বোধ হয় কখনই তুমি একথা বলিতে পারিবে না। অবশ্যই তোমাকে বলিতে হইবে ঐ কদলী ঐ শিশু পূর্ব্বে বৃক্ষ ও মাতৃগর্ভে ছিল তৎপূর্ব্বে মৃত্তিকা প্রভৃতি পদার্থে বা কোন স্থানে ছিল। এবং যখন ঐ কদলী ও মানব নষ্ট অর্থাৎ কদলীত্ব ও মানবত্ব শূন্য হইবে তখনও মৃত্তিকাদি পদার্থে বা কোন স্থানে থাকিবে। সুতরাং উৎপত্তি ও নাশ অবস্থান্তর ভিন্ন যে আর কিছুই নহে এ[illegible]া তোমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে। তাহা যদি হইল তবে পূর্ব্ব জন্ম [illegible] কেন? পরকাল নাই কেন?

মানব তুমি কি? ও তোমার স্বরূপ কি? যখন তোমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে তুমি পূর্ব্বেও ছিলে এবং পরেও থাকিবে, তখন পূর্ব্বজন্ম ও পরকাল মাননা কেন? তুমি বলিবে যে পূর্ব্বে তুমি ছিলে সত্য কিন্তু কিরূপ ছিলে তাহা তুমি জান না, যাহা জান তাহা সত্য বলিতে হইলে মৃত্তিকাজলাদি ভৌতিক পদার্থমাত্র রূপে ছিলে বলিতে হয় এবং পরেও যাহা থাকিবে তাহাও ঐ ভৌতিক পদার্থরূপেমাত্র। সুতরাং তুমি বলিবে যদিও পূর্ব্বে আমরা ছিলাম ও পরে আমরা থাকিব কিন্তু সে থাকা থাকাই নহে। কেননা সে আমাদের গৌরবকর 'মানব' অবস্থা নহে, সে নিকৃষ্ট জড়াবস্থামাত্র। অর্থাৎ জড়পদার্থ হইতে আমরা জন্মিয়াছি মরিয়া আবার জড়পদার্থ হইব। তাহাতে 'আমির' অস্তিত্ব থাকে না। এ সকল সম্বন্ধে আমরা মানবতত্ত্বে আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং এখানে আর বলিব না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যখন স্বীকার করিতে হইল, আমি বা আমার উৎপাদক পদার্থ চিরকাল আছে ও চিরকাল থাকিবে, তখন তাহাতে যে 'আমিত্ব' ছিল না ও থাকিবে না তাহার অর্থ কি? তাহা যদি না থাকিল তবে দুদিনকার 'আমিত্বে' প্রয়োজন কি? যদি চিরকালই আমরা জড়, তবে দুইদিন 'আমি' হইয়া,—বুদ্ধিমান হইয়া,—অহংতত্ত্বপরায়ণ হইয়া,—জগতের সর্ব্বস্বহইয়া ফল কি? চিরকাল যদি শাক ভাত খাইয়া কাটিয়া গেল তবে একদিনকার বড়মানুষিতে আমার এত গর্ব্ব কেন? আমি যদি চিরকালই জড়, তবে আমি ঈশ্বর না মানিয়া ধর্ম্ম না মানিয়া সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বকর্ত্তা কি রূপে হই? বিশেষতঃ আমার উৎপাদক পদার্থ যদি নিরবচ্ছিন্ন জড় তবে আমার আমিত্ব—আমার

বুদ্ধি—আমার মহত্ত্ব কোথা হইতে হইল? যে পদার্থ হইতে আমার উৎপত্তি তাহাতে যদি আমিত্ব নাই, বুদ্ধি নাই, চৈতন্য নাই, তবে আমার আমিত্ব বুদ্ধি ও চৈতন্য কোথা হইতে হইল? মাটী দিয়া কি সোণার গহনা গড়া যায়? না জল দিয়া মাছ ভাজা যায়? যে পদার্থের যে শক্তি নাই, সে পদার্থ হইতে সে শক্তি কিরূপে উৎপন্ন হইবে? অতএব একথা কখনও বলিও না যে আমার পরিণাম বা আমার শেষাবস্থা সামান্য জড়পদার্থমাত্র।

হয়ত প্রতিবাদকারী বলিবেন যে, সংযোগ দ্বারা পদার্থের গুণাতিরিক্ত শক্তি প্রকাশিত হয়। যেমন নীল ও পীত ইহার কোন পদার্থের হরিতত্ব নাই, অথচ উহাদের সংযোগে হরিত হয়। সেই রূপ পদার্থসকল যখন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় থাকে তখন তাহাতে আমিত্ব বা বুদ্ধি চৈতন্যাদি থাকে না সংযোগ হইলেই আমিত্বাদির উদ্ভব হয়। আমরা বলি একথা নিতান্ত ভ্রমোচ্চা-রিত। কেননা নীল ও পীতে যদি হরিতত্ব নাই, সংযোগেই হরিতত্ব আছে, তবে নীল বা পীতের সহিত জল, মৃত্তিকা বা অন্যবিধ পদার্থের যোগ হইলে হরিত হয় না কেন? মাটি ও জলের যোগে হরিত হয় না কেন? যদি সংযোগই গুণত্বের কারণ হয়, তবে যে কোন পদার্থ যে কোন পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইলে যেন কোন বা ঈপ্সিত পদার্থ হয় না কেন? তাহা যখন হয় না যখন দ্রব্যবিশেষ,—শক্তিবিশেষ উৎপন্ন করিতে হইলে নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যবিশেষ সংযোগ আবশ্যক হয়, তখন সংযোগই গুণত্বের কারণ কি প্রকারে বলিব? তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, যে পদার্থ বা শক্তি যে পদার্থের সংযোগে উৎ-পন্ন সে পদার্থ বা শক্তি সেই পদার্থে গুপ্তভাবে আছে, সংযোগ তাহা প্রকাশ করেমাত্র অর্থাৎ পদার্থবিশেষের যোগে ঐ গুপ্ত (Latent) গুণ আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় হয়মাত্র। চিনির রসের গাদ তুলিবার সময় দুগ্ধমিশ্রিত জল দিতে হয়। দুগ্ধমিশ্র জল দিলে চিনির রস হইতে যথেষ্ট পরিমাণ গাদ উঠিয়া থাকে। তাহাতে কি বলিতে হইবে, যে, দুগ্ধ ও শর্করা সংযোগই ঐ মলত্বের কারণ? উক্ত মলিন পদার্থ শর্করায় ছিল না বলিতে হইবে? কখনই নয়। অবশ্য বলিতে হইবে, শর্করায় যে মলভাগ আছে তাহা দুগ্ধসংযোগে আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং

সংযোগ শক্তিপ্রকাশক ভিন্ন শক্তির উৎপাদক নহে। তাহা যদি হইল, তবে মানবে যে শক্তি আছে তাহা মানবের উৎপাদক পদার্থে নাই কি প্রকারে বলিব? স্থূলদৃষ্টিতে দেখিলে, যেমন তুষারের অন্তর্গত তাপ আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না, সেই রূপ মানবীয় উপাদান মধ্যেও আমরা আমিত্ব চৈতন্যাদির উপলব্ধি করিতে পারি না। ফলতঃ তুষারের অন্তর্ভূত তাপের ন্যায় মানবপরিণামে আমিত্বাদি [illegible] বর্ত্তমান থাকে।

অতএব নাস্তিকমহাশয়! আর বলিবেন না যে, পরকাল নাই—আর বলিবেন না যে, অনন্তকালসাগরে সামান্য ক্ষণের জন্য ভাসমান হইবার জন্য মানব শ্রেষ্ঠপ্রাণীরূপে জগতে আসিয়াছে। আর বলিবেন না যে, বুদ্বুদ জলে মিশাইল, আর জন্মিবে না। সূর্য্য আজি অস্তমিত হইল, আবার কল্য উদিত হইবে। শীতঋতু চলিয়া গেলে আবার নূতন হইয়া আগামী বর্ষে আসিবে, বারিদ বারি বর্ষণ করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইল আবার কলেবর ধারণ করিবে। সূর্য্য, শীত বা মেঘের যেমন বিনাশ হয় না, মানবেরও সেইরূপ বিনাশ হয় না। মানব মরিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। মেঘ যেমন জলরূপে পরিণত হয় এবং সেই জল পুনরায় মেঘরূপে উদিত হয়, সুবর্ণ যেমন কুণ্ডল-রূপে গঠিত হয় আবার সেই কুণ্ডল সুবর্ণে পরিণত হয়, মৃত্তিকা যেমন ঘটরূপে নির্ম্মিত হয়, আবার সেই ঘট পুনরায় মৃত্তিকাসাৎ হয়, সেইরূপ মানবীয় উপাদান মানবরূপে উৎপন্ন হয়, আবার মানব মানবীয় উপাদানে পরিণত হয়। এই প্রকারে সকলেরই ভাগ্য চক্রবৎ নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। বাস্তবিক কাহারও বিনাশ নাই ও কাহারও উৎপত্তি নাই।

নাসতোবিদ্যতেভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপিদৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

মহাভারত ভগবদ্গীতা ॥১৬॥

সৎ কখনও অসৎ হয় না এবং অসৎ কখনও সৎ হয় না। তত্ত্বদর্শীরা এই উভয় অবস্থার অন্তবর্ত্তী ভাব অবগত হইয়াছেন। অর্থাৎ যাহা আছে

তাহা কখনও বিনাশ হয় না এবং যাহা নাই তাহা কখনও উৎপন্ন হয় না। তত্ত্বদর্শীগণ ইহা নিরূপণ করিয়াছে।

বাসাংসিজীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরণি।
তথা শরীরাণিবিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

লোকে যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতনবস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ দেহী জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতনদেহ ধারণ করে।

মেঘ জলরূপে পরিণত হইলে যেমন মেঘের নাশ বোধ হয় কিন্তু বাস্তবিক উহার নাশ হয় না, মানবও সেইরূপ প্রকৃত বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। মেঘজাত জল যেমন পুনরায় মেঘরূপে পরিণত হয় মানব পরিণামও সেইরূপ পুনরায় মানবরূপে উদিত হয়। তবে পূর্ব্বজন্ম নাই কেন? পরকাল নাই কেন?

এক্ষণে একটী কথা আছে। নাস্তিক বলিবেন, 'মানিলাম পরকাল আছে, মানিলাম মানব ও সমুদায় পদার্থ অনন্তকাল হইতে অনন্তকালপর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবে। কিন্তু মানব ইহজন্মের কার্য্যফল যে পরজন্মে ভোগ করিবে তাহার প্রমাণ কি? এক্ষণে আমরা যে সকল কার্য্য করিতেছি তাহা মৃত্যুর পরে কিরূপে আমাদের সুখ দুঃখের কারণ হইবে? এই দুরূহ প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে বটে, ইহার প্রত্যক্ষপ্রমাণ প্রদর্শন করা অত্যন্ত কঠিন বটে কিন্তু যখন স্বীকার করিতে হইল আমরা চিরকাল আছি, চিরকাল থাকিব, তখন আমাদের কার্য্যশক্তি পর পর প্রকাশিত হইবে না তাহার অর্থ কি? যদি বৈজ্ঞানিকবাক্য সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়—যদি বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জল হইয়াছে. জল কঠিন হইয়া মৃত্তিকা হইয়াছে, মৃত্তিকা হইতে ক্রমে ক্রমে উদ্ভিদ, কীট, সরীসৃপ, পশু উৎপন্ন হইয়াছে, এবং পশুবানর হইতে অসভ্য মানব ও অসভ্য মানব দেবতুল্য হইয়াছে স্বীকার করা যায়, তবে পূর্ব্বজন্মকৃত গুণ পরজন্মে সংক্রামিত হয় না

কিপ্রকারে বলিব? যখন সামান্য ঘাসের বীজ উৎকৃষ্ট গোধূমরূপে পরিণত হইয়াছে, যখন জঘন্য বন্যমানব মহাজ্ঞানী ও সভ্য হইয়াছে, তখন পূর্ব্বজন্মকৃত কার্য্যের ফল অনুকৃত হয় না কি প্রকারে বলিব? যখন ভাল পিতা হইতে ভাল পুত্র এবং মন্দ পিতা হইতে মন্দ পুত্র উৎপন্ন হইতেছে, রোগীপিতার রোগীপুত্র ও সুস্থপিতার সুস্থপুত্র হইতেছে, অর্থাৎ যখন শুক্র শোণিত দ্বারা উন্নতি অবনতি, [illegible] অস্বাস্থ্য, দয়া নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি সঞ্চালিত হইতেছে তখন সেই শুক্র শোণিতের উপাদান-পদার্থদ্বারা কেন গুণ দোষ সঞ্চালিত হইবে না? আর যখন সামান্য শুক্র শোণিতের যোগমাত্রেই তুমি আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন সেই শুক্র শোণিতের উপাদান পদার্থ হইতে তুমি আমি গঠিত হইব না কেন? মানব! তুমি কি মনে কর শুক্র শোণিতের সংযোগই মানব দেহ গঠনের একমাত্র কারণ? তাহা যদি হইত তাহা হইলে স্ত্রীপুরুষের মিলন হইলেই সন্তান জন্মিত। কিন্তু তাহা যখন জন্মে না তখন কি ইহাই বুঝিতে হইবে না যে, যে শুক্র-শোণিতে আত্মিক পদার্থ নাই তাহার সংযোগে সন্তান হয় না। ঐ আত্মিক পদার্থই সকলের আদি। মৃত্যুর পরে ঐ আত্মিকপদার্থ সমভাবে রহিয়া যায়, ভোগ্যপদার্থ সহ ঐ আত্মিকপদার্থ শরীরে প্রবিষ্ট হয় এবং শুক্র শোণিতদ্বারা মিলিত হইয়া অভিনব দেহবিশিষ্ট হয়। এমনও সম্ভব যে শুক্রে ঐ আত্মিকপদার্থ এবং শোণিতে দৈহিকপদার্থের বীজ আছে। উহাদের মিলন হইলে জীব দেহবিশিষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে এক্ষণে অধিক বলার আবশ্যক নাই। এ দুরূহ বিষয় আমাদের স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এক্ষণে এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, যে, যাহা যতদিন থাকিবে তাহার গুণেরও তত দিন অনুবৃত্তি চলিবে। তোমার বাল্যকালের কার্য্যের ফল যদি বৃদ্ধকালে পাও, তবে পূর্ব্বজন্মের কার্য্যের ফল ইহ জন্মে পাইবে না কেন? কেননা বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের ন্যায় পূর্ব্বকাল ও পরকালও অবস্থান্তরবিশেষমাত্র।

তুমি মানব! মহাপ্রাজ্ঞ, বলবান, বুদ্ধিমান, কার্য্যকুশল, চিন্তারত। কিন্তু বাল্যকালে কি ঐ সকল তোমাতে ছিল? তখন কি তোমার দেহ

নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না? তখন তোমার বুদ্ধি, ইচ্ছা, যত্ন প্রভৃতি যাহা ছিল তাহা কি তোমার উপযুক্ত না? সে সকল স্মরণ করিয়া এক্ষণে তুমি হাস্য সম্বরণ করিতে পার? তখন তোমার শ্মশ্রু ও দন্ত ছিল না, স্ত্রীসম্ভোগাশক্তিসুখ-জ্ঞান ছিল না, বিষ্ঠা মূত্রে অশ্রদ্ধা ছিল না, উন্নতির দিকে, কার্য্যের দিকে, শঠতার দিকে মন ছিন না, অধিক কি এখন তোমাতে যাহা আছে তখন তাহার কিছুই ছিল না; আবার অতি প্রাচীন বয়সে এখন কারও প্রায় কিছুই থাকিবে না। আবার যখন তুমি গর্ভে বাস করিয়াছিলে, তখন বাল্যকালে যাহা ছিল তাহারও কিছু ছিল না। ঐ সকল অবস্থার সহিত তোমার বর্ত্তমান অবস্থার কিছু মিল না থাকিয়াও যেমন ঐ সকল তোমারই অবস্থান্তর ভিন্ন অন্য কিছু নহে, গর্ভের পূর্ব্ব ও বৃদ্ধাবস্থার পরবর্ত্তী অবস্থাও সেই রূপ তোমারই অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং ঐ গর্ভাদিকালে কৃতকার্য্যের ফল যেমন তুমি ভোগ করিতেছ উহার পূর্ব্বের অবস্থায় কৃতকার্য্যের ফলও সেই রূপ তুমি ভোগ করিতেছ। তাহা না বলিলে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি থাকে না। এই জন্য মহাভারতকার বলিয়াছেন;—

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি র্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ ১৩॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

এই দেহে যেরূপ বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা দেহান্তর প্রাপ্তি ও সেই রূপ দেহীর অবস্থান্তরমাত্র। পণ্ডিতগণ তাহাতে মোহিত হয়েন না।

অতএব নাস্তিকগণ! খ্রীষ্টানগণ!* ব্রাহ্মগণ এমন কথা বলিও না যে

---

* খৃষ্ট সম্প্রদায় কেন? ব্রাহ্মগণ পরকাল মানেন বটে, কিন্তু পূর্ব্ব জন্ম মানেন না। ও কথা যে কতদূর অসম্ভব তাহা মানবতত্ত্ব পাঠে জানা যাইবে। খৃষ্ট সম্প্রদায়ীদিগের উক্তমত অপেক্ষা নাস্তিকদিগের মত শ্রেষ্ঠ কেন না শূন্য হইতে যদি কিছু জন্মিতে পারে তবে কিছুও শূন্য হইতে পারিবে। খৃষ্ট সম্প্রদায়ীরা অনন্ত পদার্থকে সাদি বলিয়া বিজ্ঞান ও যুক্তির মস্তকে পদার্পণ করিয়াছেন। মানবতত্ত্বে ইহার আলোচনা হইয়াছে এইজন্য এক্ষণে তাহার আলোচনা হইল না।

আমরা পূর্ব্বজন্মের ফলভোগ করি না। এ কথা বলিও না যে, পদার্থ থাকিবে অথচ তাহার গুণ বা শক্তি থাকিবে না। বিজ্ঞান এক্ষণে প্রমাণ করিয়াছে যে কোনও পদার্থ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। গুণ বা শক্তিরই সত্তা আমরা উপলব্ধি করি—এবং ঐ গুণ হইতে উহার আধার স্বরূপে জড়পদার্থ কল্পনা করি মাত্র। অতএব গুণবর্জ্জিত পদার্থ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতেও অসম্ভব।

ক্রমশঃ

হিন্দু-ধর্ম্ম বিষয়ক আন্দোলন।

—*—

হিন্দুমাত্রেই হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থানে পরম আহ্লাদিত। আমি হিন্দু—আমিও হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থানের কথা শুনিলে আহ্লাদিত এবং উৎসাহিত হই। আজকাল হিন্দুধর্ম্ম লইয়া খুব আন্দোলন চলিতেছে—যেন হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে সকলে সাতিশয় উৎসাহিত। এ দৃশ্য অতি মনোহর—যারপর নাই তৃপ্তিকর। এক দিন ষ্টার থিয়েটরে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম। থিয়েটর লোকে পরিপূর্ণ—লোকের গায় লোক, মাথার কাছে মাথা—লোক অসংখ্য অগণ্য—স্থির, নিস্তব্ধ, গম্ভীর, সম্ভ্রমপূর্ণ। অপরূপ দৃশ্য! বোধ হইল তেমন দৃশ্য বহুকাল ভারতে দেখা যায় নাই। ধর্ম্মের প্রসঙ্গে যেখানে এমন দৃশ্য দেখা যায় ধর্ম্ম সেখানে বিলুপ্ত হইয়া থাকিলেও অবশ্যই আবার পুনর্জীবিত

হইবে। যাঁহারা আজিকার ধর্ম্মবিষয়ক উৎসাহ দেখিয়া উপহাস করিয়া বলিতেছেন—'এসব কিছুই নয়, হুজুগে বাঙ্গালির হুজুগমাত্র, দুইদিন পরে ইহার কিছুই থাকিবে না'—তাঁহারা একান্তই ভ্রান্ত। আমি স্বীকার করি—বর্ত্তমান উৎসাহ অস্থায়ী হইতে পারে, আজ আছে কাল না থাকিতে পারে, আজিকার হুজুগ কালিকার হুজুগে উড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু স্বীকার করিয়াও আমি অকুতোভয়ে আমার [illegible] বিশ্বাস জ্ঞাপন করি যে, যে অধম এবং পতিত জাতির মধ্যে এমন দুর্দিনেও ধর্ম্মপ্রসঙ্গে এমন দৃশ্য দেখা যায় সে জাতি চিরকাল হুজুগে জাতি থাকিবে না, থাকিতে পারিবে না—সে জাতি আজি না হয় কালি, কালি না হয় পরশ্ব, অবশ্যই একদিন ধর্ম্ম লইয়া মাতোয়ারা হইয়া উঠিবে, ধর্ম্মের প্রভাবে জগতে প্রকৃত প্রভাবশালী হইবে। অতএব আজিকার উৎসাহ উড়িয়া গেলেও আমি ভীত বা চিন্তিত হইব না। তাই আজিকার আন্দোলনের দিনে হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থান সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব মনে করিয়াছি।

হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আন্দোলনে দুইটি মত প্রকটিত হইতেছে। অর্থাৎ যে প্রণালীতে হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার করা আবশ্যক সেই প্রণালী সম্বন্ধে দুইটি বিভিন্ন মত ব্যক্ত করা হইয়াছে। একপক্ষ বলিতেছেন যে হিন্দুর আচার ব্যবহার ইত্যাদি যেমন আছে তেমনি থাকুক কেবল সেই গুলির প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া লইলেই চলিবে। জাতি ভেদ যেমন আছে তেমনি থাকুক কেবল জাতি ভেদের প্রকৃত অর্থ এবং হিতকারিতা বুঝিয়া লও। ভক্ষ্যাভক্ষ্য সম্বন্ধে যেমন ব্যবস্থা আছে তেমনি ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার কর কিন্তু সেই ব্যবস্থার অর্থ বুঝিয়া লও। মোট কথা এই, হিন্দুর বারব্রত একাদশী দ্বাদশী প্রায়শ্চিত্ত পুরশ্চারণ পূজা পদ্ধতি খাওয়া দাওয়ার নিয়ম যেমন আছে তেমনি পালন করিতে থাক, কেবল সবগুলির অর্থ বুঝিয়া লও। কোন পরিবর্ত্তন করিও না। আর একপক্ষ বলিতেছেন যে সব পালন করিবার আবশ্যক নাই, সকলই কিছু ধর্ম্ম নয়, অতএব যাহা এখন আবশ্যক নাই অথবা অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে তাহা পরিত্যাগ কর এবং যাহা এখন নিষিদ্ধ তাহা ইষ্টকর বুঝিলে গ্রহণ কর। ফলকথা এই যে একপক্ষ যেমন আছে সকলই তেমনি

রাখিতে চান, কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করিতে দিবেন না; আর একপক্ষ প্রয়োজন মত পরিবর্ত্তন করিয়া এবং বাদ সাদ দিয়া লইতে চান। এই দুই পক্ষের মধ্যে আমরা দ্বিতীয় পক্ষের প্রণালীর অনুমোদন করি।

যাঁহারা বলেন যে সংস্কারের প্রণালীতে পরিবর্ত্তনের স্থান থাকিতে পারে না, তাঁহাদিগকে আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। পৃথিবীতে সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, কিছুই এক অবস্থায় মুহূর্ত্তকাল থাকে না। এই জন্য বৌদ্ধেরা বলিতেন যে সংসার বেগবতী তরঙ্গিণীর ন্যায় অনবরত চলিতেছে, তাহাতে কিছুই মুহূর্ত্তকাল মাত্র একস্থানে এক অবস্থায় থাকে না। এবং এই জন্যই হিন্দুদর্শনকারদিগের মতে এক পরব্রহ্ম ছাড়া সকলই বিকারগ্রস্ত অর্থাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। মানুষও পরিবর্ত্তনশীল। মানুষ শৈশবে এক রকম, যৌবনে আর এক রকম, প্রৌঢ়াবস্থায় আরও এক রকম, বৃদ্ধ বয়সে সকল অবস্থা হইতে ভিন্ন। আবার মনুষ্য সমাজ সকল সময়ে সমান অবস্থায় থাকে না। হিন্দুশাস্ত্রেই বলে যে যুগে যুগে মনুষ্য সমাজ ভিন্ন ভিন্ন রীতি নীতি আচার ব্যবহারের অনুগামী হইয়া থাকে অর্থাৎ মনুষ্য সমাজ যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু মনুষ্যের পরিবর্ত্তন হইলেই মানবধর্ম্মনীতিরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। হিন্দুশাস্ত্রেই বাল্যকালের নিমিত্ত এক রকম ধর্ম্মনীতি, যৌবনের নিমিত্ত আর এক রকম ধর্ম্মনীতি, প্রৌঢ়াবস্থার নিমিত্ত তৃতীয় প্রকার ধর্ম্মনীতির ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। তেমনি আবার যুগবিশেষের নিমিত্ত ব্যবস্থা বিশেষ নির্দ্দিষ্ট আছে। এক সময়ে অসবর্ণ বিবাহের বিধি ছিল, ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনের বিধি ছিল, অনুলোম প্রতিলোম বিবাহের বিধি ছিল, ইত্যাদি। এখন সে সব বিধি নাই। ইহার অর্থ এই যে সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইলেই সমাজনীতিরও পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক; এবং হিন্দুজাতির ইতিহাসে তাহাই হইয়াছে। অতএব এখন যদি পূর্ব্ব হইতে আমাদের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে তবে সেই পরিবর্ত্তনের ভাব ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের যে সকল বিধির যে রকম পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হয় সে রকম পরিবর্ত্তন কেন না হইবে এবং সে রকম পরিবর্ত্তন করিলে তাহা কিসে দূষণীয়? পূর্ব্বে যদি

বিধিব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিতে পারে তবে এখন কি জন্য না হইবে? পরিবর্ত্তন-বিরোধীরা হয়ত বলিবেন, এখন কে পরিবর্ত্তন করিবে এবং কাহার কথা শুনিয়া পরিবর্ত্তন গ্রাহ্য করিব? কথাটা কিছু কঠিন বটে, কিন্তু ইহার অতি উত্তম মীমাংসা আছে। পূর্ব্বকালে যখন হিন্দুর হিন্দুরাজা ছিল তখন শাস্ত্রকার যে সকল পরিবর্ত্তন ব্যবস্থা করিতেন রাজাকে তাহা গ্রহণ করিতে হইত এবং রাজা গ্রহণ করিলে সম[illegible]াজকর্ত্তৃক তাহা গৃহীত হইত। এখন হিন্দুরাজা নাই—অতএব সে সহজ প্রণালী এখন খাটে না। তা বলিয়া কি কোন প্রণালী খাটে না? খাটে। সমাজ রাজার রাজা। সমাজ যাহা আবশ্যক বলিয়া বুঝিবেন, তাহা নূতন হইলেও সমাজ কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে। রাজা সমাজের প্রতিনিধি মাত্র। তাই রাজা থাকিলে সমাজ স্বয়ং কিছু না করিয়া রাজার কার্য্যের অনুসরণ করে মাত্র। কিন্তু সমাজের প্রতিনিধির অভাব হইলে সমাজ অবশ্যই স্বয়ং প্রতিনিধির কার্য্য করিবে। না করিলে, দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া ক্রমে লয়প্রাপ্ত হইবে। অতএব আজিকার হিন্দুসমাজের বিধিব্যবস্থার যদি পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে বাধ্য এবং অবশ্যই করিয়া লইবে। তুমি বলিবে, কাহার কথায় সমাজ পুরাতন বিধিব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিবে? আমি বলি, যুক্তি এবং তর্কের দ্বারা যে সমাজকে বুঝাইতে পারিবে যে পরিবর্ত্তন আবশ্যক, সমাজ তাহারই কথায় পুরাতন বিধিব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিবে। সে তর্কযুক্তিতে অনেকেই নিযুক্ত হইবেন, তাহাতে অনেক দিক্ হইতে অনেকে অনেক রকম কথা বলিবেন, তাহা হয়ত অনেক দিন ধরিয়া চলিবে। কিন্তু শেষে একপক্ষ অবশ্যই জয়ী হইবে—যে পক্ষ জয়ী হইবে সে সত্যের পক্ষ। তখন সেই সত্যের পক্ষের কথায় সমগ্র হিন্দুসমাজ পুরাতন বিধিব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিবে। যে যুক্তির উপর সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র স্থাপিত, যে যুক্তির বলে পূর্ব্বেও সময়ে সময়ে হিন্দুশাস্ত্রের বিধিব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল, এখনও পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে সেই যুক্তির বলে হিন্দুশাস্ত্রের বিধিব্যবস্থায় পরিবর্ত্তন ঘটিবে। তবে পূর্ব্বে হিন্দুরাজা ছিল বলিয়া যুক্তির ফল শীঘ্র পরিগৃহীত হইত, এখন হিন্দু-রাজা নাই বলিয়া না হয় সে ফল পরিগৃহীত হইতে কিছু সময় লাগিবে।

প্রভেদ এইটুকু মাত্র—আর কিছুই নয়। একথা না বুঝিয়া যাঁহারা বলিতেছেন যে পুরাতন বিধিব্যবস্থা যেমন আছে ঠিক তেমনি রাখিতে হইবে, তাঁহারা সমাজ কাহাকে বলে আদৌ জানেন না। এবং সামাজিক বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের কথা কহিতে কিছু মাত্র অধিকার নাই। পরিবর্ত্তন-বিরোধীরা লোককে বলিতেছেন যে আমাদের সমস্ত বিধিব্যবস্থা বিজ্ঞান সম্মত, অতএব তাহা পরিত্যাগ বা পরিব[illegible] করিলে আমাদের ধর্ম্মলোপ এবং বিশেষ অনিষ্ট হইবে। আমাদের বিধিব্যবস্থা বিজ্ঞান সম্মত কি না আমি বলিতে পারি না, যাঁহারা সেইরূপ বুঝাইতেছেন তাঁহাদের কথা আমি বুঝিতে পারি না, আমার বোধ হয় যেন তাঁহারা নিতান্তই টানিয়া বুনিতেছেন। তবে আমি একথা বলিতে পারি যে পরিবর্ত্তন-বিরোধীরা যে রকম বিজ্ঞানের সহিত হিন্দুদিগের বিধিব্যবস্থার সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিতেছেন, আমাদের প্রাচীন বিধিব্যবস্থাপকেরা সে রকম বিজ্ঞান জানিতেন না। কিন্তু সে কথা ও আমি ধরি না। কারণ প্রাচীন বিধিব্যবস্থাপকের আধুনিক বিজ্ঞান না জানিলেও যদি এমন বুঝা যায় যে তাঁহাদের বিধিব্যবস্থার সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের মিল আছে, তাহা হইলেই সে বিধিব্যবস্থা বিজ্ঞানমূলক না হইলেও আদরণীয় এবং ইষ্টকর বলিয়া স্বীকার্য্য। কিন্তু একটি কথা আছে। ইষ্টের ত পরিমাণ আছে, ইষ্ট ত কমবেশী হয়। ভিন্নবর্ণের অন্ন-গ্রহণ করা তুমি অনিষ্টকর বলিয়া প্রমাণ করিতে পার। কিন্তু তাই বলিয়া কি এমন সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে কোন কালে এবং কোন অবস্থাতে ভিন্ন-বর্ণের অন্ন গ্রহণ করা যাইতে পারিবে না। আমি যদি এরূপ প্রমাণ করিতে পারি যে ভিন্ন বর্ণের অন্ন গ্রহণ করিলে যত অনিষ্ট হয়, ভিন্ন বর্ণের অন্ন গ্রহণ না করিলে তাহার অপেক্ষা বেশী অনিষ্ট হয়, তাহা হইলেও কি ভিন্ন বর্ণের অন্ন গ্রহণাযোগ্য বলিতে হইবে?

আর এক কথা। বিজ্ঞানের দ্বারাই যদি হিন্দু বিধিব্যবস্থার পরীক্ষা করিতে হয়, তবে আমিবলি, সে কাজটা ধর্ম্মশাস্ত্রবেওার হাতে না দিয়া বিজ্ঞানবিদের হাতে দিলেই ভাল হয় না? এবং যুক্তিযুক্ত হয় না? হিন্দু মুর্গীর মাংস খাইতে পারিবে কি না একথাটা ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা দ্বারা মীমাংসিত

না হইয়া বিজ্ঞানবিদের দ্বারা মীমাংসিত হইলেই ভাল হয় না? তুমি বলিবে যে আহারের উপর মনের অবস্থা নির্ভর করে এবং মনের অবস্থার উপর ধর্ম্ম-চর্য্যা নির্ভর করে, অতএব আহার নিরূপণ করাও ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তার কাজ। আমি বলি ঠিক তা নয়। আমি বলি, ধর্ম্মচর্য্যার নিমিত্ত মনের কিরূপ অবস্থার প্রয়োজন তখন মনকে সেই রূপ অবস্থায় রাখিবার নিমিত্ত কিরূপ আহার আবশ্যক বিজ্ঞানবিদ্ ঠিক করিয়া দিবেন, ইহাই এরকম বিষয়ে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি।

যদি বিজ্ঞানের দ্বারাই বিধিব্যবস্থার পরীক্ষা করিতে হয় তবে আরো একটা কথা বিবেচনা করা আবশ্যক। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিকে যতই অধ্যয়ন করিতেছেন প্রকৃতিকে তিনি ততই নূতনভাবে দেখিতেছেন। তাই বিজ্ঞান কাল যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছিল আজ তাহা ভ্রমমূলক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছে। এমন স্থলে মনু বা যাজ্ঞবল্ক্য আহার্য্য বা অনাহার্য্য বা অন্য কোন বিষয় সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তাহা যে চিরকালই অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থির থাকিবে, ইহাই বা কেমন কথা? এরকম কথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা বিজ্ঞানের প্রকৃতিই জানেন না। তাঁহাদের এসকল বিষয়ে কথা কহিবার কোন অধিকার নাই। অতএব আজিকার বিজ্ঞান যদি মনুর বিজ্ঞানকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে তাহা হইলেও কি মনুর ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে না? যাঁহারা পরিবর্ত্তনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা শোর গরু খাইবার জন্য পরিবর্ত্তন কামনা করেন না। যাঁহারা সেরূপ বলেন বা মনে করেন তাঁহারা অতি নীচপ্রকৃতির লোক—তাঁহাদের সহিত আমরা কথা কহি না। আমরা এইরূপ বুঝি, যাঁহারা পরিবর্ত্তনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারাই হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতবন্ধু, তাঁহাদের দ্বারাই হিন্দুধর্ম্ম পুনর্জীবিত হইবে। আর যাঁহারা পরিবর্ত্তনের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন তাঁহারাই হিন্দুধর্ম্মের শত্রু, কিন্তু তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের কি ইষ্ট কি অনিষ্ট কিছুই করিতে পারিবেন না, দুই দিন বাদে কোথায় চলিয়া যাইবেন তাহার ঠিকানা থাকিবে না।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

বেদ রহস্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

বেদসম্বন্ধে কোন অনুগত লক্ষণ দেখা যায়না বলিয়া আপাততঃ কোন প্রমাণ দ্বারা বেদবস্তু স্থির করা বড় কঠিন। দার্শনিকগণ স্ব স্ব বুদ্ধি-শক্তির সূক্ষ্মতানুসারে কেহ চারিটি'—কেহ ছয়টি—কেহ তিনটি—এইরূপ প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন। যিনি যত প্রকার প্রমাণ স্বীকার করুন তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ, অনুমান আর আগম এই তিনটী প্রমাণ বলবৎ। এক্ষণে আমরা 'আগম' এই প্রমাণদ্বারা বেদবস্তু স্থির করিতে পারি কি না তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া যাইতেছে। আগমই বেদের লক্ষণ—বেদ-সম্বন্ধে এরূপনির্দ্দেশ করিলে মনু, পরাশর প্রণীত স্মৃতিগ্রন্থে ঐ লক্ষণ সঙ্গত হইতে পারে কি না? সময়ের কোন বিশেষ শক্তি সংযোগে যাহা দ্বারা সম্যক্ রূপে পরোক্ষ (অতীন্দ্রিয়) বস্তুর অনুভব সাধন হয়, তাহার নাম আগম—এবং তাহারই নাম আগমের লক্ষণ—এরূপ নির্দ্দেশ করিলে মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে অবশ্য বেদের লক্ষণ ঘটিতে পারে।

আগমকে বেদের লক্ষণ কি প্রমাণ বলিলে চলিবে না' তাহা উপরে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এক্ষণে বেদের অন্য একটী সূত্র করা নিতান্ত আব-শ্যক। যথা—যাহা অপৌরুষেয় তাহার নাম বেদ। বেদের এরূপ লক্ষণ করিলেও চলিবে না,—অর্থাৎ এরূপ সূত্রে দোষ ঘটিয়া থাকে। বেদ যখন বেদপুরুষ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে' তখন বেদকে অপৌরুষেয় না বলিয়া পৌরুষেয় বলাই উচিত। যাহা শরীরধারী জীবদ্বারা নির্ম্মিত নহে তাহার নাম অপৌরুষেয়। এরূপ লক্ষণেও দোষ ঘটিয়া থাকে। কারণ, সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা—পরমেশ্বর

যে শরীরধারী, তাহা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আমরা শরীর দ্বারা কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকি—আমাদের শরীরস্থিত জীব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে কিন্তু পরমেশ্বরে যে জীব চৈতন্য আছে, তাহা অস্মদাদির দেহস্থ জীব হইতে স্বতন্ত্র—নূতন—অদ্ভুত। সুতারাং পরমেশ্বরের জীবচৈতন্য আমাদের মতন কর্ম্মফল ভোগ করে না। অতএব 'কর্ম্মফলরূপ শরীরধারী জীববিশেষ দ্বারা নির্ম্মিত না হইলেই তাকে অপৌরুষেয় বলা যাইবে, বেদের এরূপ লক্ষণেও মহাদোষ ঘটিয়া থাকে॥ কারণ বেদের অনেক স্থানে উক্ত হইয়াছে যে, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতি জীববিশেষ দ্বারা বেদ নির্ম্মিত হয়। শ্রুতি যথা—

"ঋগ্‌বেদ এবাগ্নেয়জাযত যজুর্ব্বেদো বায়োঃ সামবেদ আদিত্যাৎ"

অস্যার্থ—অগ্নি হইতে ঋক্‌বেদ—বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ—সূর্য্য হইতে সামবেদের উৎপত্তি হয়। অতএব কিছুতেই বেদকে অপৌরুষেয় বলিতে পারা যায় না। বেদের লক্ষণ ও প্রমাণ সম্বন্ধে যে দুইটি কথা উপরে উল্লিখিত হইরাছিল, এক্ষণে সে সকল কথা বৃথা হইল। বস্তুতঃ বেদের সূত্র সম্বন্ধে বিশেষ শঙ্কা, সন্দেহ ও আপত্তি ঘটিয়া থাকে।

এক্ষণে বেদসম্বন্ধে তৃতীয় সূত্র নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। যথা—"বেদের মধ্যে যে মন্ত্রভাগ এবং ব্রাহ্মণভাগ আছে ঐ মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মক শব্দরাশির নাম বেদ।" বেদের এরূপ লক্ষণ করিলেও চলিতে পারে না। কারণ "মন্ত্র এইরূপ—ব্রাহ্মণ এইরূপ" অদ্যাপি ঐ উভয় বিষয়ের স্পষ্ট নির্ণয় করা হয় নাই। সুতরাং বেদ কাহাকে বলে? এসম্বন্ধে যে কোন প্রমাণ কি লক্ষণ নাই—তাহা একরূপ সিদ্ধান্ত করা হইল। আমরা অন্য পক্ষের লোক—আপনাদের মুখ হইতে শুনিলাম যে, বেদের কোন লক্ষণ নাই—বেদের কোন প্রমাণ নাই। আপনারা স্পষ্ট বলিলেন যে, আমরা বেদের কোন প্রমাণ বা লক্ষণ দেখিতে পাই নাই।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—বেদবাক্যদ্বারা বেদের প্রামাণ্য স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। যথা—

"ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থম্।"

অর্থাৎ—হে ভগবন্! আমি ঋক্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ এবং চতুর্থ অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিব। এইরূপ বেদবাক্যকে বেদের প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে বেদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে আত্মাশ্রয় দোষ ঘটে। অর্থাৎ সমুদয় বেদবাক্য বেদান্তের অন্তঃপাতী হইলে বেদের প্রমাণ বেদান্ত—এবং বেদান্তের প্রমাণ বেদ—এরূপ দোষ কিছুতেই নিরাকৃত হয় না। কারণ যেরূপ জগতে অত্যন্ত দক্ষ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জন্মিলেও—আপনার স্কন্ধে আপনি আরোহণ করিতে পারে না, ত[illegible] বেদ জগতের মধ্যে উৎকৃষ্ট বস্তু হইলেও কিছুতেই বেদদ্বারা বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে পারে না।

অপরে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন—

"বেদ এক দ্বিজাতীনাং নিঃশ্রেয় সকরঃ পরঃ।"

অস্যার্থ দ্বিজাতিগণের একমাত্র বেদই মোক্ষদায়ক। এরূপ স্মৃতিবাক্যই বেদের প্রমাণ হইবে ?। "এরূপ নির্দ্দেশ করিলে পুনরায় পূর্ব্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা হইয়া থাকে। বেদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্র কখনই প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ, সমুদয় স্মৃতিশাস্ত্রের মূল বেদ। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত স্মৃতিবচনের প্রয়াগ করা ব্যর্থ ও অনুপযুক্ত হয় মাত্র।

তিনটি প্রমাণের মধ্যে যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা যায়, তাহাতেও অনেক গুলিন দোষ থাকিবার সম্ভাবনা। বেদ সকলজনের হিতসাধনার্থ এবং প্রত্যক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকিলেও উহাতে বিশেষ ভ্রম লক্ষিত হইয়া থাকে। "নীলং নভঃ" নীলবর্ণ আকাশ যেরূপ সকলের প্রত্যক্ষ হইয়াও ঐ কথাটি ভ্রমাত্মক বলিয়া বিখ্যাত, তদ্রূপ বেদ প্রত্যক্ষ হইলেও ভ্রমাত্মক প্রমাণ দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। কারণ, চক্ষে বেদ দেখিলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, চক্ষে যাহা দেখা যায় তাহা বেদ নহে। বেদবস্তু প্রত্যক্ষ হইবার নহে—কেবল অক্ষর রাশি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে মাত্র। এইরূপে বেদবস্তুসম্বন্ধে নানাবিধ সন্দেহ ও আপত্তি ঘটিয়া থাকে, পূর্ব্বোক্ত আপত্তি সকল, বেদের লক্ষণ ও প্রমাণ সম্বন্ধে সন্দেহ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। যাঁহারা বেদের অস্তিত্বে অথবা বেদের প্রমাণ বা লক্ষণ সম্বন্ধে—এরূপ সন্দিহান চিত্ত, অথবা

অকাট্যযুক্তি ও অখণ্ডনীয় আপত্তি দেখাইয়া বেদের অপকর্ষসাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প—তাঁহারা বেদসম্বন্ধে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া বা গম্ভীর আপত্তি দেখাইয়া বেদের মহিমা হ্রাস করিয়া থাকেন।

এইরূপ শত শত অখণ্ডনীয় আপত্তিসত্বেও কেহ কখন বেদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে দোষার্পণ করিতে সক্ষম হইবেন না। এক্ষণে আমরা একে একে পূর্ব্বোক্ত আপত্তি সকল খণ্ডন করি। বেদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে যতটুকু স্থির করিতে পারিয়াছি, তাহাই অদ্যকার প্রবন্ধে সমালোচিত হইবে। এক্ষণে বলা যাইতেছে—যদি মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক শব্দ রাশিকে বেদ বলা যায় এবং তাহাকেই বেদের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় তাহাতে দোষ কি? তাহাতে সর্ব্ব সাধারণের আপত্তি কি? মহর্ষি আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রে যজ্ঞ পরিভাষায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়মিতি।"

অস্যার্থ—মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণের নাম বেদ। মন্ত্র কাহাকে বলে? ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে? বেদে মন্ত্র ব্রাহ্মণের বিষয় স্পষ্টরূপে নির্ণীত হইয়াছে। যাঁহারা বেদকে অপৌরুষেয় বাক্য বলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য আছে, তাহাও বেদে স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে। বেদের অস্তিত্বসম্বন্ধে কেবল যে শ্রুতি প্রমাণ তাহা নহে, কিন্তু স্মৃতি, পুরাণ, লৌকিক সমস্ত বিষয় বেদের জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ বলিয়া জানিতে হইবে। জগতে ঘটপটাদি জড় পদার্থ সকল স্বপ্রকাশ নহে—কিন্তু সূর্য্য চন্দ্রাদি তৈজস পদার্থের প্রকাশে জড়পদার্থ সকল স্বপ্রকাশ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ অপরের প্রকাশগুণে জড়পদার্থের প্রকাশগুণ স্বীকার করিলে দোষ কি? সুতরাং মনুষ্যগণ আপনার স্কন্ধে আরোহণ করিতে না পারিলেও অপরের সাহায্যে আরোহণী শক্তি জন্মিলে ক্ষতি কি?। বেদের শক্তি অকুণ্ঠিত এবং অপ্রতিহত—এরূপ অনন্তশক্তিময় বেদদ্বারা সামান্য বস্তু যেমন প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ বেদদ্বারা আত্মবস্তু প্রতিপন্ন হইবার বাধা কি?। মনুষ্য যখন ঐশ্বরিক বলে বলিষ্ঠ হইতে পারে, তখন তাহার পক্ষে আপনার স্কন্ধে আরোহণ করা অতি সামান্য ও সহজ কথা। সুতরাং অপ্রতিহত ও অকুণ্ঠিত

শক্তি সম্পন্ন বেদপদার্থদ্বারা বেদের অস্তিত্ব বা প্রামাণ্য সিদ্ধ হইলে কোন দোষ ঘটিতে পারে না।

ক্রমশঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ।

---*---

যোগ বা নিত্যানন্দ লাভের উপায়।

---*---

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

মনে কর রাত্রি দুই প্রহর হইয়াছে—বর্ষাকাল—চারিদিকে ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে—গৃহের অভ্যন্তরে আলোক জ্বলিতেছে—অকপট সরলসহৃদয় বন্ধুর সহিত একত্রে উপবেশন করিয়া বসিয়া আছে—সুন্দর কথোপকথন চলিতেছে—এরূপ হইয়া এ অবস্থায় অবস্থিত হইলে মনে একতর আনন্দ উপভোগ হইতে থাকে—কিন্তু এ আনন্দ অল্পক্ষণস্থায়ী; অল্পক্ষণস্থায়ী হইলেও আনন্দ উপভোগ হয় একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

ভয়ানক গ্রীষ্ম গাছের পাতাটী নড়িতেছে না—শরীরে দরদর করিয়া ঘর্ম্মধারা নিঃসৃত হইতেছে—এমন সময়ে আদ্র খস খস লাগান ঘরে যদি বসিতে পাও আবার মনে কর যে ঘরে বসিতে পাইয়াছ যদি সেই ঘরের চারি কোণে প্রচুর পরিমাণে বরফ রাখা হইয়াছে—গৃহের অভ্যন্তরে পাকার হাওয়া চলিতেছে—এরূপ হইলে এরূপ ঘরে বসিতে পাইলে একতর আনন্দ উপভোগ হয় না? অবশ্যই হইয়া থাকে—সে আনন্দ সে সুখ কথায় প্রকাশ করা যায় না। মনে মনে অনুভূত হয়, উপরের আনন্দের ন্যায় ইহাও ক্ষণস্থায়ী—ক্ষণস্থায়ী হইলেও ইহা আনন্দ উপভোগ ইহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

মনেকর তুমি মানী জনসমাজে তোমার বিশেষ মান আছে বিশেষ মর্য্যাদা-

বিশেষ গৌরব আছে; কিন্তু সহসা সময়ের অবশ্য সম্ভাবিতায় জন্ম দারিদ্র্য-দশা সমুপস্থিত হইয়াছে। দারিদ্র্যে একেবারে অন্নাস্তি হইয়া পড়িয়াছে—ঘরে এক কপর্দ্দক মাত্র নাই—স্ত্রী পুত্রেরা অন্নের জন্য একেবারে লালায়িত। এরূপ সময়ে যদি কোন মহাত্মা দয়া করিয়া তোমার দারিদ্র্যদশা বিদূরিত করিয়া দেন তাহা হইলে মনে কতই না আনন্দের উদয় হয়; হৃদয় কতই না আহ্লাদে উথলিয়া উঠে। কিন্তু এ[illegible]নন্দ ও ক্ষণস্থায়ী; ক্ষণস্থায়ী হইলেও ইহা আনন্দ তাহাতে আর সন্দে[illegible]াই। মনে করিলে আন্তরিক ইচ্ছা করিলে এসকল ক্ষণস্থায়ী আনন্দকে—চিরস্থায়ী আনন্দ করিতে পারা যায় কেমন করিয়া পারা যায়—কেমন করিয়া এ সকল অচিরস্থায়ী সুখকে চির-স্থায়ী করিতে পারা যায়—কি প্রকারে কি রকমে এ সমুদায় সুখকে হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া রাখা যাইতে পারে। ইহা অবগত হইতে গেলে প্রথমতঃ মনে ভাবা উচিত মনের মহানন্দ যায় কেন? কেন এই মুহূর্ত্তে সুখের সাগরে ভাসিতেছি আবার তৎপর মুহূর্ত্তেই দুঃখের সাগরে ডুবিয়া যাইতেছি এই আনন্দের আলোকে সমুদায় আলোকিত,—আবার নিরানন্দের অন্ধকারে সমুদায় অন্ধকারময়—কেনই বা পর্য্যায় ক্রমে সুখ যাইতেছে দুঃখ আসি-তেছে আবার দুঃখ যাইতেছে সুখ আসিতেছে ইহার কারণ পূর্ব্বেও কতক বলা হইয়াছে এক্ষণেও বলিতেছি। আনন্দ যাইবার—দুঃখ যাইবার কারণ মনের চঞ্চলতা মনের অস্থিরতা—নূতন নূতন প্রকৃতির, নূতন নূতন আকা-ঙ্ক্ষার উপস্থিতি—সুতরাং আনন্দকে চিরস্থায়ী করিতে হইলে মনকে নিত্য সুখে সুখী করিতে হইলে মনকে স্থির করা চাই, মনের চঞ্চলতা দূর করা চাই যাহাতে মনে নূতন প্রবৃত্তি উপস্থিত না হয়, নূতন আকাঙ্ক্ষার উপস্থিত না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হওয়া চাই—এ সমস্ত বিষয় সুশৃঙ্খলে সম্পাদন করিতে হইলে একাগ্রতাসাধন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। একাগ্রতাসাধন করিতে পারিলে মনস্থির হইবে, চঞ্চলতা দূরে পলায়ন করিবে—নূতন প্রবৃত্তি উপস্থিত হইবে না নূতন আকাঙ্ক্ষা আসিয়া আর উদ্বেজিত করিতে পারিবে না সংসারে যাহা দুঃখ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে সে দুঃখ উপস্থিত হইলেও তোমাকে ব্যস্ত করিতে পারিবে না—তোমাকে দুঃখিত

করিতে পারিবে না। সার জন মুর যখন কোন যুদ্ধ জয় বিষয়ে একাগ্র হইয়াছিলেন তখন তাঁহার বাম হস্ত গোলা লাগিয়া উড়িয়া যাইলেও দুঃখ বোধ হয় নাই তিনি—অবলীলাক্রমে সুস্থ মনে সরল মনে সে অবস্থাতেও সেনানায়কের কার্য্য সুন্দর রূপে সম্পাদন করিয়া ছিলেন যুদ্ধেও জয়ী হইয়াছিলেন। গোলা লাগিয়া হাত উড়িয়া গেল তথাপি ও তাঁহার মুখে যাতনার চিহ্ন নাই—হৃদয়ে কষ্টের লেশ মাত্র নাই। মনে কাতরতা নাই—মন উৎসাহে সাহসে পরিপূর্ণ ইহার কারণ কি? ইহার কারণ তাঁহার মন সে সময়ে অন্য দিকে ধাবিত হয় নাই। প্রবৃত্তিবীচি বিক্ষোভিত হয় নাই—যুদ্ধ জয় করাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

একদা মহাত্মা সক্রেটীশ রাজপথে কোন একটী প্রোথিত স্থাণুর উপস্থাপনার চিবুকদেশ সমর্পিত করিয়া দুইদিনকাল ক্রমাগত একস্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন এই দুইদিন কাল তাঁহার ক্ষুধা ছিল না, নিদ্রা ছিল না, তৃষ্ণা ছিল না—রৌদ্রে কষ্ট হয় নাই, নিশার হিমনীহারেও কষ্ট হয় নাই। কষ্ট হওয়া দূরে থাকুক তাঁহার সে সময়ে রৌদ্রের, শিশিরের, দিনের, রাত্রির জ্ঞানই ছিল না। কেন ছিল না? সে সময়ে তিনি একাগ্রছিলেন—সে সময়ে তাঁহার মন একবিষয় লইয়া উন্মত্ত ছিল সে সময়ে অন্য প্রবৃত্তি আসিয়া তাঁহাকে উদ্দেজিত করিতে পারে নাই। ক্রমশঃ

শ্রীহরিচরণ রায়।

শাস্ত্র আন্দোলন।

---*---

ভারত সাত শত বর্ষ মুসলমানের অধীনে থাকিয়াও হিন্দুধর্ম্মের যত অনিষ্ট না হইয়াছিল একশত বৎসর ইংরাজের অধীন থাকিয়া তাহার

অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। দুর্দ্দান্ত মুসলমান নানা প্রকার অত্যাচার করিয়াছিল, বলপূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিল, দেবমন্দির সকল চূর্ণ করিয়াছিল, তথাপি তখন ভারতবাসীর মন ধর্ম্মশূন্য হয় নাই। কিন্তু ইংরাজ উক্তরূপ অত্যাচার করা দূরে থাকুক, হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন, প্রাচীন মন্দিরাদির সংস্কার সাধনে মনোযোগী হইয়াছেন, তীর্থ সকলে গমনের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, হিন্দুগণের প্রাচীন মাহাত্ম্যব্যঞ্জক কার্য্য সকল গবেষণা ও প্রকাশ করিয়া সাধারণের জ্ঞান গোচর করিতেছেন, তথাপি আজি হিন্দু ধর্ম্মশূন্য, আজি সকলেই হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। দুদিন পূর্ব্বে হিন্দুর মনের ভাব এরূপ বিকৃত হইয়াছিল যে, হিন্দু হিন্দু বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিতেন, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু রীতি নীতি অনুযায়ী যাঁহারা চলেন তাঁহাদিগকে উপহাস করিয়া সুখী হইতেন, শিখাধারী ব্রাহ্মণদিগকে সং বলিয়া গণ্য করিতেন এবং যিনি হিন্দু নিয়মের রেখা মাত্র অবলম্বন করিতেন তাঁহাকে কুসংস্কার সম্পন্ন Superstitious বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন। অধিক কি হিন্দুর চিকিৎসা, হিন্দুর যাত্রা, হিন্দুর আহারপ্রণালী, হিন্দুর বেশবিন্যাস, হিন্দুর বাসপ্রণালী, হিন্দুর বিবাহ পদ্ধতি, হিন্দুর ভাষা, হিন্দুর মহর্ষি—আদি—পণ্ডিতগণ এমন কি হিন্দুর বেদ, মহাভারত ও রামায়ণ প্রভৃতিও হিন্দু বিষ নয়নে দেখিতেন। শিক্ষিত যুবকের চক্ষে হিন্দুর সমস্তই ভ্রান্ত ও কুসংস্কারমূলক বলিয়া বোধ হইত। এরূপ ভাবে আর কিছু দিন চলিলে গৌরবকর হিন্দু নাম অতি অল্পদিনের মধ্যেই পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইত।

ভারতের এরূপ অবস্থা হইল কেন? মুসলমানের এরূপ অত্যাচারে হিন্দুধর্ম্মের কিছুই হয় নাই এক্ষণে তাহার এরূপ দুর্দ্দশা কেন? কারণ আছে। অত্যাচারদ্বারা মানুষের মন কেহ স্বাভিমুখে আনয়ন করিতে পারে না—বরং তদ্দ্বারা বিপরীত ফল লাভ হয়। সরল ব্যবহারই মানবমনাকর্ষণের প্রকৃত উপায়। মুসলমানগণ যতই হিন্দুর প্রতি অত্যাচার করিত ততই হিন্দু আত্মরক্ষার চেষ্টা করিত ততই তাহাদিগকে বিদ্বেষনয়নে দর্শন করিত ততই তাহাদের কার্য্যপ্রণালীর ধর্ম্মপ্রণালীর দোষোদ্ঘোষণ করিত। কাযেই

কাহার ও মন তাহাদের ধর্ম্মের প্রতি ধাবিত হইত না। কিন্তু সুসভ্য বুদ্ধিমান ইংরাজ ভারতে আসিয়া প্রথমে ঐ অত্যাচারকারীদিগকে দূর করিয়া দিয়া হিন্দুর শ্রদ্ধাভাজন হইলেন, পরে হিন্দুর সহিত বন্ধুতা ও হিন্দুর অশেষবিধ উপকার করিলেন, দেশের দস্যু তস্কর প্রভৃতি শত্রুদমন করিলেন, রাস্তা রেলওয়ে প্রভৃতি করিয়া সাধারণের গমনাগমনের সুবিধা করিলেন, চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া সাধারণ লোককে রোগমুক্ত করিলেন, বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিদ্যা শিখাইতে লাগিলেন, ন্যায় বিচার করিয়া সকলের স্বত্ব-রক্ষা করিতে লাগিলেন, চাকরি দিয়া অনেককে প্রতিপালন এমনকি বড়মানুষ করিয়া দিলেন। সকলেই ইংরাজের প্রতি তুষ্ট হইল। তাঁহার বদান্যতা ও ন্যায়বিচার দেখিয়া তাঁহাকে ধার্ম্মিকচূড়ামণি, তাঁহার কল-কৌশল দেখিয়া তাঁহাকে অলৌকিকশক্তি সম্পন্ন, তাঁহার বাহুবল দেখিয়া তাঁহাকে অমিত পরাক্রমশালী মনে করিল। কাযেই ইংরাজ হিন্দুর কাছে দেবতুল্য হইল। তাঁহার ভাষা শিখিয়া তাঁহার সংসর্গলাভ করিতে পারিলে ধনী মানী হওয়া যায়। দেখিয়া সকলেই তাঁহার ভাষা শিখিতে প্রবৃত্ত হইল সকলেই ইংরাজের ছন্দানুসরণ করিতে লাগিল।

যাহার প্রতি এত শ্রদ্ধা তাহার সকলই ভাল হইবে তাহার আর কথা কি? কাযেই লোকের বিশ্বাস হইতে লাগিল, ইংরাজের ভাষা ভাল—ধর্ম্ম ভাল রীতিনীতি ভাল—তাঁহাদের সমস্তই ভাল। বিশেষতঃ সকলেই সেই ভাষা, সেই ধর্ম্ম, সেই নীতি বাল্যকাল হইতে অধ্যয়ন করিতে লাগিল। শিক্ষকগণ নিয়ত বুঝাইতে লাগিলেন তাঁহাদের সমস্ত উৎকৃষ্ট ও সত্য এবং ভারতের সমস্তই নিকৃষ্ট ও মিথ্যা, সেই জন্য ইংরাজের এত উন্নতি এবং সেই জন্যই ভারতের এত অবনতি। উহা সংস্কারবৎ হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইল। ভারতবাসী একমনে এক ধ্যানে ইংরাজি পড়িতে লাগিল। পড়ে ইংরাজী, লেখে ইংরাজী, বলে ইংরাজী, ভাবে ইংরাজী, বেশ ইংরাজী, আহার ইংরাজী, কার্য্য ইংরাজী, সমস্তই ইংরাজী। সুতরাং ইংরাজিময় হইবে না ত কি? ইংরাজ বলিয়াছেন ভারতের সমস্তই দূষণীয় সুতরাং শিক্ষার ফল হইল হিন্দুর সমস্ত পরিত্যাগ করা। যে তাহা না করিল তাহার কিছুই শিক্ষা

হয় নাই বুঝিল। পাছে লোকে মূর্খভাবে এই জন্য সকলে আগে হইতেই সাবধান হইতে লাগিল—প্রথম হইতেই মাটির দেবতা পদাঘাত কর Old fool কুসংস্কারসম্পন্ন পিতামাতা পরিত্যাগ কর, ভূত প্রেতের গল্পময় মহাভারত রামায়ণ স্পর্শ করিও না বলিয়া শিক্ষার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে যুবকগণ দেশীয় সমস্ত আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া "তন্ময়" অর্থাৎ ইংরাজময় হইল।

কিন্তু সুখের বিষয়, উচ্চাশয় ইংরাজগণ ভারতের পূর্ব্বগৌরব সকল প্রকাশ করিয়াছেন এবং নীচাশয়গণ পাশব অত্যাচার করিয়া অনেকের মন বিগড়াইয়া দিতেছেন। তাহাতেই আজি ভারতবাসী বুঝিয়াছে যে আর্য্য ঋষিগণ মহা জ্ঞানী ও দেবতুল্য ছিলেন এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম ও রীতিনীতি অবলম্বন করিলেই দেবতা বা ধার্ম্মিক হওয়া যায় না। তাই ভারতবাসীর আবার আপনার ধর্ম্মের দিকে—আপনার রীতিনীতির দিকে নজর পড়িয়াছে। বড় সুখের বিষয় বলিতে হইবে। এই সময়ে যদি ভারতবাসী প্রাচীন আর্য্যগণের—আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের সঞ্চিত রত্নরাশি দেখিতে পান—এক্ষণে যদি তাঁহারা স্পষ্ট জানিতে পারেন যে তাঁহাদের সেই রত্নরাশি অমূল্য, অনুপমেয়, অসীম, তাহা হইলে আবার সকলেস্বধর্ম্ম পরিগ্রহণ করিবে, স্বধর্ম্মে মত্ত হইবে, আত্মগৌরব রক্ষায় যত্নবান হইবে। নচেৎ আবার কি হইবে বলা যায় না। হয়ত ভারতবাসী নাস্তিক হইবে, সর্ব্বধর্ম্মশূন্য হইবে অথবা নূতন রকম কিম্ভুত কিমাকার ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। কিন্তু ঐ রত্ন সকল দেখিবার উপায় কি?—অবসর কৈ? অন্ততঃ উদরপূরণ জন্য ও তাঁহাদিগকে ইংরাজি অধ্যয়নে বাল্য ও যৌবনের কিয়দংশ কাটাইতে হইবে। পরে চাকরির চেষ্টা ও তাহার গুরুভার বহন করিতে যৌবন অতিবাহিত হইবে। তবে কোন্ সময়ে ভারতবাসী হিন্দুশাস্ত্ররূপ অগাধ অনন্ত সাগর হইতে রত্ন উদ্ধার করিবে? তাহা নিতান্ত অসম্ভব। এই জন্য আমরা মনে করিয়াছি আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকায় যতদূর সম্ভব হইতে পারে, একটু একটু করিয়া শাস্ত্রালোচনা করিব।

ক্রমশঃ

আপ্তবাক্য।

নাস্তিক আপ্তবাক্য বিশ্বাস করেন না। কেবল নাস্তিক কেন? ব্রাহ্মগণও আপ্তবাক্য মানে না। তাঁহারা ঈশ্বর মানেন, পরকাল মানেন, কিন্তু পূর্ব্বকাল ও আপ্তবাক্য মানেন না। তাঁহাদের মতে পরের বাক্যানুসরণ করিলে স্বাধীনতার হানি হয়। স্বাধীনতা আমাদের প্রধান ধন, তাহা রক্ষা করিবার শক্তি ঈশ্বর আমাদিগকে দিয়াছেন, সেই শক্তিই আমাদের কর্ত্তব্য দেখাইয়া দেয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি মানব কি আপনাআপনি বুঝিয়া সমস্ত কার্য্য করিতে পারে? সমস্ত দূরে থাকুক কিছু কার্য্যও কি করিতে পারে? কখনই নয়। কেননা ভূমিষ্ঠ হইয়াই মানব সর্ব্বপ্রকারে পরের অধীন হয়। সুধু পরের বাক্যের অধীন নয় সর্ব্ব প্রকারেই পরের অধীন হয়। পরে খাওয়াইলে খাইতে পাইবে, পরে রক্ষা করিলে রক্ষিত হইবে, পরে শিখাইলে শিখিবে। পরে শিখাইল 'মা' শিশু বলিল 'মা', পরে শিখাইল 'Mama' শিশু শিখিল 'Mama' পরে শিখাইল 'বাবা' শিশু শিখিল 'বাবা' পরে শিখাইল 'Papa' শিশু শিখিল 'Papa'। পরে হাসিয়া হাসি শিখাইল*, হাটাইয়া হাটিতে শিখাইল, খাওয়াইয়া খাইতে শিখাইল। সর্ব্বথা অন্যে যাহা শিখাইল শিশু তাহাই শিখিল; যে যে শিক্ষা না পাইল সে তাহা শিখিল না। ক্রমে শিশু বড় হইতে লাগিল, বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করিল, গুরু যাহা শিক্ষা দেন, গ্রন্থকর্ত্তা যাহা বলেন, বালক তাহা শেখে। পিতা,

---

* হাসি কান্না শিশুরে শিখাইতে হয় না বটে, কিন্তু কোন্ ব্যাপার হাসির কারণ ও কোন্ ব্যাপার ক্রন্দনের কারণ তাহা শিখাইতে হয়। এই জন্য হিন্দুশাস্ত্রকারেরা উক্ত রূপ হাসি কান্নাকে পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বলেন।

মাতা, গুরু ও অন্য পদস্থ লোকে যে উপদেশ দেন, যে নীতিশিক্ষা দেন শিশু তাহাই শিখে ও তদনুযায়ী কার্য্য করে। শিশু যুবা হইল, বিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত করিল, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় অন্য লোকের কতকগুলি কথা শিখিল। এখন তাহার জ্ঞান হইয়াছে, এক্ষণে আর পরের কথায় তাহাকে চলিতে হইবে না, নিজ বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইবে। অর্থাৎ এখন সে যাহাদের মতামত জানা আবশ্যক তাহার অধিকাংশ জানিয়াছে, সেইগুলি স্মরণ করিয়া যথাযোগ্য স্থানে প্রয়োগ করিয়া কার্য্য করিতে পারিবে — সেই জন্যই শিক্ষিতের এত মান। নিজ বিবেচনায় কার্য্য করিবার জন্য শিক্ষিতের মান নহে। নিজ বিবেচনায় কার্য্য করার জন্য মান হইলে মূর্খেরই মান হইত। শিক্ষিত ব্যক্তি জানিয়াছেন কিরূপ স্থলে কিরূপ কার্য্য করিয়া লোকে কিরূপ ফল পাইয়াছেন, প্রাচীন ও বিজ্ঞগণ কিরূপ কার্য্য করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন, সেই সমস্ত স্মরণ করিয়া যথাপ্রয়োগ করিতে পারেন বলিয়াই শিক্ষিতের এত মান। মূর্খ তাহা জানে না সুতরাং যাহা ইচ্ছা তাহাই করে এই জন্যই মূর্খের এত নিন্দা। সুতরাং মানব বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধকালপর্য্যন্ত যাহা কিছু কার্য্য করে সমস্তই পরের বাক্যানুসরণে করিয়া থাকে। নিজ মতে কখনই কেহ কার্য্য করে না। তবে অনেক সময়ে প্রবল বৃত্তিবিশেষের অধীন হইয়া মানব পরবাক্যে অন্যথাচরণ করিয়া থাকে বটে। সুন্দরী রমণীবিশেষ দেখিয়া মানব মুগ্ধ হইল, লালসার অধীন হইয়া 'পরদার গ্রহণ অন্যায় কার্য্য' এই পরের বাক্য অন্যথা করিল—পরধন দেখিয়া লইতে ইচ্ছা হইয়াছে, 'চুরি করিতে নাই' বাক্যের অন্যথা করিল, মদ্য মাংস খাইয়া আমোদ করিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে, পরবাক্য অন্যথা করিয়া যথেচ্ছাচারী হইল। এইরূপ স্থানে মানব স্বেচ্ছাচারী হয় বটে, পরবাক্যের অন্যথাচরণ করে বটে, কিন্তু তাহাও নিজ উদ্ভাবিনীশক্তিবলে নহে, কতক নিজ শারীরিক বৃত্তির অধীন হইয়া ও কতক লম্পট, তস্কর, সুরাপায়ী প্রভৃতির নিকট শিক্ষিত হইয়া উক্তরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। অনেকে সৎকার্য্যের ভাণ করিয়াও উক্ত-রূপ ব্যভিচার করিয়া থাকে। তাঁহারা ভাবেন বা বলেন যে, তাঁহারা আপন

কর্ত্তব্যবোধিনী ইচ্ছার অনুরূপ কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু তাহা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্তি তাহা একবারও ভাবেন না। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে থাকা পাপকর ভাবিয়াই খৃষ্টধর্ম্ম বা ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন, জাতিভেদ রূপ বিষম ব্যবহার অবৈধ ভাবিয়াই জাতিভেদ প্রথা উঠাইয়া দিতে যত্নশীল; স্ত্রী জাতিকে অন্তঃপুরে রাখা অন্যায় বিবেচনা করিয়াই স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচারে উদ্যত তাঁহারা ভাবেন বা বলেন যে, তাঁহারা নিজ বুদ্ধিবলে এই সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন; তাঁহারা ভাবেন না যে ময়না কাকাতুয়া প্রভৃতি যে রূপ নিজ ইচ্ছায় রাধাকৃষ্ণ বলে, তাঁহাদের ঐ সকল আবিষ্কারও ঠিক তদ্রূপ নিজ স্বাধীন ইচ্ছার ফল। শিশু পিতার নিকট শিখিয়া যেরূপ নিজ ইচ্ছা প্রকাশ করে—তাঁহারা ইংরাজগুরুর নিকট শিখিয়া সেইরূপ নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকে। নিজ বুদ্ধিতে যদি ঐ সকল হইত তবে ইংরাজি না পড়িলে, ইংরাজি ব্যাপার সকল না দেখিলে ঐ সকল হয় না কেন? ফলতঃ যেমন গুরু তেমনি শিক্ষা ও যেমন শিক্ষা সেইরূপ কার্য্য। যিনি টোলে পড়েন তিনি শিকা রাখিতে, ফোটা কাটিতে, উপবাস করিতে শিখেন, আর যিনি স্কুলে পড়েন তিনি চুল ফিরাইতে, পমেটম মাখিতে ও পলাণ্ডু, মদ্য, মাংস খাইতে শিখেন। ইহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, মানব যাহা করে সমস্তই পরের বাক্যানুসারে, নিজ মতে কেহই চলিতে পারে না। নিজ মতে কার্য্য করি বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যাহা যাহা আমি শিখিয়াছি তাহার মধ্যে যেটী আমার ভাল লাগিয়াছে, তদনুরূপ করিতেছি, নিজ উদ্ভাবিত মতানুসারে করিতেছি না। আমি শুনিলাম জাতিভেদ প্রথা অতি কদর্য্য, আবার শুনিলাম উহা অতি উৎকৃষ্ট। উহার মধ্যে যেটী আমার প্রবৃত্তি অনুসারে ভাল লাগিল সেইটী করিলাম। সেটীকে কখনও আপন মত বলিতে পারা যায় না, সেটী পরেরই মত। যেমন কাহারও জিহ্বায় মধুর রস ভাল লাগে ও কাহারও জিহ্বায় অম্লরস ভাল লাগে সেইরূপ এক কার্য্য একের প্রিয় আর এক কার্য্য অন্যের প্রিয় হয়। আবার অভাব হইলে অর্থাৎ বিভিন্ন আস্বাদ করিতে কখনও না পাইলে যেমন প্রাপ্ত দ্রব্যই সকলের রুচিকর হয়, সেইরূপ বিভিন্ন বিষয় জ্ঞানের বিষয় না হইলে যাহা জ্ঞাত তাহাই ভাল লাগে। জাতি

ভেদ প্রথা মন্দ, একথা যখন আমরা শুনি নাই তখন কাহারও উহা মন্দ বলিয়া বোধ হয় নাই। এখন শুনিতেছি এখন রুচি বা স্বভাব অনুসারে কাহারও উহা ভাল লাগিতেছে কাহারও মন্দ লাগিতেছে। ফলকথা সমস্তই আমাদের শেখা সংস্কার, নিজের কিছুই নহে। নিজ নিজ স্বভাবানুযায়ী শিক্ষাবাক্য সকল ভিন্ন মূর্তি ধারণ করিলেও উহা সম্পূর্ণ শিক্ষাধীন পরবাক্যমাত্র।

সত্য বটে কেহ কেহ নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার, নূতনমত স্থাপন ও নূতন চিন্তার ফল প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু সেরূপ লোক অতি বিরল। এবং তাঁহারাও নিজ চিন্তার ফল নিজে ভোগ প্রায়ই করিতে পারেন না। তাঁহাদের কার্য্য সকল প্রায় পরানুগত হয়। কেন না মানব যখন নিজে নূতন চিন্তা করিতে সক্ষম হয় তখন তাহার বয়স কম নহে। সে বয়স পর্য্যন্ত তাহাকে সম্পূর্ণ পরের মতে কার্য্য করিতে হয়। যখন নূতন চিন্তা তাহার মনে উদিত হয় তখনও সে সে চিন্তার ফললাভ করিতে পারে না; অনেক পরীক্ষা ও গবেষণার পর তাহার সেই চিন্তার ফল জন্মে। ফল জন্মিলেও তদনুসারে নিজে কার্য্য করিতে পারে না। কেননা অভ্যাস ও সংস্কার শীঘ্র ছাড়িতে পারা যায় না। অন্যকে যেরূপ শিখাইতে পারা যায় আপনি সেরূপ ব্যবহার করিতে পারা যায় না। যদিও অনেক চেষ্টা করিয়া আপনি তদনুরূপ কার্য্য করিতে সক্ষম হয় কিন্তু তাহা অল্প বয়সে নহে। বোধ হয় সে সময়ের পরে মানবকে আর অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিতে হয় না। সুতরাং মানব নিজ চিন্তার কার্য্য নিজে করিতে পারে নাই বলিতে হয়। যখন মানবকে কার্য্য করিবার কালে অর্থাৎ শৈশব, বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ়কালে মানবকে পরানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইল, যখন তাহার কার্য্য ত্যাগের সময়—পরকে শিক্ষা দিবার সময়—পরাধীন হইবার সময় বৃদ্ধকালে স্বানুবর্ত্তী হইবার শক্তি হইল, তখন আর মানব নিজ মতে কার্য্য করিতে পারিল কৈ? তাহাও কি সকল বিষয়ে মানব স্বানুবর্ত্তী হইতে শিখিতে পারে? কখনই নহে। যে যে বিষয়ে প্রগাঢ় চিন্তা ও গবেষণা করিয়াছে সে সেই বিষয়েই নূতন ফল লাভ করিয়া স্বানুবর্ত্তী হইবার

শক্তিলাভ করিতে পারে মাত্র। অপর লক্ষ লক্ষ বিষয়ে তাহাকে পূর্ব্ববৎ পরানুবর্ত্তী থাকিতে হয়। তবে মানব নিজ চেষ্টায় নিজ বিবেচনায় কার্য্য করিতে পারে বলা যায় কিপ্রকারে? বরং ইহা দ্বারা কি ইহাই বুঝা যাইতেছে না, যে, মানবকে ঈশ্বর স্বমতানুযায়ী কার্য্য করিতে বলেন নাই? যখন দেখা যাইতেছে প্রাচীন বয়স ভিন্ন মানব নিজের মত গঠন করিতে পারে না এবং তাহাও ২।৪জনমাত্র ও [illegible] বিষয়ে মাত্র, তখন কি ইহাই বুঝিতে হইবেনা, যে, মানবকে পরমুখাপেক্ষী হইতেই হইবে? এবং দুই এক জন যাহা আবিষ্কার করে তাহা নিজের জন্য নহে, পরেরই জন্য? তখন কি ইহাই বুঝিতে হইবে না, যে, মানব পরের কাছে শিখিয়াই কার্য্য করিবে এবং নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া পরকেই শিখাইবে, আপনি তাহার ফলাধিকারী নহে? অতএব পরের কথা শুনিব না আপন বিবেচনাতেই কার্য্য করিব যাঁহারা বলেন তাঁহারা যে নিতান্ত ভ্রান্ত যে বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ নাই। আর্য্য ঋষিগণ এই তত্ত্ব উত্তমরূপ বুঝিয়া ছিলেন, এইজন্য তাঁহারা গুরূপদেশের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন। গুরুকে তাঁহারা পিতা হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন এবং গুরু ভিন্ন মানবের গত্যন্তর নাই বলিয়াছেন।

আরও দেখ, মানবের অধিকার কি? মানব কতদিন বাঁচে ও কতটুকু স্থান অবলম্বন করিয়া থাকে! মানব যদি পরের শিক্ষার অধীন না হইত তাহা হইলে কি মানবের এই বর্ত্তমান উন্নতি হইত? এই রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, অট্টালিকা, মুদ্রাযন্ত্র এই জ্যোতিষ, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা এই নীতি, বিধি, ধর্ম্ম কি একজনের বা এক মানবের চেষ্টায় হইয়াছে? না হইতে পারে? লক্ষ লক্ষ বৎসর মানব যাহা শিখিয়াছে তাহা যদি স্তূপাকারে সজ্জিত না হইত তাহা হইলে কি মানব এ সকল ফলভোগ করিতে পারিত? কখনই নয়। মানব ক দিন বাঁচে? যদি ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই মানব নিজ চেষ্টায় কার্য্য আরম্ভ করিত তাহা হইলেও কি মানব যত দিন বাঁচে ততদিনে ইহার কোটীতম অংশ কার্য্য করিতে পারিত? অবশ্য কখনই নয়। কালসম্বন্ধে মানব যেমন নিতান্ত ক্ষুদ্র স্থানসম্বন্ধেও সেইরূপ। মানব একাকী কত স্থানের পদার্থ পর্য্যবেক্ষণ করিবে? চিরজীবন

চেষ্টা করিলেও মানব আপন দেশেরই সমুদায় দেখিতে পারেন্না। কিন্তু অসংখ্য দেশ, সাগর, পর্ব্বত, অরণ্য প্রভৃতি রহিয়াছে; অসংখ্য গ্রহ, নক্ষত্র সূর্য্য প্রভৃতি রহিয়াছে। ইহা একা মানব কি প্রকারে দেখিবে? তদ্ভিন্ন জ্ঞানের সহস্র সহস্র শাখা প্রশাখা রহিয়াছে,—ভূতত্ত্ব, রসায়ন, প্রাণীতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, শারীরস্থান, চিকিৎসা, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি অসংখ্য ব্যাপার রহিয়াছে। মানব একা কোন দিক্ দেখিবে? যাহা যৎকিঞ্চিৎ দেখিতে পারে তাহাই দেখিতে দেখিতে যদি মানব মরিয়া গেল, তবে ফলভোগ করিবে কে? যদি কিছুই ফলভোগ হইল না তবে সে কার্য্যেরই বা প্রয়োজন কি? অতএব মানবকে যে নিয়ত পরের কথানুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে, তাহাতে আর কথা কি?

আর একথা—মানব নিজ চেষ্টামাত্রের উপর নির্ভর করিয়া কিপে ফল ভোগ করিবে? একবার হাত পোড়াইয়া 'অগ্নিতে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়' এ তত্ত্ব শিখিতে পারে বটে, কিন্তু বিষ খাইয়া মরিয়া গিয়া কি প্রকারে 'বিষ খাইলে মানুষ মরে' এ তত্ত্ব শিখিবে? অন্যকে বিষ খাইয়া মরিতে দেখিয়াই বা কয়জন এ তত্ত্ব শিখিতে পারে? সর্ব্বথা পরের শিক্ষাধীন না হইলে মানব একদিনও পৃথিবীতে বাস করিতে পারে না। নিজ চেষ্টায় মানবকে চলিতে হইলে তাহাকে একদিনেই পৃথিবীর মায়া কাটাইতে হইত। একদিন পশু পক্ষীরা বলিতে পারে, যে তাহারা নিজ চেষ্টায় বাস করিতে পারে—কেননা ঈশ্বর তাহাদের স্বয়ং রক্ষক, তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে চলিবার শক্তি তিনি দিয়াছেন। মানবকে তাহা তিনি দেন নাই। ঈশ্বর মানবকে সর্ব্বপ্রকারে পরপ্রত্যাশী করিয়াছেন।—সকল মানবই পরস্পর পরস্পরের অধীন। শিশু যুবার অধীন, যুবা বৃদ্ধের অধীন এবং স্ত্রী পুরুষের অধীন। এই অধীনতাই মানবত্ব এবং এই স্বাধীনতাই পশুত্ব। নচেৎ পশুতে আর মানবে অন্য প্রভেদ নাই। পশুরা আপনিই সর্ব্বস্ব, মানবের সকলই আপনার। পশু শিখিবে না—শিখাইবে না। মানব শিখিবে ও শিখাইবে,—যেরূপ পরের নিকট শিখিবে সেই রূপ কার্য্য করিবে—যে রূপ আপনি শিখিবে সেই রূপ পরকে শিখাইবে। এই জন্য একটী ইংরাজী প্রবাদ আছে

"Do what I say, not what I do" ইহার তাৎপর্য্য আমি যাহা শিখিয়াছি, জানিয়াছি তাহা স্বভাব ও অভ্যাসদোষে করিতে পারি না বটে কিন্তু তাহা পরকে শিখাইতে পারি। অতএব যখন প্রমাণ হইল যে, মানব সম্পূর্ণ পরমতাপেক্ষী—যখন মানবকে পরের বাক্যানুসরণ করিতেই হইবে, তখন আপ্তবাক্য বিশ্বাস না করিলে চলিবে কেন? যে বাক্যের উত্তর নির্ভর করিয়া আমাকে চলিতে হইবে তাহার উপর দৃঢ়তা না থাকিলে চলিবে কেন? কর্ত্তব্যকার্য্যে দৃঢ়তা না থাকিলে কখনও সুফলপ্রদ হয় না।

নাস্তিক বলিবেন আমরা পরের উপদেশ গ্রহণ করি বটে কিন্তু আমরা বুঝিয়া গ্রহণ করি। যেটী আমাদের মনোমত হয় সেইটী আমাদের লওয়া উচিত ও যাহা মনোনীত না হয় তাহা লওয়া অকর্ত্তব্য। এ কথার উত্তর আমরা পূর্ব্বে একরূপ দিয়াছি—অর্থাৎ পাঁচটী দেখিয়া একটী মনোনীত করিতে হইলে আপনার স্বভাবদোষে তাহা অনিষ্টকর হয়। মনে কর এক স্থানে শুনিলাম স্ত্রী পুরুষ চিরকাল সদ্ভাবে থাকিবার চেষ্টা করিবে, একের দোষ হইলে অপরে সাধ্যানুসারে শোধনের চেষ্টা করিবে, চিরজীবনের মধ্যে কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিবে না। আর এক স্থানে শুনিলাম যত দিন যাহার প্রতি যাহার রুচি থাকিবে ততদিন তাহার সহিত মিলিত থাকিবে, মনের অমিল হইলে তখনই তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। তাহা হইলে ইন্দ্রিয়পরায়ণেরা কি শেষোক্ত কথা অবলম্বন করিবে না? এইরূপ যাহা আপাতরম্য তাহাই অনেকের মনোনীত হইবে। সুতরাং গূঢ়সত্য আর মানবের ভাল লাগিবে না, যাহা আপাতত কষ্টকর তাহা কেহ করিবে না। তাহা হইলে আর মনুষ্য পশুতে প্রভেদ কি থাকিল?

ইহাতে প্রতিবাদকারী বলিতে পারেন যে যদি আমরা ভালরূপে বুঝিয়া উৎকৃষ্টটী অবলম্বন করি, বৃত্তি প্রেরিত হইয়া না করি তাহাতে আর দোষ কি? বিস্তর দোষ। কেননা 'আমি বুঝিয়াছি' ইহা সকলেই বিবেচনা করে, অতি মূর্খও পণ্ডিতের সহিত তর্ক করে। কিন্তু আমি যে প্রকৃত বুঝিয়াছি তাহার প্রমাণ কি? ঐ যে অজাতশ্মশ্রু বালকগণ স্ত্রীস্বাধীনতা স্ত্রীস্বাধীনতা করিয়া ক্ষেপিয়া বেড়াইতেছে, উহারা স্ত্রী কি তাহার কিছু কি বুঝিয়াছে? কিন্তু

উহারা কি আপনারা ভাবে যে উহা তাহারা বুঝে নাই? ঐ যে বালকটী মনে মনে শিক্ষককে গালি দিতেছে ও কি বুঝিয়াছে যে শিক্ষক তাহার হিতকারী? ঐ যে তস্করটী দণ্ডাজ্ঞা পাইয়া বিচারকের প্রতি অজস্র গালিবর্ষণ করিতেছে, ও কি বুঝিয়াছে, যে, বিচারক ন্যায়কার্য্য করিয়াছেন? ঐ যে হিন্দু ও খৃষ্টান ধর্ম্মসম্বন্ধে ঘোর দ্বন্দ্ব করিতেছে, উহার মধ্যে কে প্রকৃত বুঝিয়াছে, যে তাহার অবলম্বিত ধর্ম্ম সত্য? বুঝিবার নিয়ম সর্ব্বত্রই এইরূপ।

যাহার যেমন শিক্ষা, যাহার যেমন সংসর্গ, যাহার যেমন স্বভাব, যাহার যেমন বুদ্ধি সে সে সেইরূপ বুঝে। কে বলে আমি বুঝি না? ঐ প্রত্যেক বুঝাকে বুঝা বলিব? না ঐ প্রত্যেক বুঝার উপর নির্ভর করিয়া মত নির্ব্বাচিত হইবে? তাহা হইলে সংসারের দশা কি হয় তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? অতএব বুঝিয়া মত নির্ব্বাচন কথনই সুফলপ্রদ নয়। যদি বল প্রত্যক্ষদর্শন ও যুক্তিবলে যাহা ন্যায় বা অন্যায় বোধ হয় তাহা অবলম্বন ও ত্যাগ করিব না কেন? আমরা বলি যাহাকে আমরা প্রত্যক্ষ বলি ও যাহাকে আমরা যুক্তি বলি তাহা সর্ব্বক্ষণ প্রত্যক্ষ ও যুক্তি নহে। কেননা আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি সূর্য্য একখানি থালার মত, কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিলেন উহা পৃথিবী অপেক্ষা চৌদ্দলক্ষ গুণ বড়,—আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি সূর্য্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছেন, কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিলেন, পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে, এক্ষণে আমাদের প্রত্যক্ষ অবলম্বন করিব? না জ্যোতির্ব্বিদের কথা অবলম্বন করিব? যদি বল জ্যোতির্ব্বিদ্ যে প্রমাণের বলে ঐ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিলে আমি জ্যোতির্ব্বিদের কথা গ্রাহ্য করিব? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কয় জন লোকের উহা বুঝিবার শক্তি আছে বা হইতে পারে? যে সাধনাবলে জ্যোতির্ব্বিদ্ ঐ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, কয় জন সেরূপ সাধনা করিতে পারে? কয় জন সেরূপ বুদ্ধি ও অবস্থা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে? যাহাদের তদ্রূপ বা উহা বুঝিবার সামর্থ্য নাই, তাহারা কি ঐ সত্য গ্রহণ করিবে না? তাহারা কি প্রত্যক্ষ ভ্রমজ্ঞান ত্যাগ করিবে না? তাহা যদি হয় তবে

এ পৃথিবীর কয় জন সত্য জানিতে পারে? অবশ্য বলিতে হইবে প্রায় কেহই নয়। অতএব মানব যাহা প্রত্যক্ষ বা যুক্তিদ্বারা বুঝিতে পারিবে না তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে না, এ বাক্য নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। বরং এই সকল দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, মানব পরের নির্ণীত সত্যে বিশ্বাস করিতে নিতান্ত বাধ্য।

এক্ষণে প্রতিবাদকারী বলিতে পারে যে, স্বীকার করিলাম আমরা পরের মতানুসারে চলিতে বাধ্য কিন্তু তাহাতে আপ্তবাক্যের সত্যতা প্রমাণিত হইল কৈ? একথার উত্তর এক কথায় হইবে না। আমরা কিছু কিছু বলিবার চেষ্টা করিব।

এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে দেখিতে হইবে আপ্তবাক্য কাহাকে বলে? ঈশ্বর বা অভ্রান্ত পুরুষে যাহা বলিয়াছেন, যাহার প্রমাণের আবশ্যকতা নাই যাহা অভ্রান্ত সত্য তাহাকেই সচরাচর আপ্তবাক্য বলে। অথচ সকলেই বলিয়া থাকেন ঈশ্বর আমাদের বাক্য মনের অতীত। সুতরাং তাঁহার কথা যে কেহ স্বকর্ণে শুনিয়াছেন একথা বোধ হয় কেহ বিশ্বাস করেন না। যাহারা তাহা বিশ্বাস করে তাহাদের মত কখনও জগতে আদরণীয় নয়, তাহারা মূর্খ শ্রেণী; তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে মাত্র, প্রদান করে না। সুতরাং তাহাদের কথা ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত। যখন ঈশ্বরের বাক্য শুনিলাম না তখন ঈশ্বরবাক্য বলিলে অবশ্য তাঁহার মুখোচ্চারিত বাক্য ভিন্ন আর কিছু বুঝিতে হইবে। ঈশ্বরকে আমরা বিভিন্ন শরীরীরূপে দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু বিশ্বের সর্ব্বত্র তাঁহাকে ব্যাপ্ত দেখিতেছি বিশ্বের সর্ব্বত্র তাঁহার কথা শুনিতেছি। যখন দেখিলাম অগ্নি হইতে তাপ বিকীরণ করিল তখনই বুঝিলাম ঈশ্বর বলিলেন অগ্নিতে হাত দিওনা, তখনই বুঝিলাম ঈশ্বর বলিয়াছেন অগ্নিতে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়। বিষের কটু আস্বাদ পাইয়া বুঝিলাম উহা আমাদের খাদ্য নয়, যখন বিষপানে কাহারও প্রাণনাশ দেখিলাম তখন বুঝিলাম ঈশ্বর বলিয়াছেন বিষপানে প্রাণ যায়। এ সমস্তগুলিই ঈশ্বরবাক্য—আপ্তবাক্য। এইরূপ বিশ্বের সর্ব্বত্রই আপ্তবাক্য শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সমস্ত কি আমরা বুঝিতে পারি? সব দূরে থাকুক আমরা যাহা

বুঝি তাহা তুলনায় কিছুই নহে। সুতরাং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমরা ঈশ্বরের বাক্য অল্পই শুনিতে পাই। দেশ বিশেষে কাল বিশেষে যে সকল ঘটনা ঘটে— ঈশ্বর যে সকল আজ্ঞা প্রচার করেন তাহা আমরা শুনিতে পাই না, যে শুনে তাহার কাছে আমাদের শুনিতে হয়। সুতরাং তাহার কথাই আমাদের আপ্তবাক্য বলিয়া গণ্য করিয়া লইতে হয়। বিশেষতঃ অনেক সময়ে শ্রবণদোষে আমরা তাঁহার আজ্ঞা সকল বিপরীতভাবে শুনি। কেন না আমাদের শ্রবণশক্তি অতি অল্প। যাহার অধিক শ্রবণশক্তি আছে সে যেমন শুনিতে প্রায় অপরে সেরূপ পায় না। এই জন্য যাঁহার বুদ্ধি, গবেষণা প্রভৃতি অধিক তিনি যেমন ঈশ্বর বাক্য বুঝেন অন্যে সেরূপ বুঝে না। এই জন্য সেই রূপ লোকদিগের কথিত বাক্যকে আপ্তবাক্য বলিয়া জানা আমাদের উচিত। নচেৎ আমাদের উপায়ান্তর নাই। কেন না শিশুর জ্বর হইয়াছে, ভাত খাইতে চাহিতেছে তাহার পিতা কহিলেন জ্বর হইলে ভাত খাইতে নাই, শিশু কহিল কেন? পিতা কহিলেন জ্বর বাড়িবে ও শেষে মরিয়া যাইবে। শিশু পিতার ঐ কথা সত্য বলিয়া মনে করিবে? না পিতার নিকট উহার যুক্তি জিজ্ঞাসা করিবে? অবশ্য শিশুকে পিতার ঐ বাক্য আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। গুরু কহিলেন মিথ্যা কহিও না, চুরি করিও না শিশুকে ঐ সকল কথাও অবশ্য আপ্তবাক্যের ন্যায় গ্রহণ করিতে হইবে। ঐরূপ তুমি কেরাণিবাবু, তুমি কিছু বৈষয়িক লেখাপড়া শিখিয়াছ, জ্যোতিতত্ত্ব, রসায়ন, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি কিছুই তোমার জানা নাই, যাহারা ঐ সকল উত্তমরূপে জানিয়াছে তাহাদের বাক্য কি তুমি আপ্তবাক্যের ন্যায় ভাবিবে না? যখন কৃষক বলিল উত্তমরূপ কর্ষণ করিলে, সার দিলে উত্তম ধান্য জন্মে সে কথা কি তুমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে না? তাহার নিকট কি তুমি যুক্তি চাহিবে? ঐ যে জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিতেছেন সূর্য্য কত লক্ষ যোজন দূরে অবস্থিত, উহার আকার লক্ষ লক্ষ পৃথিবী অপেক্ষা বড় তাহা তুমি কি বিশ্বাস করিতেছ না? কেন বিশ্বাস কর? অবশ্য বলিবে জ্যোতির্ব্বিদ্ বিজ্ঞানবলে ঐ সমস্ত যুক্তি ও প্রমাণের বিষয় করিয়াছেন। কিন্তু সেই যুক্তি কয়জন বুঝিয়াছে? এবং কয়জনের বা সেই সকল বুঝিবার শক্তি

আছে? জ্যোতির্বিদ্ বলিলেন এবং তাঁহার কথা বুঝিয়া হয়ত আরও দশজন বুঝিল যে উহা যুক্তিমূলক বটে। তাহাতেই কি কোটী কোটী লোক বিশ্বাস করিল না? তবে উহা আপ্তবাক্য নয় কেন? বাস্তবিক পিতা গুরু ও বৈজ্ঞানিক যাহা বলিলেন তাহা যদি সত্য হয়—তাহা যদি পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরবাক্য হয় তবে তাহাকে আপ্তবাক্য বলিব না কেন? তবে কথা এই যে, তুমি বলিবে ঐ সকল বাক্য আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি বটে, কিন্তু যখন আমরা বুঝিব উহা সত্য নহে, তখন তাহা অবিশ্বাস করিতে পারিব। কিন্তু আপ্তবাক্যের ত সেরূপ লক্ষণ নহে? আপ্তবাক্যে যে চিরকাল সমান বিশ্বাস করিতে হইবে। এ কথায় উত্তর অতি সহজ। কেননা তুমি বলিতেছ যে কথায় ভ্রান্তি দৃষ্ট হইবে সে কথা মানিবে না, কিন্তু যাহা ভ্রান্তি দূষিত তাহা ত আপ্তবাক্য নহে? তবে বুঝিতে না পারিয়া পূর্ব্বে উহাকে অভ্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছিল মাত্র, এরূপ কথা মানার আবশ্যকও নাই, এই জন্য হিন্দুশাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

> "কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
> যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে"॥

হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্ম এই যে যেমন শিশুরা বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত পিতা ভালই বলুন আর মন্দই বলুন তাহা সত্য ও ন্যায্য বলিয়া বিশ্বাস ও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য সেইরূপ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যাবৎ অভিজ্ঞতা লাভ না করিবেন তাবৎ অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের বাক্য সকল সত্য বলিয়া বিশ্বাস ও তদনুযায়ী কার্য্য করিবে। শিশু পিতার বাক্য ও অনভিজ্ঞ অভিজ্ঞ ব্যক্তির বাক্য আপ্তবাক্য মনে করিবে। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, যখন মানব আত্মজ্ঞান লাভ করিবে তখন তাহাকে কোনও শাস্ত্রানুসারে চলিতে হইবে না। কিন্তু আত্মজ্ঞান কাহাকে বলে? আজি বঙ্গবাসী যেরূপ জ্ঞানলাভ করিতেছেন তাহাকে আত্মজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বলিব? আজি যে বেদ চক্ষেও দর্শন করে নাই সে বেদের নিন্দা করিতেছে, যে মনুসংহিতার নাম শুনে নাই সে মনুকে যাহা ইচ্ছা তাহা বলিয়া গালি দিতেছে, যাহার বয়স ১৬ বৎসর উত্তীর্ণ হয় নাই, স্ত্রী কাহাকে বলে, উহা

পায় কি মাথে তা জানে না অথচ স্ত্রী স্বাধীনতা প্রচার করিতে সচেষ্ট, সমাজে একদিনও বসিল না সমাজের সহিত কথা কহিল না অথচ সমাজ সংশোধন করিতে যত্ন করিতেছে, জাতিভেদ উঠাতে হইবে গান্ধর্ব্ববিবাহ প্রচলিত করিতে হইবে, মুর্গীর মাংস ভক্ষণ করিতে হইবে ইত্যাদি বলিয়া প্রাচীন আর্য্যদিগের ভ্রম সংশোধন করিতেছেন। হিন্দুধর্ম্ম কাহাকে বলে, কোন্ পুস্তকে তাহা লেখা আছে তাহা জানিল না শুনিল না অথচ গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিল হিন্দু ধর্ম্ম মিথ্যা উহা পৌত্তলিকতাময়—পাষণ্ডের ধর্ম্ম—জুয়াচোরের ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর। এইরূপ জ্ঞান সম্পন্নেরা কি আপ্তবাক্যে অবিশ্বাস করিবার যোগ্য? তাহার ফল কি হাতে হাতে ফলিতেছে না? দুর্ব্বিনীত শিশু পিতার অবাধ্য হইলে যেরূপ ফল লাভ করে আজি বঙ্গবাসীর কি সেই ফল লাভ হইতেছে না? পিতৃবাক্যে বিশ্বাস ও পিত্রাজ্ঞা অনুযায়ী কার্য্য করা যেমন শিশুর পক্ষে হিতকর প্রকৃত বিজ্ঞজনের বাক্য বিশ্বাস ও তাঁহাদের অনুমতি মত কার্য্য করা সাধারণের সেইরূপ হিতকর। যে সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি চিরজীবন বহু পরিশ্রমের সহিত কোন বিষয় জ্ঞাত হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা যে সে বিষয় উত্তমরূপ বুঝিয়াছেন, অন্ততঃ যাহারা সেরূপ চেষ্টা করে নাই তাহাদের অপেক্ষা অনেক বুঝিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? সুতরাং সে বিষয়ে তাঁহারা যাহা বলেন তাহা সত্য হইবার অধিক সম্ভব। এই জন্য সাধারণের সেই বিষয়ে আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস থাকা উচিত৭ যাহা ঈশ্বর বলিয়াছেন তাহার নাম যখন আপ্তবাক্য এবং ঈশ্বর যখন নিজে কিছু বলেন না তখন ঐ সকলকে আপ্তবাক্য বলিব তাহাতে আর কথা কি? যেমন চিকিৎসকের চিকিৎসায় বিশ্বাস না থাকিলে রোগ আরাম হয় না, যেমন গুরুর বিদ্যার প্রতি বিশ্বাস না থাকিলে বিদ্যা হয় না সেইরূপ সত্যে বিশ্বাস না থাকিলে কার্য্যকুশলী হওয়া যায় না। সুতরাং কোন বিষয়ে সফলকাম ও তৃপ্ত বা সুখী হইতে পারা যায় না। ঈশ্বরাজ্ঞা সর্ব্বত্রই প্রচারিত রহিয়াছে কিন্তু তাহা সহজ নহে। নিউটন বলিয়াছিলেন "I am gathering pebbles on the sea shore (আমি সমুদ্রের ধারে ঢিল কুড়াইতেছি।) ঈশ্বর সাধনার সামগ্রী।

বিনা সাধনায় তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। কঠোর সাধনায় তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয়,—তাঁহার বাক্য শুনিতে পাওয়া যায়। সে বড় ভাগ্যের কথা। যাঁহারা সে ভাগ্য লইয়া আসিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন; তাঁহারা মহাপুরুষ, তাঁহাদের বাক্য আপ্তবাক্য। মহাপুরুষের বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না। বেশ্ না মহাপুরুষের বাক্য আর ঈশ্বরের বাক্য এক কথা। অনেক তপস্যা করিয়া, অনেক চেষ্টা করিয়া তাঁহারা সত্য অবগত হইয়াছেন—ঈশ্বরের বাক্য শুনিয়াছেন। তাহাও সকলে সকল প্রকার শুনিতে পান না যিনি যে বিষয়ে অধিক মনঃ সংযোগ ও অধিক চেষ্টা করিয়াছেন তিনি সেই বিষয়ই মাত্র অবগত হইয়াছেন। যিনি চিরজীবন মনোনিবেশ সহকারে বুদ্ধি চালাইয়া কৃষিতত্ত্ব সমালোচন করিয়াছেন তিনি কৃষিবিদ্যার পারদর্শী হইয়াছেন, যিনি চিরজীবন সমুদ্র ভ্রমণ করিয়াছেন তিনি বণিক্ বিদ্যার পারদর্শী হইয়াছেন, যিনি শিল্পে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন তিনি শিল্পে পণ্ডিত হইয়াছেন, যিনি চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তিনি জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদ হইয়াছেন, যিনি পদার্থতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়াছেন তিনি পদার্থতত্ত্ববিৎ হইয়াছেন, যিনি রোগ নির্ণয় ও ঔষধ প্রয়োগে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন তিনি সুচিকিৎসক হইয়াছেন, যিনি যোগ পরায়ণ হইয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন তিনি মহাযোগী হইয়াছেন, যিনি ঈশ্বর অনুসন্ধানে মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তিনি ব্রহ্মদর্শী হইয়াছেন। যিনি সূক্ষ্ম বুদ্ধি, সুস্থ শরীর, উপযুক্ত অবস্থা, অবিচলিত অধ্যবসায়, দৃঢ় ঐকান্তিকতা প্রাপ্ত হইয়া উত্তমরূপ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া কোনও বিষয়ে একাগ্রবর্ত্তী হইয়া দৃঢ় পরিশ্রম করিয়া জীবন যাপন করিয়াছেন—ঘোর তপশ্চর্য্যা করিয়াছেন তিনি সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াছেন—তদ্বিষয়ক ঈশ্বরাজ্ঞা শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহারই বাক্যের নাম আপ্তবাক্য। কিন্তু তাঁহার বাল্যকালের বাক্য নয়, যৌবনকালের বাক্য নয়, বৃদ্ধকালের বাক্য—যখন (শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ সহস্র মারী চিকিৎসকঃ) তিনি সহস্র ভ্রমসংশোধন করিয়া খাঁটি হইয়াছেন, যখন তাঁহার আর বাচিবার কাল নাই, যখন তাঁহার মিথ্যা বলিয়া স্বার্থসিদ্ধি করিবার আবশ্যক নাই—নিজের

কোন অভীষ্ট নাই—সেই প্রাচীন কালে বহুকালসাধ্য দৃঢ় তপশ্চর্য্যা বলে যাহা জানিয়াছেন তাহা সত্য সত্যই আপ্তবাক্য—অভ্রান্ত সত্যবাক্য। এরূপ বাক্য সত্য না হইলে আর কোন্‌রূপ বাক্য সত্য হইবে? ঈশ্বর যদি এরূপ ব্যক্তিতে আবির্ভূত হইয়া কথা না কহেন, তবে কিরূপে আপনার বাক্য সকল প্রকাশ করিবেন? মানবের জন্য তিনি কি কোনও উপায় করেন নাই? তিনি যখন স্বয়ং প্রকাশ হইয়া কথা কহেন না, যখন সকলে তাঁহার কথা বুঝিতে পারে না ও যখন তাঁহার মতানুসরণে কার্য্য করাই মানবের একান্ত আবশ্যক, তখন মানবের উপায় কি? কি প্রকারে মানব তাঁহার আজ্ঞা সকল জানিবে? অবশ্যই বলিতে হইবে তিনি তপস্বীদ্বারা আপনার আজ্ঞা সকল প্রচারিত করিয়া থাকেন। তাহা যদি না হইবে, তবে ঐ সকল তপস্বীর প্রয়োজন কি? তুমি চিরজীবন অধ্যয়ন কর কেন? বৃদ্ধকালে মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তোমার শিক্ষা দ্বারা কি ফল? যখন তোমার কার্য্য করিবার কাল তখন অর্থাৎ সেই বাল্যকাল, সেই যৌবনকাল, সেই প্রৌঢ়কাল তোমার শিখিতেই কাটিয়া গেল, মত পরিবর্ত্তন করিতে করিতেই চলিয়া গেল—এখন বৃদ্ধ বয়সে তোমার শিক্ষার ফল কি? যদি উহা দ্বারা পরের শিক্ষাসাধন না হইল যদি উহা দ্বারা নিজের পরকালের কার্য্য না হইল, তবে শিক্ষার ফল কি? যদি কঠোর তপশ্চর্য্যা করিয়া অগাধ বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া, অদ্ভুত গবেষণা করিয়া ফললাভ করিতে করিতে মৃত্যু আসিয়া গ্রাস করিল ও সেই সঙ্গে সমস্তই ফুরাইয়া গেল, তবে মানবের এ বিড়ম্বনা কেন? মানবের এ দুর্ভাগ্য অপেক্ষা কি পশুভাগ্য ভাল নয়? এইজন্য বলি মানবের ঐ তপশ্চর্য্যা, ঐ অধ্যয়ন, ঐ গবেষণা বৃথা নয়। নিজে উহার ফল প্রাপ্ত না হউক পরে উহার ফলভোগ করিবে, এবং ইহজন্মে না হউক পরজন্মে ফলভোগ হইবে। সেই জন্যই যে দেশ যে সমাজ যখন উন্নত হইতে আরম্ভ হয় তখন ক্রমে অধিকতর উন্নত হইতে থাকে এবং যখন অবনত হইতে আরম্ভ হয় তখন অবনত হইতে থাকে। যদি মহাজনবাক্য সত্য না হয় তবে মিলের বাক্য, স্পেন্সরের বাক্য কম্‌টির বাক্য আজি তোমাদের নিকট এত আদরণীয় কেন? নিউটনের বাক্য, আর্কিমিডিসের

বাক্য এত প্রমাণ্য কেন? ঐ সকল ব্যক্তির বাক্য যখন তোমরা এত প্রমাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছ—তখন যে আর্য্য ঋষিগণ নিয়ত তপশ্চর্য্যায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, যাঁহারা ক্ষণেকের নিমিত্তও সুখের চেষ্টা করেন নাই, এক মনে এক ধ্যানে সত্য উপাসনার জন্য শরীরপাত করিয়াছেন, তাঁহাদের বাক্য আপ্তবাক্য হইবে না কেন? তাঁহারা ভোগপরাঙ্মুখ, স্বার্থশূন্য, পরহিতৈকব্রতী সত্য ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসু মহাপুরুষ। তাঁহারা অপরিসীম অধ্যবসায় ও দৃঢ় তপস্যার বলে দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হইয়াছেন। দিব্যচক্ষুদ্বারা দৃষ্ট বিষয় কি ভ্রান্তিসঙ্কুল হইতে পারে? কখনই না। দিব্যচক্ষুদ্বারা তাঁহারা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার আজ্ঞা সকল স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছেন, মানবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ জানিয়াছেন, তবে তাঁহারা মানবের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়াছেন। যাহা মনে আইসে তাহাই বলিয়া প্রতারণা করেন নাই। সেই মহাপুরুষগণ প্রকৃত জগতের হিতকারী ও তাঁহাদের বাক্যই জগৎপাতা জগদীশ্বরের বাক্য।

তবে যে কখনও কখনও আমরা মহাপুরুষ বাক্যে ভ্রান্তি দেখিতে পাই তাহার কয়েকটী কারণ আছে। প্রথমতঃ হয়ত যে সকল ব্যক্তিকে আমরা মহাপুরুষ বলিয়া জানিয়াছি তাঁহারা প্রকৃত মহাপুরুষ নহেন, দ্বিতীয়তঃ আমরা অনেক সময়ে তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারি না, তৃতীয়তঃ আমাদের বুদ্ধি ও সংস্কার দূষিত হওয়ায় সত্য আমাদের নিকট প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়।

এইজন্য গুরু আমাদের নিতান্ত আবশ্যক। যখন যে সন্দেহ উপস্থিত হইবে গুরু তাহা নিরাকরণ করিবেন। ভ্রম দেখা যাহার তাহার কর্ম্ম নহে। জ্যোতির্ব্বিদের ভুল জ্যোতির্ব্বিদ্ ভিন্ন বুঝিতে পারে, না পণ্ডিতের ভুল পণ্ডিত ভিন্ন বুঝিতে পারে না। সুতরাং কোন স্থানে মতদ্বৈধ দেখিলে আমাদের উপযুক্ত গুরু উপদেশ গ্রহণ আবশ্যক। আপনারা তাহার বিচারে নিযুক্ত হওয়া উচিত নয়। এই জন্য তুলসীদাস বলিয়াছেন।

"সদ্গুরু পাওয়ে ভেদ বতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ।
কয়লাকো ময়লা ছুটে যব্ আগ্ করে পরবেশ"॥

গুরুকে ঈশ্বরপ্রদর্শক বলিয়াও গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আজি ভারতে সেরূপ গুরু নাই; তাই ভারতের আজি এই দশা। যদি বশিষ্ঠের ন্যায় গুরু ও ধৌম্যের ন্যায় পুরোহিত থাকিত তাহা হইলে কি ভারতের এ দশা ঘটিত? তাহা হইলে কি আমরা সুবর্ণের বিনিময়ে কাচ গ্রহণ করিতাম? তাহা হইলে কি অন্তঃসার শূন্য বাহ্য চাকচিক্যময় য়ুরোপীয় সভ্যতা ভারতীয় উজ্জ্বল সভ্যতাকে পরাজয় করিত? কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট মন্দ লক্ষ্মী চঞ্চলা, তাই ভারতের এই দুর্দ্দশা। যাহাই হউক পিতার নিকট সন্তান যেমন, মহাপুরুষ ঋষিগণের নিকট আমারাও সেইরূপ। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির এমত শক্তি নাই যে, তাঁহাদের চিন্তা জলধির তলস্পর্শ করে।

আমরা এ প্রবন্ধ আর দীর্ঘ করিব না। আমরা কেবল ইহাই বলিবার চেষ্টা করিলাম যে পরকাল আমাদের লক্ষ্যের বহির্ভূত নহে এবং আপ্তবাক্য রূপে গুরুবাক্য মানিয়া না লইলে আমাদের চলিবার উপায় নাই। অন্যান্য গূঢ়কথা সকল বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

আদ্যাশক্তি।

"হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈর্নজ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূতমব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা"॥

বিজ্ঞানাভিমানী নাস্তিকগণ বলিয়া থাকেন যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে—যাহা প্রত্যক্ষ নহে, কেহ কখন ও যাহার অস্তিত্বের প্রমাণ পায় নাই, তাহা আমরা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? জিজ্ঞাসা করি, বৈজ্ঞানিকেরা

প্রত্যক্ষপ্রমাণ * না পাইলে কি কিছুই বিশ্বাস করেন না? তাহা যদি না করেন, তবে তাঁহারা মাধ্যাকর্ষণশক্তির বিশ্বব্যাপকতায় বিশ্বাস করেন কিরূপে? মাধ্যাকর্ষণশক্তি যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সাধারণ বন্ধনী ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁহারা কি পাইয়াছেন? কোন্ প্রমাণ পাইয়া এইরূপ শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়াছেন? তুমি একদিন, দুইদিন, তিনদিন এক স্থানে, দুই স্থানে নানা স্থানে দেখিয়াছ যে, অগ্নি ধূমের কারণ, পরে তুমি যেখানেই ধূম দেখিতেছ সেইখানেই অগ্নির বিদ্যমানতা অনুমান করিতেছে। এইরূপে মাধ্যাকর্ষণের বিশ্বব্যাপকতা অনুমিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা যদি এইরূপ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া মাধ্যাকর্ষণশক্তির বিশ্বব্যাপকতায় বিশ্বাস করিতে পারেন, তবে বিশ্বজননী আদ্যাশক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে তাঁহাদের আপত্তি কি? যখন আমরা দেখিতেছি যে, শক্তি বিনা কোনও কার্য্যই হইতে পারে না, তখন কেন না বুঝিব যে এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড—এই অনন্ত জীব ও জড়জগৎ—এক অনাদি অনন্ত মূল শক্তি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে? ইংলণ্ডের বর্ত্তমান বিজ্ঞতম বৈজ্ঞানিক হারবার্ট স্পেন্সর্ এই আদ্যা শক্তির অস্তিত্ব অম্লান বদনে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষীভূত এই অখিল জগতের মূলে এক অনির্ব্বচনীয় অচিন্ত্য শক্তি বিরাজিত রহিয়াছে—সেই শক্তি অনাদি ও অনন্ত এবং জ্ঞান, চৈতন্য, পরমাণু প্রভৃতি সমস্ত পদার্থের সৃজন ও রক্ষণ কারিণী। "An Infinite and eternal energy by which ALL things are created and sustained" এক আদ্যা শক্তি হইতে যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ইহা বিজ্ঞানবিৎ আর্য্য পণ্ডিতগণ বহুকাল বুঝিয়াছেন। বিবেকচূড়ামণিতে শঙ্করাচার্য্য আদ্যাশক্তির এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—"অব্যক্তনাম্নী পরমেশশক্তিরনাদ্যবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পরা কার্য্যানুমেয়া সুধিয়ৈব মায়া যয়া জগৎসর্ব্বমিদং প্রসূয়তে" ॥

অব্যক্তা পরমেশশক্তি অনাদি, ত্রিগুণময়ী, পরমামায়া কেবল কার্য্য দ্বারা পণ্ডিতগণের অনুমেয়া হন। সেই মায়া দ্বারা সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

* চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা যে জ্ঞানলাভ হয় তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডিতে ব্রহ্মা এইরূপে ভগবতী আদ্যাশক্তির স্তব করিয়াছেন।—

ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি, ত্বমৎস্যন্তেচ সর্ব্বদা॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতি রূপাহন্তে জগতোহস্য জগন্ময়ে॥

তুমি ইচ্ছামাত্রে এই জগৎ সংসার সৃজন করিয়া ধারণ ও পালন করিতেছ এবং তুমিই ইহাকে পুনর্ব্বার ধ্বংশ করিতেছ। তুমি সৃজনে সৃষ্টিরূপা, পালনে স্থিতি-রূপা এবং অন্তে প্রলয়রূপা। তুমি সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে পঞ্চমোল্লাসে এইরূপ মন্ত্রদ্বারা আদ্যাশক্তিকে প্রণাম করিবার বিধি আছে——

নমঃ সর্ব্বস্বরূপিণৈ্য জগদ্ধাত্রৈ নমো নমঃ
আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ তে কর্ত্রৈ হর্ত্রৈ নমোনমঃ

যিনি সর্ব্বস্বরূপিণী তাঁহাকে নমস্কার, যিনি জগদ্ধাত্রী তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার, যিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্রী, যিনি জগতের সংহারকর্ত্রী, যিনি আদ্যা কালিকা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি॥

এইরূপ নানা শাস্ত্র হইতে ভূরি ভূরি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে বিজ্ঞানবিৎ আর্য্য পণ্ডিতগণ বহুকাল হইতে বুঝিয়াছেন যে, এক অব্যক্ত অনন্ত শক্তিই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির কারণ। এবং যে কোন ব্যক্তি অভিমানশূন্য হইয়া সরলচিত্তে বিজ্ঞানালোচনা করিবেন তাঁহারই এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হওয়া অবশ্যম্ভাবী। হারবার্ট ইস্পেন্সর আর এক স্থানে বলিয়াছেন

"That in their joint recognition of an unknowable cause for all the effects constituting the knowable world, religion and science would reach a truth common to the two"

অতএব যিনি বলেন ঈশ্বর অস্তিত্বে বিশ্বাস বিজ্ঞানবিরুদ্ধ তিনি বিজ্ঞানের ধার কিছুই ধারেন না, অথবা তিনি জাগিয়া ঘুমান, তাঁহাকে বলিবার

আর আমাদের কিছুই নাই। যে শক্তি, বৈজ্ঞানিকগণকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইতেছে, অনাদি, অনন্ত এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্রী সেই আদ্যাশক্তিকে পরমেশ্বর বলিতে আপত্তি কি? কাহার সাধ্য সে শক্তিকে জড়শক্তি বলে? যে শক্তিবলে তুমি আমি জীব, যে শক্তি বলে তুমি আমি বুদ্ধিমান—যাঁহা হইতে আমরা জীবন পাইলাম, যাঁহা হইতে আমরা বুদ্ধি পাইলাম—তাঁহার চৈতন্য নাই? তাঁহার বুদ্ধি নাই? সে শক্তি জড়? জড়বুদ্ধি ভিন্ন এ কথা আর কে বিশ্বাস করিবে?

সেই জ্ঞানময়ী চৈতন্যময়ী সমস্ত জগতের হেতুভূতা পরমাশক্তির স্বরূপ ও উদ্দেশ্য কেহই অবগত নহেন, কেবল যে সকল তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি মুক্তি-কামনায় ইন্দ্রিয়দমন ও মনঃসংযম করিয়া যোগাভ্যাসরূপ মহাব্রত অবলম্বন করেন তাঁহারাই তাঁহাকে কিঞ্চিৎ জানিতে পারেন।

শ্রীলক্ষীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী।

বেদরহস্য।

আমরা চক্ষে স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া থাকি—কর্ণে ভালরূপে শ্রবণ করিয়া থাকি—জগতে সকল সম্প্রদায়ের মনুষ্যগণ বেদের শক্তিকে অকুণ্ঠিত এবং অপ্রতিহত বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। বেদের মধ্যে গূঢ়ভাবে যে প্রেরণীশক্তি নিহিত আছে, তদ্দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত এবং দূরবর্ত্তী অর্থসকল বোধগম্য হইয়া থাকে। সুতরাং বেদমূলক স্মৃতি-শাস্ত্র, শ্রুতিস্মৃতিমূলক লোকাচার বা লোকব্যবহার অবশ্যই প্রামাণিক বলিতে হইবে। বস্তুতঃ শ্রুতি, স্মৃতি, লোকব্যবহার—ইহাদের প্রামাণ্য

খণ্ডন করিতে বা উহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে কেহই সাহসিক বা অগ্রসর নহে। অতএব বেদবিদ্বেষী চার্ব্বাকাদি নাস্তিকগণ লক্ষণ ও প্রমাণ-সিদ্ধ বেদপদার্থের নিরাকরণ করিতে কিছুতেই সক্ষম হইতে পারে না।

এস্থলে আর এককথা বক্তব্য এই—"যে প্রমাণদ্বারা সম্যক্রূপে অনুভব করাইয়া দেয়, তাহার নাম লক্ষণ।" অপরে বলিয়া থাকেন—"যাহার অর্থ কিছুতেই জানা যাইতে পারে না, যদি সেই অজ্ঞাত অর্থদ্বারা কাহারও বোধ হইয়া থাকে, তাহার নাম প্রমাণ।" বস্তু জানিবার জন্য এই দুইটি বিষয় আছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই—বেদবস্তু জানিতে হইলে উক্ত দুইটি বিষয় কিছুতেই ফলোপধায়ক হইতে পারে না—বেদে সম্ভবপর হইতেই পারে না। কারণ, যাঁহারা মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মককে বেদ বলিয়াছেন, তাঁহাদের মতে কতকগুলি বেদমন্ত্রের অর্থ একেবারেই বুঝিতে পারা যায় না। অতএব যদি বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া সম্যক্রূপে তাহাদের অর্থ অনুভূত না হইল, অনুভব করিবার সাধন সামগ্রী লুপ্ত হইল, তবে আর বেদের লক্ষণ কৈ? লক্ষণ না থাকিলে বেদপদার্থ পদার্থ হইতেই পারিল না। সুতরাং বেদের লক্ষণ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে দোষ আর আপত্তি ছিল—এখনও সেই দোষ—এখন ও সেই আপত্তি রহিল। কতকগুলিন বেদমন্ত্রের অর্থ দুরূহ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার কিয়দংশ পাঠকবর্গের সম্মুখে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

(১) "অম্যক্সাত ইন্দ্রঋষ্টিঃ।" (২) "যাদৃশ্মিন্ধায়ি তময়স্যয়াবিদৎ" (৩) "সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতূ" (৪) "অপোস্তমন্যুস্তৃফল প্রভর্ম"। এই সমস্ত বেদমন্ত্রদ্বারা কোন অর্থ বুঝিতে পারা যায় না—ঐ সমস্ত বেদমন্ত্র পাঠে কোন বিষয়ের অনুভব হয় না। অতএব এক্ষণে ভাবিয়া দেখা উচিত, ঐ সমস্ত বেদমন্ত্র কিরূপ? ভাল কি মন্দ? ঐ সমস্ত বেদমন্ত্রের সাধন যে দূরে পরাস্ত হইয়াছে তাহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে। (১) "অধঃস্বিদাসী তদুপরি স্বিদাসী তদিতি" এই বেদমন্ত্রটির আপাততঃ অতিকষ্টে কিঞ্চিৎ অর্থ-বোধ হইতেছে সত্য, কিন্তু—"স্থাণুর্বা পুরুষো বা" এইব্যক্তি স্থাণু অর্থাৎ শাখা প্রশাখাদিশূন্য কোন বৃক্ষের স্কন্ধ? না—বাস্তবিক কোন মনুষ্য? এই

রূপ বাক্যে সন্দেহ থাকাতে যেমন তাহার অর্থবোধ হয় না—তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত বেদমন্ত্রে সন্দেহ থাকা প্রযুক্ত অর্থবোধ হইতে পারে না। অর্থবোধ না হইলে ঐরূপ বেদমন্ত্র প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

কতকগুলিন বেদমন্ত্র অন্যরূপ—তাহাদের বিষয় একে একে নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা—(১) "ওষধে! ত্রায়স্বৈনম্" হে ওষধে! তুমি ইহাকে রক্ষা কর। এই বেদমন্ত্রটি দর্ভ অর্থাৎ কুশ উদ্দেশে কথিত হইয়াছে। (২) "স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ" হে স্বধিতে! তুমি ইহাকে হিংসা করিও না। এই মন্ত্রটি ক্ষুরের বিষয়ে প্রযুক্ত হইয়াছে। (৩) "শৃণোত গ্রাবাণঃ" হে প্রস্তর সকল তোমরা শ্রবণ কর। এই মন্ত্রটি প্রস্তরের উদ্দেশে কথিত হইয়াছে। এই সমস্ত বেদমন্ত্রের কিছু কিছু অর্থ প্রতীত হয় সত্য, কিন্তু ইহাতে আবার নূতন অন্য দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে। দর্ভ, ক্ষুর ও পাষাণ—উহারা অচেতন পদার্থ হইয়াও সচেতন পদার্থের মতন সম্বোধিত হইয়াছে। অচেতনকে সচেতন বলিয়া সম্বোধন করা অন্য একটি নূতন দোষ। "দ্বৌ চন্দ্রমসৌ" দুইটী চন্দ্র—জগতে এই কথাটিতে যেরূপ বিপরীত অর্থ রহিয়াছে, পূর্ব্বোক্ত বেদমন্ত্রে অচেতনকে সচেতন বলিয়া সম্বোধন করাতে পূর্ব্বমত বিপরীত-অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। বিপরীত-অর্থ প্রকাশক হইয়া উক্ত বেদমন্ত্রসকলের প্রামাণ্য নিরূপণ করা অত্যন্ত দুর্ঘট হইয়াছে।

আর একটি বেদমন্ত্র আছে—"একএব রুদ্রো ন দ্বিতীযোঽবতস্থে। সহস্রানি সহস্রশো যে রুদ্রা অধিভূম্যাম্।" অস্যার্থ—রুদ্র একমাত্র, দ্বিতীয় নাই। তাহার পর চরণে ভূতলে সহস্র সহস্র রুদ্র অবস্থিতি করিয়া থাকে। এই দুইটি বেদমন্ত্রের অর্থ অদ্ভুত। একবার বলা হইল রুদ্র এক—আবার পরক্ষণে বলা হইল—রুদ্র সহস্র। "যাবজ্জীবমহং মৌনী ব্রহ্মচারী পিতা মম।" (একজন সর্ব্বসমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে) আমি যাবজ্জীবন মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছি। আমার পিতা ব্রহ্মচারী। এস্থলে—যখন সে ব্যক্তি মুখ দিয়া বলিল, তখন তাহার মৌনব্রত অবলম্বন করা হইল কৈ?। তাহার পিতা যদি যাবজ্জীবন ব্রহ্মচারী হয়, তবে সে নিজে জন্মিল কি প্রকারে?" বস্তুতঃ এইকথাটি যেরূপ ব্যাঘাতজনক অর্থ উদ্ভাবন করিয়া থাকে, উক্ত

বেদমন্ত্রও সেইরূপ ব্যাঘাতজনক অর্থ প্রকাশ করাতে কিছুতেই প্রামাণিক হইতে পারে না।

ক্রমশঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার।

হিন্দু-ধর্ম্মের আন্দোলন বিষয়ে কয়েকটী কথা। *

আজি সর্ব্বত্র সকলের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আগ্রহ দেখিয়া মনে অতুল আনন্দ হইতেছে। যখন মানবতত্ত্ব প্রকাশিত হয় সেই সময়ে কএকজন পরিচিত বন্ধু ভয় দেখাইয়াছিলেন যে উহা আজিকার সমাজে নিতান্ত নিন্দনীয় হইবে। কিন্তু সুখের বিষয় তাঁহাদের কথা সত্য হয় নাই—মানবতত্ত্বে হিন্দুধর্ম্ম ও রীতি নীতি সকলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার প্রয়াস করায় কেহ খড়্গহস্ত হয়েন নাই, বরং সকলেই যুক্তি সকলের দৃঢ়তার সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং বুঝিলাম এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি সাধারণের তত বিদ্বেষ নাই। পরে যখন শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতা সকলে মনোযোগের সহিত শুনিতেছেন দেখিলাম, তখন মনে অত্যন্ত আশা হইল যে হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান হইতে পারিবে। ক্রমে বঙ্কিম বাবু, অক্ষয় বাবু প্রভৃতি প্রকাশ্যে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ ও প্রমাণ করিবার প্রয়াসী হইলে ঐ আশা আরও বলবতী হইল। এক্ষণে সর্ব্বত্রই হিন্দুধর্ম্মের প্রবল আন্দোলন হই-

* এই সম্বন্ধে কয়েকখান পত্র পাইয়া অদ্য এই প্রবন্ধটীর অবতারণা করিলাম মাত্র, প্রবন্ধ লিখিবার জন্য ইহা লিখিত হয় নাই। অবসরমতে আমরা এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

তেছে, সকলকেই এখন স্বধর্ম্মগ্রহণে যত্নশীল দেখা যাইতেছে। তবে কেহ কেহ ভালরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই বলিয়া মধ্যস্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের নিতান্ত বিদ্বেষী ছিলেন তাঁহারাও এখন তদবলম্বনে প্রয়াসী হইয়াছেন। এ অবস্থা আমাদের বিশেষ সুখের বলিতে হইবে। পরকালের মঙ্গল—আধ্যাত্মিক মঙ্গল ছাড়িয়া দিলেও ইহাতে অনেক মঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায়। আজি হিন্দু আত্মগৌরব বুঝিতেছে, আপনার স্বাতন্ত্র্য ও উচ্চ সত্ত্বা বুঝিয়াছে, সকলেই নারীভাব ত্যাগ করিয়া পৌরুষ অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিতেছে।

কিন্তু এই শুভ অনুষ্ঠানের প্রথমেই একটী অনিষ্টাপাত দেখিয়া আমাদের আশঙ্কা হইয়াছে—বোধ হয় দুর্ভাগ্য ভারতবাসীর দুরদৃষ্ট ঘুচে নাই। প্রথমেই দুইটী সম্প্রদায় হইয়া পড়িয়াছে। কেবল দুইটী সম্প্রদায় নহে ঐ সম্প্রদায়দ্বয়ের মধ্যে পরস্পর দ্বেষ জন্মিয়াছে। এ অবস্থা বড় ভয়ানক—বড় শোচনীয়। বিশেষতঃ ভারতের এই নিঃসহায় অবস্থায় উহা আরও ভয়ের কারণ হইয়াছে। এক সম্প্রদায় বলিতেছেন, হিন্দুধর্ম্ম যেমন আছে তেমনই থাকিবে, আর এক সম্প্রদায় বলিতেছেন আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইবে। যাঁহার যেরূপ অভিমত তিনি তাহা বলুন এবং তাহার যুক্তি প্রয়োগ করুন তাহাতে ক্ষতি নাই বরং উপকার আছে; কেন না তদ্দারা সত্য নির্ণীত হইবে। কিন্তু তাঁহারা কেবল তাহাই করিতেছেন না, তাঁহারা পরস্পর বিরোধ করিতেছেন—এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়কে হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী মনে করিতেছেন। এটী বড় কুলক্ষণ। দেশ যেরূপ ইংরাজময় ও ধর্ম্মশূন্য হইয়াছে, তাহাতে এরূপ ব্যবহার বিজ্ঞজনোচিত হইতেছে না। হিন্দুধর্ম্ম মধ্যে শাস্ত্র সম্মত সাম্প্রদায়িকতা ত চিরকালই আছে, হিন্দুগণ ত সেই সকলের সামঞ্জস্য করিয়া লইয়াছেন। শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় ত পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীতবাদী, কিন্তু 'যিনি শ্যাম তিনি শ্যামা' বলিয়া ত তাহার মীমাংসা হইয়াছে—তবে কেন আজি এই সাম্প্রদায়িকতার বিরোধ জন্মে। বিশেষ যখন নাস্তিকতা, খৃষ্টধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রভৃতি আধিপত্য লাভের চেষ্টা করিতেছে তখন হিন্দুর এরূপ গৃহবিবাদ করিয়া আত্মবলক্ষয়সাধনও শত্রু

কর্ত্তৃক উপহাসাস্পদ হওয়া নিতান্ত দুঃখের বিষয়। এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য যিনি হিন্দু বলিয়া আপনাকে প্রকাশ করেন তাঁহাকেই স্বদলে গ্রহণ করিয়া পুষ্টিতা সাধন করা। তাঁহার আংশিক বা সাম্প্রদায়িক দোষ থাকে তাহা শোধন করিবার চেষ্টা করিব মাত্র, তাঁহার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিব না।

পরিবর্ত্তন বিরোধীরা মনে করিতে পারেন, যাঁহারা আজি হিন্দুধর্ম্মের পরিবর্ত্তন প্রার্থনা করিতেছেন তাঁহারা বা তথাবিধ লোকেরা পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মকে নিতান্ত অশ্রদ্ধা করিতেন,—কিছুদিন পূর্ব্বে ইংরাজিশিক্ষিত সকলেই এক-স্বরে বলিতেন হিন্দুধর্ম্ম অতি নিকৃষ্ট, উহাবুদ্ধিমানের অবলম্বনীয় নহে। যে বুদ্ধির দোষে তাঁহারা ঐরূপ বলিতেন সে বুদ্ধির উন্নতি হওয়াতে এক্ষণে তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বুঝিয়াছেন, হয়ত ঐ বুদ্ধি পরিপক্ক হইলে এখন হিন্দুধর্ম্মে যে আংশিক দোষ দেখিতেছেন ও যাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক বিবেচনা করিতেছেন তাহা আর থাকিবে না, এক্ষণে তাঁহারা এত দূর অগ্রসর হইয়াছেন ইহাই যথেষ্ট। অন্ততঃ ইহা মনেকরিরাও পরিবর্ত্তনবিরোধীগণের পরিবর্ত্তনপক্ষীয়দিগকে স্বদলভুক্ত মনেকরা ও হস্তাবলম্বন প্রদান করা উচিত। পরিবর্ত্তন পক্ষীয়েরা মনে করিতে পারেন যে, যে সকল হিন্দুরা কিছু দিন পূর্ব্বে যুক্তি মানিতেন না প্রমাণ মানিতেন না কেবল সংস্কার ও অভ্যাসমাত্রের অনুগামী হইয়া কার্য্য করিতেন, আজি তাঁহারা যুক্তির আশ্রয় লইয়াছেন, বৈজ্ঞানিক প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন, এবং শাস্ত্রদ্বারা না হইয়া কেবল দেশাচার অনুসারে যে সকল কুরীতি প্রচলিত হইয়াছে, তাহার সংশোধন আবশ্যক স্বীকার করিতেছেন। যখন তাঁহারা এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তখন ক্রমে তাঁহারা পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা বুঝিলে পরিবর্ত্তনের পক্ষ হইবেন। উভয়দল পরস্পর এইরূপ মনে করিয়া মিলিত হউন—শত্রুতা পরিত্যাগ করুন। আমরা উভয় দলকেই আপনার মনে করিয়া থাকি। হিন্দু হইয়া উপস্থিত হইবেন তাঁহাকেই আমরা আপনার ভাবিব। এইজন্য আমরা উভয় পক্ষীয় মত ও যুক্তি সকল আমাদের পত্রিকায় স্থান দিব বিবেচনা করিয়াছি। বিদ্বেষশূন্য হইয়া এক পক্ষের মত আর একপক্ষ খণ্ডন করুন। আমাদের নিজের মত এই পত্রিকায় ক্রমে প্রকাশিত হইবে।

মানবের উদ্দেশ্য ও নিষ্কাম ধর্ম্ম।

১

আমরা যাহা কিছু করি সমস্তেরই একটি লক্ষ্য আছে। বিনা উদ্দেশ্যে আমরা কিছুই করি না। উদ্দেশ্য বিনা যাহা করি তাহা কিছুই নহে। বিনা উদ্দেশ্যে খেলাও করিনা। আমরা ধনোপার্জ্জন করি। কেন করি? অবশ্য ঐ ধন দ্বারা আহারীয় দ্রব্য পাইব, শীত বাত নিবারণ করিবার সামগ্রী পাইব, আমাদের যাহা ইচ্ছা তাহা পাইবার চেষ্টা করিতে পারিব, এই জন্যই ধনোপার্জ্জনে যত্ন। যদি ঐ সকল আমাদের প্রয়োজন না হইত অথবা যদি ধন দ্বারা ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন না হইত তাহা হইলে কখনও ধনোপার্জ্জনের চেষ্টা কেহ করিত না। আমরা বিদ্যা উপার্জ্জন করি, কেন বিদ্যোপার্জ্জন করি? জ্ঞান, মান ও ধন পাইবার জন্যই আমরা বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া থাকি। উহার মধ্যে জ্ঞানোপার্জ্জন জন্য বিদ্যা শিক্ষা একরূপ, মানোপার্জ্জন জন্য আর একরূপ এবং ধনোপার্জ্জন জন্য অন্য একরূপ। এখনকার বঙ্গীয় যুবকগণ যে বিদ্যা শিক্ষা করেন তাহার প্রধান উদ্দেশ্য চাকরী লাভ। এই জন্যই যাহা নিতান্ত নীরস ও যাহা শিক্ষার কোন আবশ্যক নাই বুঝিতে পারা যায় তাহাও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত শিক্ষা করিতে হয়। কেন না তাহা না করিলে উদ্দেশ্য সফল হয় না—চাকরী পাই না। ভ্রমণ করিতে করিতে কোন চতুষ্পথে উপস্থিত হইলে, যদি কোন স্থানে যাইবার উদ্দেশ্য থাকে তবে উহার মধ্যে যে পথ দিয়া গেলে সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাওয়া যায়, সেই পথে যাইতে হয়, আর যদি কেবল ভ্রমণ মাত্র উদ্দেশ্য হয় তবে যে কোন পথে যাওয়া যাইতে পারে। এইরূপ আমাদের কার্য্য মাত্রেরই উদ্দেশ্য স্থির থাকা আবশ্যক। উদ্দেশ্য স্থির না হইলে কখনও কার্য্য ফলবান হয় না—সৎকার্য্য কি অকার্য্য বুঝিতে পারা যায় না।

আমরা কার্য্য করি। কিন্তু ঐ সকল কার্য্য প্রকৃত সৎ কি অসৎ তাহা স্থির হইবে কি প্রকারে? অর্থাৎ কোন্ কার্য্য কর্ত্তব্য, কোন্ কার্য্য অকর্ত্তব্য তাহা আমরা বুঝিব কি প্রকারে? অধিক ভোজন করা অন্যায়, রাত্রি জাগরণ করা অন্যায়। কেন অন্যায়? অবশ্য বলিতে হইবে আমাদের শরীর রক্ষা করা উচিত—যাহাতে সেই উদ্দেশ্য সাধন হয় তাহাই করা আমাদের কর্ত্তব্য। অধিক ভোজন ও রাত্রি জাগরণ প্রভৃতিতে শারীরিক যন্ত্র বিকৃত হয় ও তজ্জন্য রোগ ও শরীর ভঙ্গ হইয়া কষ্ট ও অকাল মৃত্যু ঘটে, এই জন্য আমাদের অধিক ভোজন ও রাত্রি জাগরণ অকর্ত্তব্য। যদি শরীররক্ষা আমাদের আবশ্যক না হইত অথবা অধিক ভোজন বা রাত্রি জাগরণে যদি শরীর ভঙ্গ না হইত তাহা হইলে কখনও অধিক ভোজন ও রাত্রি জাগরণ অন্যায় কার্য্য হইত না। কেহ বলেন আত্মরক্ষাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য ও কেহ বলেন পরোপকারই আমাদের প্রধান কার্য্য। ইহার কোন্‌টী সত্য তাহা কি প্রকারে স্থির হইবে? উদ্দেশ্য স্থির হইলে উহার কোন্‌টী সত্য জানা যাইতে পারে, নচেৎ কিছুতেই স্থির হইবে না। কেন না কি জন্য আমাদের আত্ম রক্ষা প্রধান কার্য্য অথবা কি জন্যই বা পরোপকার প্রধান কার্য্য অর্থাৎ আমরা কোন্ উদ্দেশ্য সাধনজন্য আত্মরক্ষা করি এবং কোন্ উদ্দেশ্য সাধন জন্যই বা পরোপকার করি তাহা যদি বুঝিতে পারি, তাহা হইলে ঐ ঐ কার্য্যের মধ্যে যেটী আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম সেইটীকেই অবশ্য কর্ত্তব্য বলিতে হইবে। যদি উহার একটীও প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী না হয় তবে উহার একটীও কর্ত্তব্য নয়। যে উদ্দেশ্য সাধন জন্য যে কার্য্য করা যায় সেই কার্য্য যদি সেই উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হয়, তবেই তাহাকে সেই কার্য্য সাধন সম্বন্ধে কর্ত্তব্য বলিব। অবশ্য উদ্দেশ্য মন্দ বা ভ্রান্ত হইলে কার্য্য মন্দ হইবে এবং উদ্দেশ্য সৎ হইলে কার্য্য সৎ হইবে। এই জন্য উদ্দেশ্য বিষয়ে অগ্রে সাবধান হওয়া উচিত। এই জন্য অগ্রে আমাদের উদ্দেশ্য স্থির করা আবশ্যক। নচেৎ আমাদিগকে কুপথগামী হইতে হইবে। মনে কর আমি জানিয়াছি ধন উপার্জ্জন করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। ঐ উদ্দেশ্য সাধন জন্য আমি সুকৌশলে একটী ধনীর প্রাণ

নাশ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিলাম কোনও প্রকারে কেহ জানিতে পারিল না। যদি উদ্দেশ্য ঠিক হইয়া থাকে অর্থাৎ যদি অর্থ উপার্জ্জনই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ঐ কৌশলকে অবশ্য উৎকৃষ্ট কার্য্য ও কর্ত্তব্য বলিতে হইবে; কিন্তু তাহা যদি না হয় তাহা হইলে ঐ কার্য্য কখনই উচিত হইতে পারে না। এই জন্য অগ্রে উদ্দেশ্য স্থির করা আবশ্যক।

মানব জন্মিয়াছে কেন? কি কার্য্যসাধন তাহার উদ্দেশ্য ইহা যদি জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে কি উপায়ে তাহা সাধিত হইতে পারে জানিবার চেষ্টা হয়। কি রোগ হইয়াছে অর্থাৎ কোন্ যন্ত্র কিরূপ বিকৃত হইয়াছে জানিতে পারিলে রোগোপশামক ঔষধের চেষ্টা হইতে পারে। নচেৎ অন্ধকারে ঢিল মারা হয় মাত্র, অথবা শিরোরোগে জ্বরের ঔষধ খাওয়াইতে হয়। সকল মনুষ্যই কর্ত্তব্য কর্ত্তব্য করিয়া চীৎকার করিতেছেন, কিন্তু কর্ত্তব্য কেন কর্ত্তব্য তাহার প্রকৃত হেতু কেহই দেখেন না। এই জন্য প্রকৃত কর্ত্তব্যও স্থির হয় না। হিন্দু বলিতেছেন এই কার্য্য কর্ত্তব্য, ইংরাজ বলিলেন উহা নিতান্ত অকর্ত্তব্য,—আমরা যাহা বলিতেছি তাহাই প্রকৃত কর্ত্তব্য। ঐ সকল কর্ত্তব্যের সত্যতা সম্বন্ধে যে যুক্তি দেখান হয়, তাহা সত্য কি না স্থির করিতে হইলে অগ্রে দেখা আবশ্যক মানবের উদ্দেশ্য নিরূপিত হইয়াছে কি না? তাহা যদি না হইয়া থাকে তবে সে যুক্তি কোনও কার্য্যকর নহে। কেন না আমার ভয়ে শরীর কাঁপিতেছে—ভয় নিবারণ করা আবশ্যক; সুতরাং তখন যাহাতে ভয় নিবারণ হয় সেইরূপ কার্য্য করা উচিত। কিন্তু তুমি বুঝিলে শীতে শরীর কাঁপিতেছে এবং যুক্তি ও প্রমাণদ্বারা বুঝাইলে শীত নিবারণের লেপ অতি উৎকৃষ্ট উপায়। তজ্জন্য একটী, ক্রমে দুইটী, তিনটী লেপ আমার ঘাড়ে চাপাইয়া দিলে। ঐ কার্য্য ও ঐ যুক্তি কি প্রকৃত মার্গানুসারী হইল? কখনই নয়। কেন না লেপ শীতের উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে, কিন্তু শীত নিবারণ করা ত আমার উদ্দেশ্য নয়? অতএব উদ্দেশ্য স্থির না হইলে যুক্তি খাটিতে পারে না। এই জন্য আমরা অগ্রে মানবের উদ্দেশ্য স্থির করিবার চেষ্টা করিব। আমরা বুঝিতে পারিতেছি উহা স্থির করা আমাদের সাধ্যাতীত, তথাপি যতদূর পারা যায় চেষ্টা করিব।

মানবের উদ্দেশ্য কি? কোন্ উদ্দেশ্য সাধন জন্য আমাদের সমস্ত কার্য্য? এ বিষয়ে সাধারণের মত দেখিতে গেলে বুঝিতে পারা যায় যে, স্বার্থ বা সুখই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। যিনি যাহা করেন সকলেই ঐ স্বার্থ বা সুখের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। নাস্তিকের মতে ঐহিক সুখই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য—আমাদের যাহা কিছু কার্য্য, যত কিছু ধর্ম্ম, যাহা যাহা নীতি সমস্তেরই মুখ্য উদ্দেশ্য স্বার্থ বা আপনার ঐহিক সুখ সাধন। সমাজের মঙ্গলামঙ্গলের দিকে দৃষ্টি না করিলে আপনার মঙ্গল হয় না এই জন্যই নীতির প্রয়োজন এবং এই জন্যই সমাজের মুখাপেক্ষা; নতুবা পরের হিতের জন্য—সমাজের হিতের জন্য আমাদের চিন্তা করার কোনও আবশ্যকতা নাই, এই জন্য যাহাতে আপনার ক্ষতি হয় এরূপ পরোপকার অন্যায় ও নির্ব্বুদ্ধিতা। আস্তিকগণও সুখকে মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মানেন, তবে তাঁহারা এই বলেন যে সুখ সাধন করিতে পরের অনিষ্ট হয় তাহা বাস্তবিক সুখপদবাচ্য নহে। বিজ্ঞ নাস্তিকগণও ঐরূপ বলিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহাদের মতেও পরানিষ্ট সাধন দ্বারা আপনার সুখ সাধন চেষ্টা অসম্ভব, সুতরাং অন্যায়। অর্থাৎ পরানিষ্ট দ্বারা যে সুখ তাহা আপাততঃ সুখ বটে, কিন্তু পরিণামে তাহা অসুখের কারণ হয়, পরে তদ্দ্বারা আপনার অনিষ্ট সাধিত হয়। এই জন্যই বিজ্ঞ নাস্তিকগণ যুক্তিমার্গানুসারী আস্তিকদিগকেও নাস্তিক বলিয়া ঘোষণা করেন অর্থাৎ তাঁহারা বলেন যে উভয়েরই কার্য্য ভাব সমান এবং উভয়েই সমান রূপে নীতি মার্গানুসরণ করিয়া থাকেন; প্রভেদ কেবল ঈশ্বরে বিশ্বাস লইয়া, কিন্তু যুক্তিমার্গানুসারী নাস্তিকগণ যেরূপ ঈশ্বর ব্যাখ্যা করেন তাহা ঈশ্বর না থাকা বুঝিবারই প্রকৃষ্ট উপায় মাত্র; সুতরাং তাঁহারাও এক প্রকার নাস্তিক বিশেষ। একথা কতদূর সত্য তাহা আমরা অন্য প্রবন্ধে আলোচনা করিব, এ প্রবন্ধে উহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হয়। যে হউক আস্তিক নাস্তিক উভয়েই যে মূল উদ্দেশ্য বিষয়ে ঐকমতাবলম্বী অর্থাৎ উভয়েই যে সুখাভিলাষী স্বার্থপর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আমরা সুখাভিলাষকে স্বার্থ-পরতা বলায় হয়ত অনেকে আপত্তি করিতে পারেন। কেন না তাঁহারা বলিবেন যাঁহারা পরের দুঃখ বিমোচন বা পরকে

সুখী করিয়া সুখী হয়েন, তাঁহাদের সুখকে স্বার্থ কি প্রকারে বলিব? যখন এমন লোকও আছেন যিনি পরদুঃখে দুঃখী ও পরসুখে সুখী হয়েন, তখন সুখ মাত্রই স্বার্থপরতা কি প্রকারে হইবে? আমরা উহাকে এই জন্য স্বার্থপরতা বলি যে, ঐ পরদুঃখ বিমোচনাদি কার্য্যও আত্মসুখ সাধনাভিলাষ সম্পন্ন হয়। যাহাতে আমার তৃপ্তি তাহাই আমার স্বার্থ ও তাহাই আমার সুখ। একজন উষ্ণ স্থানে বাস করিতে ইচ্ছা করে আর একজন শীতল স্থানে বাস করিতে ইচ্ছা করে, সুতরাং প্রথমোক্তের উষ্ণ স্থান ও শেষোক্তের শীতল স্থান প্রার্থনীয় স্বার্থ ও সুখের হেতু। প্রথমোক্ত ব্যক্তি উষ্ণস্থান পাইবার চেষ্টা করিলে যেমন তাহার স্বার্থ চেষ্টা করা হইল, শেষোক্ত ব্যক্তি শীতল স্থান চেষ্টা করিলেও সেইরূপ তাহার স্বার্থ চেষ্টা করা হইল এবং প্রথমোক্ত ব্যক্তি উষ্ণ স্থান পাইল যেরূপ সুখী হইল শেষোক্ত ব্যক্তি শীতল স্থান পাইলে সেইরূপ সুখী হইল। সুতরাং বিষয় বিভিন্ন এমন কি সম্পূর্ণ বিপরীত হইলেও উদ্দেশ্য একই রহিল। এক স্বার্থসাধন বা সুখোদ্দেশেই একজন উষ্ণস্থান ও আর একজন তদ্বিপরীত শীতল স্থান পাইবার চেষ্টা করিল। ঐরূপ কেহ আত্মসুখে সুখী ও কেহ পরসুখে সুখী হয়। কেহ আপনার দুঃখ নিবারণ করিতেই ব্যস্ত, কেহ পরদুঃখ নিবারণে ব্যস্ত। যাহাতে আপনার দুঃখ নিবারণ ও সুখ সাধন হয় তাহারই নাম যখন স্বার্থ এবং যখন পরের দুঃখে আপনার দুঃখ হইল, তখন পরদুঃখ নিবারণ করাকে স্বার্থ বলিব না কেন? যখন পরের দুঃখে তোমার হৃদয় উদ্বেলিত হইল ও তাহা নিবারণ করিতে স্বতঃ ইচ্ছার উদ্রেক হইল ও যখন সেই দুঃখ নিবারিত হইলে আত্মদুঃখ নিবারিত হইল তখন তাহা স্বার্থ নহে কেন? তোমার স্ত্রী, পুত্র বা অন্য কাহারও নিদারুণ পীড়া বা অন্য কোনরূপ ভয়ানক কষ্ট জন্য তোমার হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হইতেছে, যতক্ষণ ঐ দুঃখ নিবারিত না হয় ততক্ষণ তোমার মনে শান্তি নাই—ঐ দুঃখ নিবারিত হইলে তুমি শান্তিলাভ কর—তবে ঐ দুঃখ নিবারণ তোমার স্বার্থ নহে কি প্রকারে? আত্মীয় সম্বন্ধে যেরূপ অন্যের সম্বন্ধেও সেইরূপ। যাহার দুঃখে দুঃখী হওয়া যায় ও যাহার সুখে সুখী হওয়া যায়, তাহার দুঃখ নিবারণ ও সুখ সাধন

স্বার্থ হইবে তাহাতে আর কথা কি? তবে ঐরূপ স্বার্থবানেরা সৌভাগ্যবান ও সমধিক প্রশংসার পাত্র। যেমন কদাকার পুরুষ অপেক্ষা সুন্দর-দর্শন পুরুষের অধিক সৌভাগ্য, সেইরূপ কুমনা মনুষ্য অপেক্ষা সুমনা মনুষ্য অধিক সৌভাগ্যবান ও প্রশংসার্হ। কোন সুন্দর পুরুষ দেখিয়া যেমন তাহার দেহের আকৃতির প্রশংসা করা যায় সেইরূপ কোন সুমনা ব্যক্তির অন্তরের প্রশংসা করিতে হয়। যেমন একব্যক্তি দস্যুতা দ্বারা জীবিকা অর্জন ও পরিবার প্রতিপালন করে, আর একজন অধ্যাপনা দ্বারা জীবিকা অর্জন ও পরিবার প্রতিপালন করে—একজন পরের অনিষ্ট করে ও আর একজন পরের হিত সাধন করে; কিন্তু তথাপি উভয়ের উদ্দেশ্য যেমন জীবিকা অর্জন ভিন্ন অন্য কিছু নয়, সেইরূপ একজন আপনার মঙ্গল কামনায় ও আর একজন পরের মঙ্গল কামনায় কার্য্য করিলেও উভয়ের উদ্দেশ্য আপন ইচ্ছা চরিতার্থ বা স্বার্থ-সাধন করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেখানে দুঃখ নিবারণ ও সুখলাভ বাসনায় কার্য্য হয় সেই খানেই স্বার্থ পরতা। ঐ ইচ্ছার পরতন্ত্র হইয়া কি আপনার মঙ্গল চেষ্টা, কি পরের মঙ্গল চেষ্টা, কি ইহকালের সুখ চেষ্টা, কি পর কালের সুখ চেষ্টা সকলই স্বার্থ-পরতা। ঐ ব্যক্তি পরের বা সমাজের হিত চেষ্টা করিতেছে কেন? কারণ তাহা হইলে ঐ সকল ব্যক্তি বা সমাজ তাহার প্রত্যুপকার করিবে অথবা প্রতিবেশী বা সমাজ উন্নত না হইলে আপনি সুখী হওয়া যায় না এই জন্য। আর এই ব্যক্তি পরের হিত করিতেছ কেন? কারণ তাহা করিলে উহার সুখ হয় পরের দুঃখ উহার আপনার দুঃখের ন্যায় জ্ঞান হয়, পরের দুঃখ নিবারিত হইলে উহার নিজের দুঃখ নিবারিত হইবে। আর ঐ যে যোগী দৃঢ় তপশ্চর্য্যা দ্বারা আত্মাকে কষ্ট দিতেছে, আপনার সুখের দিকে কিছু মাত্র দৃষ্টি করিতেছে না উহার উদ্দেশ্য কি? উহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখ উহারও উদ্দেশ্য সুখ বা স্বার্থপরতা। প্রথম দৃষ্টিতে দেখিলে বোধ হয় উহার সুখের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই—কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে স্বার্থ-পরতাই উহার সমস্ত কার্য্যের উদ্দেশ্য। কেন না ঐ যোগী বুঝিয়াছে ইহকাল অতি

সামান্য কাল, এই সামান্য কাল কিছু কষ্ট করিতে পারিলে পরকালে চিরকাল সুখী হইব। যেমন বাল্যকালে কিছু দিন কষ্ট করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিলে চিরজীবন অর্থ ও মান পাইয়া সুখী হওয়া যায়, সেইরূপ ইহকালে কষ্ট করিতে পারিলে চিরকাল সুখী হইতে পারা যাইবে। সুতরাং পাঠার্থী যুবকের ন্যায় ঐ যোগীর মনে প্রবল স্বার্থ-পরতা গুপ্তভাবে রহিয়াছে। তবে অবশ্য ক্রীড়াপরায়ণ যুবক অপেক্ষা যেমন শিক্ষাপরায়ণ যুবক অধিক প্রশংসনীয় সেইরূপ পাপ পরায়ণ নাস্তিক অপেক্ষা ঐ যোগী সমধিক প্রশংসার্হ। অতএব আত্ম-সুখাভিলাষী কুস্বভাবান্বিত, পর সুখাভিলাষী সুস্বভাবান্বিত, ঐহিক সুখ মাত্রাভিলাষী নাস্তিক, পারত্রিক সুখাভিলাষী ধার্ম্মিক ও মোক্ষ প্রত্যাশী যোগী সকলেই স্বার্থপর। স্বার্থ সাধনই সকলের একমাত্র উদ্দেশ্য। সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই পাকতঃ স্বার্থ-পরতা সাধনের শ্রেষ্ঠ উপায়কে ধর্ম্ম বলেন। ব্রাহ্ম বলেন ঈশ্বরের সেবা কর তোমার মঙ্গল হইবে, নচেৎ তোমার দুঃখের সীমা থাকিবে না, খৃষ্টান বলেন খৃষ্টকে না ভজিলে ত্রাণ নাই—চিরকাল কষ্ট পাইবে। এইরূপ সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই আপন সুখের জন্য ঈশ্বরকে ডাকিতে ও কার্য্য করিতে বলেন। আজি কালি কোনও ধর্ম্ম সংস্কারকও সুখকেই ধর্ম্মের নামান্তর বলিয়াছেন। তাঁহার মতে যে কার্য্য করিলে মানব সর্ব্ব বিষয়ে সুখী হইতে পারে সেই কার্য্যের নামই ধর্ম্ম।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে সুখ আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য কি না? তাহা যদি হয়, তবে সুখ সাধনের প্রকৃত উপায় নির্ণীত হইলেই আমাদের সমস্ত উদ্দেশ্য সফল হইল। কেন না তদনুসারে কার্য্য করিলে মানব সুখী হইবে ও তাহার চরম উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। কিন্তু বাস্তবিক সুখ বা স্বার্থ-পরতাই কি আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য? আমাদের বোধ হয় তাহা অসম্ভব। কেননা কাহার সুখ উদ্দেশ্য? আমার—না সমগ্র মানবমণ্ডলীর—না সমস্ত জীব কুলের—না জড়াজড় পদার্থ মাত্রের—না সর্ব্ব উপাদানভূত ভূতগণের সুখ মুখ্য উদ্দেশ্য? তুমি বলিবে প্রত্যেকেই যদি আপনাপন সুখসাধন চেষ্টা করে অথবা প্রত্যেকেই যদি পরের সুখ চেষ্টা করে তাহা হইলেই সকলের সুখসাধন হইল এবং সেইরূপ সকলের সুখই উদ্দেশ্য। তাহা হইলে পাকতঃ প্রত্যেকের আপনার সুখই

উদ্দেশ্য হইল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ঈশ্বর* যে এই জগৎ বা আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য কি? আমাদিগকে সুখী করিবার জন্যই কি তিনি আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন? এ কথা কি সম্ভব হয়? আমাদের যখন অস্তিত্ব মাত্রই ছিল না তখন কি সুখ কি দুঃখ কিছুই আমাদের ছিলনা, তাহার আকাঙ্ক্ষাই আমাদের ছিল না। যখন আমরা ছিলাম না তখন আমাদের 'প্রয়োজন' থাকা কখনই সম্ভব নয়। তবে আমাদের সুখের জন্য তিনি আমাদিগকে বা অপরাপর পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, এ কথার অর্থ কি? যদি আমরা বর্ত্তমান থাকিতাম ও আমাদের সুখের অভাবে দুঃখ থাকিত তাহা হইলে বলা যাইতে পারিত যে ঈশ্বর আমাদের সুখের জন্য নানাবিধ পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু যখন তাহা নয়, যখন আমরাই তাঁহার সৃষ্ট, তখন আমাদের সুখ উদ্দেশে আমাদের সৃষ্টি একথা কখনও সম্ভাবিত হইতে পারে না। তুমি ঐ যে পুতুলটী গড়িয়াছ উহা কি ঐ পুতুলের জন্য না তোমার জন্য? ঐ পুতুল গড়া যদি পুতুলের উপকারের জন্য বলিতে পার তাহা হইলেও জগতের উপকারের জন্য জগতের সৃষ্টি, মানবের উপকারের জন্য মানবের সৃষ্টি বলিতে পার না। কেন না পুতুলের উপকরণাদি ছিল তুমি ঐ উপকরণ ভিন্ন রূপে বিন্যস্ত করিয়াছ মাত্র, এ জগতের উপকরণও ছিল না। যদি বল উপকরণ ছিল তবে চিরকালই ঐ উপকরণ এক ভাবে আছে ও তাহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ বিন্যাস জন্য পদার্থ ও জীবকুলও চিরকাল আছে। যাহা চিরকাল আছে ও চিরকাল থাকিবে তাহার ক্রমোন্নতি হইতে পারে না এবং তাহার কোন উদ্দেশ্যও হইতে পারে না—যখন কোন কার্য্য নূতন সংঘটিত হয় তখনই তাহার উদ্দেশ্য আছে বুঝিতে হয়, যাহা চিরকাল আছে তাহার উৎপত্তিও নাই সুতরাং তদুৎপত্তির উদ্দেশ্যও নাই। অতএব যে

* নাস্তিকেরা 'ঈশ্বর' শব্দ স্থানে 'প্রকৃতি' 'মহাশক্তি' বা তাঁহাদের ইচ্ছামত যে শব্দ মনোনীত হয় বসাইয়া লইবেন। কেন না তাঁহারা ঈশ্বর স্বীকার করেন না বটে কিন্তু তাঁহারা যে আপন ইচ্ছায় স্বশক্তিতে জন্মগ্রহণ করেন ও মৃত হয়েন একথা বিশ্বাস অবশ্য করেন না, কোনও শক্তি বিশেষ হইতে যে তাঁহারা উদ্ভূত একথা তাঁহারা বলিতে অবশ্য বাধ্য। অতএব যে শক্তি হইতে তাঁহারা উৎপন্ন বলেন সেই শক্তিকে 'ঈশ্বর' শব্দ স্থানে বসাইয়া লইবেন।

রূপেই বিচার কর সুখ সমগ্র বিশ্বের বা আমাদের উদ্দেশ্য হইতে পারেনা। অর্থাৎ যদি বল জগৎ বা ইহার উপকরণ কিছুই ছিলনা ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সমস্ত সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইলে জগতের সুখ উদ্দেশে জগৎ সৃষ্ট হওয়া সম্ভব নহে, আর যদি বল এই জগৎ চিরকালই আছে ইহার সৃষ্টিও নাই বিনাশও নাই তাহা হইলে ইহার আরম্ভ না থাকায় ইহার মূলে কোনও উদ্দেশ্য থাকাও সম্ভব নহে। সুতরাং সুখ আমাদের উদ্দেশ্য এ কথা বলা নিতান্ত ভ্রান্তি।

বিশেষতঃ অগ্রে জীব, না অগ্রে সুখ দুঃখ বা সুখ দুঃখের নিয়ম? আহার করিলে সুখ হয়, তবে যে যাহা আহার করে তাহাতেই তাহার সুখ হয় না কেন? মনুষ্যের সুখ অন্নে, গবাদির সুখ ঘাসে. সিংহব্যাঘ্রের সুখ শোণিতে, শূকরের সুখ বিষ্ঠায় কেন? যদি আহার করিয়া সুখী হইবার জন্য জীব পৃথিবীতে আসিয়া থাকে তবে এরূপ নিয়ম কেন? কেন মানব ঘাস খাইয়া সুখী হয় না? কেন মানব ইচ্ছা করিলেই আহারীয় দ্রব্য পায় না? এনিয়মই বা কেন হইল? রমণীসম্ভোগ সুখলাভ করিবার জন্য যদি জীব জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, তবে বাল্যকালে, বৃদ্ধ বয়সে রমণী সম্ভোগ করিতে পারেনা কেন? এবং ঐ সুখ স্থায়ী হয় না কেন? যদি জীবিত থাকিয়া সুখ সম্ভোগ করিবার জন্য জীবের জন্ম তবে জীব মরে কেন? বাল্য, যৌবন অনেকে কাটাইতে পারে বটে কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে ত সকলকেই মরিতে হইবে। তবে জীবনসুখ মানবের উদ্দেশ্য কৈ? কোন্ সুখ জীবের উদ্দেশ্য? যদি সুখই মানবের উদ্দেশ্য তবে সে কোন্ সুখ? কোনও সুখই যখন মানবের ইচ্ছা বা ক্ষমতাধীন নহে, যেরূপ পদার্থ, অবস্থা ও ঘটনার সংযোগে যেরূপ সুখ দুঃখ অবশ্যম্ভাবী তাহাই মাত্র আলিঙ্গন করিতে যখন মানব বা জীবগণ বাধ্য, তখন সুখ মানবের উদ্দেশ্য কি প্রকারে বলিব? ঐ যে বুদ্বুদ্ জল হইতে উঠিয়া জলে মিলাইয়া গেল উহার কি সুখ সাধন হইল? ঐ যে গোলাপ, বেল, মল্লিকা, মালতী পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া সুশোভন রূপ ও মনোহর গন্ধ বিস্তার করিয়া সকলের মনঃ প্রাণ হরণ করিয়া রজনী মাত্র অবস্থান করিয়া শুষ্কদেহ হইয়া মরিয়া গেল, উহার কি সুখ সাধিত হইল? ঐ যে ধান্য, মুদ্গ, গোধুম.

প্রভৃতি মাঠের শোভা বিস্তার ও কএক মাস মাত্র অবস্থিতি করিয়া প্রচুর ডিম্ব প্রসব দ্বারা বহুতর জীবের প্রচুর খাদ্য প্রদান করিয়া গতাশু হইল, উহার কি সুখ সাধন হইল? ঐ যে সুন্দরদর্শন প্রজাপতি প্রভৃতি পতঙ্গ সকল আকাশ মার্গে উড্ডীন হইয়া মানবের মনোহরণ ও উর্ণাসূত্র প্রস্তুত করিবার উপায় করিয়া দিয়া কিছু দিন পরেই জীবলীলা সম্বরণ করিল, তাহাতে উহাদের কি সুখ সাধিত হইল? ঐ যে সুদর্শন অশ্ব ও নিরীহ গোজাতি হল শকট পরিচালন, পৃষ্ঠে ও স্কন্ধে বহন ও দুগ্ধ প্রদান করিয়া মানবের বহুতর প্রয়োজন সম্পাদন করিল তাহাতে উহার কি সুখ সাধিত হইল? ঐ যে ছাগ মেষ প্রভৃতি নিরীহ জীব আপন শরীরের মাংস দ্বারা মানবের সুখ সাধন করিল তাহাতে উহাদের কি সুখ সাধিত হইল? এ সকলের সৃষ্টি কেন? সুখ সাধনই কি ইহাদের উদ্দেশ্য? তাহা যদি হয় তবে ইহাদের সুখ কোথায়? যদি বল ইহাদের সুখসাধন উদ্দেশ্য নয়, মানবের সুখই উদ্দেশ্য, তবে ইহাদের উৎপত্তি কেন? কি জন্য বুদ্বুদের উৎপত্তি হইল, কি জন্য পুষ্প, শস্য, কীট, পতঙ্গ, নিরীহ জীব সকলের সৃষ্টি? যদি উহাদের আপন সুখ সাধন উদ্দেশ্য না হইল তবে উহাদের উদ্দেশ্য কি? যদি বল মানবের সুখ সাধন জন্য উহাদের প্রয়োজন ও তজ্জন্য উহাদের সৃষ্টি তবে মানব যে অন্যের সুখ সাধনের জন্য সৃষ্ট নয়—নিজ সুখের জন্য সৃষ্ট তাহা তুমি কি প্রকারে বুঝিলে? মানবের মুখ্য উদ্দেশ্য সুখ কিসে বুঝিলে? হয় বল সকল পদার্থ আপন আপন সুখ সাধন জন্য সৃষ্ট, না হয় বল সমস্তেরই উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। কতক পদার্থ পরের সুখ সাধন জন্য সৃষ্ট ও কতক পদার্থ আপন সুখের জন্য সৃষ্ট এ কথা তুমি কোথায় পাইলে? কোন্ যুক্তি তোমাকে এ কথা শিক্ষা দিল? বহুতর দ্রব্য মানবের প্রয়োজনে লাগে দেখিয়া কি ভাবিয়াছ পরমেশ্বর ঐ সকল কেবল মানবের সুখের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন? মানব শস্য ভোজন করে, মাংস খায়, পুষ্পের গন্ধ আঘ্রাণ করে, বস্ত্র পরিধান করে, গৃহ প্রস্তুত করে, এই সমস্ত কার্য্যে ইতর জীব, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ অনেক আবশ্যক হয় তজ্জন্যই কি ঐ সমস্ত মানবের সুখের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে বলিতেছ? যে দ্রব্য যাহার প্রয়োজনে লাগে সে দ্রব্য

কেবল তাহারই জন্য সৃষ্ট হইয়াছে বলিতে হইলে, তোমাকে বলিতে হইবে উদ্ভিদ্ সকল গো মেষাদির জন্য, আলোক, তাপ, জল প্রভৃতি উদ্ভিদ্ সকলের জন্য এবং নিরীহ জীবগণ ও জীবশ্রেষ্ঠ মানব সিংহব্যাঘ্রাদির ভক্ষণ জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। যাহার যাহা প্রয়োজন তাহার জন্য যদি তাহার সৃষ্টি বলিতে হয় তাহা হইলে পুত্রের জন্যই পিতা মাতার সৃষ্টি বলিতে হইবে। সুতরাং পুত্রের জন্ম প্রদান ও তাহার প্রতিপালন কার্য্য সমাধা হইয়া গেলেই মানব ও সমস্ত জীবের উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া গেল, আর তাহাদের কোনও প্রয়োজন থাকিল না বলিতে হয়। বোধ হয় প্রাথমিক আর্য্য শাস্ত্রকারেরা ইহা বুঝিয়াই স্থির করিয়াছিলেন পুত্রোৎপাদন মানবের নিতান্ত প্রয়োজন, পুত্র না হইলে মানব পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার হইতে পারে না এবং এই জন্যই তাঁহারা বলিয়াছেন পুত্র উপযুক্ত হইলে তাহার উপর কার্য্যভার অর্পণ করিয়া কার্য্য ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইবে। তাহা যদি হইল তবে সুখ মানবের উদ্দেশ্য কৈ ?

আর এক কথা—যদি ঈশ্বর সুখভোগ করিবার জন্যই মানবকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন তবে মানব সুখী নয় কেন ? মানব কি বাস্তবিক সুখী ? গর্ভাবস্থার কথা আমরা বলিতে পারি না, যে বয়সের কথা আমাদের স্মরণ আছে, সেই সময় হইতে স্মরণ করিয়া দেখ দেখি মানব কবে সুখী ? রোগ, শোক, অবস্থাবিপর্য্যয় প্রভৃতি যাহা মানবের নিজ দোষে হয় বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে তাহা ছাড়িয়া দিয়া স্বাভাবিক অবস্থা গুলি, জন্মগ্রহণ করিলে যাহা ভোগ করিতে হইবেই হইবে, তাহারই বিষয় ভাবিয়া দেখ দেখি মানব কিরূপ সুখী ? অতি শৈশব কালে অগ্নিতে হাত দিতে, চন্দ্র ধরিতে, উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া যাইতে, যাহা ইচ্ছা খাইতে ইচ্ছা হয়; কিছু বড় হইলে সর্ব্বদা রৌদ্রে ও জলে বেড়াইতে, নিয়ত আহার ও ক্রীড়া করিয়া কাল কাটাইতে ইচ্ছা হয়। (এই সময় একবার দন্ত পতন জন্য কষ্ট ভোগ করিতে হয়)। পরে যৌবন কালে ইন্দ্রিয় ও রিপু সকল প্রবল হইয়া নানাবিধ সুখ ভোগের ইচ্ছা জন্মে। এই সকল ইচ্ছা কি চরিতার্থ হয় ? না ঐ সকল চরিতার্থ হইলে মানবের সুখ হয় ? তাহা যদি না হইল তবে

মানবের বাল্য যৌবনে সুখ কৈ ? তাহার পরে প্রৌঢ়কালে শিশু সন্তান ও বৃদ্ধ পিতা মাতার প্রতিপালন ও সামাজিক নিয়ম রক্ষা প্রভৃতির ভার স্কন্ধে পতিত হয় এবং অর্থকষ্ট, চিন্তা, মানহানি প্রভৃতি নিয়ত শারীরিক ও মানসিক কষ্ট প্রদান করে। শেষে শক্তিহীন বৃদ্ধকালে মানবের নানা প্রকার কষ্ট উপস্থিত হয়। দন্তের যাতনা, পক্ক কেশের কষ্ট, শক্তিহীনতা, দর্শন শক্তি ও শ্রবণ শক্তির অল্পতা প্রভৃতি মানবকে এত কষ্ট প্রদান করে যে, তখন মানবের জীবন বিড়ম্বনা মাত্র বলিয়া বোধ হয়। তখন মানবমনে কোনও সুখই থাকে না, প্রত্যুত সেই সকল দুর্ব্বহ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া মানব মৃত্যু কামনা করে। সর্ব্ব শেষে মানবের পরম কষ্টকর মৃত্যুকাল। মৃত্যুর তুল্য কষ্টকর অবস্থা মানবের আর কি হইতে পারে ? যে শরীর রক্ষার জন্য আজীবন নিয়ত শশব্যস্ত থাকিয়া এত কষ্ট করিয়াছি সেই সাধের শরীর, সেই কাম্য জীবন আজি এককালে যাইবে। এত যত্ন করিয়া যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছি, চির-জীবন কষ্ট করিয়া যে সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছি তৎসমস্তই আজি জন্মের মত হারাইতেছি। প্রিয়তম পুত্র, প্রাণাধিকা স্ত্রী, প্রাণপ্রতিম বন্ধু সকলকেই ফেলিয়া—সকল সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া আমাকে আজি একাকী কোন্ অপরিচিত ভয়ঙ্কর স্থানে যাইতে হইবে অথবা আজি আমার অস্তিত্ব শূন্য হইবে—আমি শূন্যে পরিণত হইব ! এই ভয়ানক ভাবনায় শরীর মন অবসন্ন, তাহার উপর আবার রোগের ভয়ানক যন্ত্রণা—শ্বাসের অদম্য কষ্ট ; ইহার তুল্য কষ্ট আর কি আছে ? বিশেষতঃ আমাদের একমাত্র কাঙ্ক্ষণীয় ও মুখ্য উদ্দেশ্য যে সুখ তাহা আজি হইতে আমার এককালে অভাব হইল। এই নিদারুণ মৃত্যু আবার কেবল প্রাচীন কালে হয় না। সকল সময়েই ঐ ভয়ানক যন্ত্রণার আশঙ্কা মানব হৃদয়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে, প্রতিদিনই শত শতবার মানব ঐ যাতনার ভয়ে অস্থির হয়। বিশেষতঃ দেশে যখন মহামারী উপস্থিত হয় তখন ত নিয়তই প্রাণ ধুক ধুক করিতে থাকে।* এই সকল কি মানবের সুখ ? ইহার উপর স্ত্রীজাতীর মাসিক কষ্ট

* অকালমৃত্যু মানবের দোষে হয় বলিতে পারা যায় না। কেন না যখন বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী সকলেরই অকালমৃত্যু আছে তখন উহা মানবের দোষে ঈশ্বরের অনভিপ্রায়ে সজ্ঘটিত হয় কি প্রকারে বলিব ? এবিষয়ের অনেক যুক্তি আছে, মানবতত্ত্ব দেখ।

ও ভয়ানক গর্ভযন্ত্রণা প্রভৃতি আছে। এ সকল দুঃখ ত মানবের স্বাভাবিক। প্রত্যেক মনুষ্যকেই ত এই সকল দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। তবে মানব সুখ ভোগের জন্য সৃষ্ট কি প্রকারে বলিব? এই সকল কষ্ট নিবারিত হয় এমন কি উপায় মানবের দ্বারা হইতে পারে? যদি বল পারে—বিজ্ঞানের সম্যক্ আলোচনা হইলে ভবিষ্যতে হইবে, তাহা হইলে ইহাই বলা হইল যে ভবিষ্যত কালে ঐ উপায় আবিষ্কৃত হইবে সেই ভবিষ্যৎ কালীন মানবের সুখই উদ্দেশ্য। এতকাল যে সকল মানব জন্মিল তাহাদের সুখ উদ্দেশ্য নয়, প্রত্যুত ইহারা পরবর্ত্তী মানবের সুখের জন্যই সৃষ্ট। তবে আর আমাদের সুখ উদ্দেশ্য হইল কৈ? আর ভবিষ্যতে যে মানব এবম্বিধ সুখ পাইবে তাহারই বা যুক্তি কোথায়? তুমি কি ভাবিয়াছ মানব ক্রমে উন্নত হইয়া উন্নতির চরমসীমা বিশেষে উপস্থিত হইয়া স্থির থাকিবে? তাহা যদি ভাবিয়া থাক তবে তোমার নিতান্ত ভ্রান্তি হইয়াছে। কখনও বিশ্বের কোনও পদার্থ স্থির হইবেন, যাহা স্থির হইল তাহার আর অস্তিত্ব থাকিল না—বিশ্বের কার্য্যই ঈশ্বরের কার্য্য। অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের কার্য্য অবশ্য অনন্ত হইবে। সুতরাং যদি পদার্থের কার্য্য থাকিল তবে হয় উন্নতি নয় অবনতি হইবে সুতরাং মানব কখনও উন্নতির সীমা বিশেষে উন্নীত হইয়া স্থির থাকিবে না। এ বিষয়ের আমরা স্বতন্ত্র আলোচনা করিব। সর্ব্বথা মানব নিজে সুখী হইবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। যখন মানবের সত্তামাত্র ছিলনা, আত্মত্ব ছিলনা, ইচ্ছা ছিল না, মানব নিজ ইচ্ছায় বা ঈশ্বরাতিরিক্ত শক্তি বিশেষ হইতে জন্মলাভ করিল না, আপনার সুখের ব্যবস্থা ও নিয়ম নিজে বা অপরে করিল না, চিরকাল বাঁচিল না, দুঃখশূন্য হইতে পারিল না তখন সুখ মানবের চরম লক্ষ্য একথা কিছুতেই বলিতে পারা যায় না। সুতরাং সুখের উদ্দেশমাত্রে মানবের চেষ্টা নিতান্ত ভ্রান্তি। অর্থাৎ ঈশ্বর সুখী করিবার জন্য মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন সে সুখ তাহার অধিকার ভুক্ত এই বিবেচনায় সুখ মাত্রের অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত হওয়া মানবের নিতান্ত ভ্রান্তি। কি ঐহিক কি পারত্রিক কি মোক্ষ কি নির্ব্বাণ কি ঈশ্বরসাযুজ্য কোনও সুখই মানবের উদ্দেশ্য নহে। ঐ সকলের উদ্দেশমাত্রে যিনি চেষ্টা করেন তিনি কখনই কর্ত্তব্য করেন না।

কেহ কেহ বলেন সুখ জগতে নাই, জগৎ দুঃখময়; সেই দুঃখ নিবারণই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং দুঃখ নিবারণ চেষ্টাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। নির্ব্বাণ বা মুক্তি আকাঙ্ক্ষীরা এই মতাবলম্বী। আমাদের বোধ হয় তাঁহারাও ভ্রান্ত। কেন না যে কারণে সুখী হইবার জন্য আমাদের সৃষ্টি সম্ভব নয় সেই কারণে দুঃখী হইবার জন্যও আমাদের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নহে। ইহাতে বরং আরও অনেক দোষ ঘটে। কেন না আমরা যখন ছিলাম না, সুতরাং আমাদের কোনও দুঃখও ছিল না, তখন আমাদিগকে কষ্ট দিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন বলিলে ঈশ্বরকে নিষ্ঠুরের প্রকৃতি বলিতে

যদি আমাদের জন্মই দুঃখের কারণ তবে ঈশ্বর জন্ম দিলেন কেন? অবশ্যম্ভাবী দুঃখকর জন্ম দান করিয়া তাঁহার কি কিছু লাভ আছে? যদি তাহাই হয় অর্থাৎ যদি আমাদিগকে দুঃখ দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য হয় ও সেই জন্য যদি ঈশ্বর আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন তবে আমরা সে দুঃখ নিবারণ করিতে পারিব কেন? সে চেষ্টা কি আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতা নয়? ঈশ্বর দুঃখ দিলে কে তাহা নিবারণ করিতে পারা যায়? আর এক কথা-দুঃখ নিবারণ ও সুখ যদিও ঠিক এক নহে কিন্তু উহাদের প্রকৃতি এক। অর্থাৎ উভয়ই স্বার্থপরতা। কিন্তু স্বার্থ-পরতা যে আমাদের উদ্দেশ্য হইতে পারে না তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি। সুতরাং দুঃখ নিবারণও আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

তবে আমাদের উদ্দেশ্য কি? কি উদ্দেশে আমরা সৃষ্ট ও কোন্ উদ্দেশ্য সাধন মানসে আমরা কার্য্য করিব? ইহার সূক্ষ্ম অনুসন্ধান অনেক কঠিন বটে কিন্তু ইহার স্থূল মর্ম্ম অতি সহজ। অর্থাৎ আমাদের সৃষ্টি বা কার্য্যের উদ্দেশ্য কোনও প্রকার স্বার্থ-পরতা নহে। আমাদের জন্য আমরা সৃষ্ট নহি। যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারই জন্য অবশ্য আমরা সৃষ্ট। তিনি কি উদ্দেশ্য সাধন জন্য আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন অথবা আমরা কি জন্য আদি কাল হইতে অন্তকাল পর্য্যন্ত এরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছি তাহা বুঝা আমাদের সাধ্য নহে বটে, কিন্তু তাঁহারই কোনও উদ্দেশ্য সাধন জন্যই যে আমরা সৃষ্ট তাহাতে আর সন্দেহ কি? সুতরাং আমাদের সমস্ত কার্য্য তাঁহার অভি-

প্রায় সাধন উপযোগী হওয়া চাই। আমরা যাহা করিব সমস্তই তাঁহার কার্য্য সাধনোপযোগী হইবে। অতএব ঈশ্বরকার্য্য—বিশ্বকার্য্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা বুঝিয়াই করি আর না বুঝিয়াই করি, আমরা যাহা করি সমস্তই তাঁহার কার্য্য, আমাদের কার্য্য কিছুই নহে। ঐ যে চুম্বক লৌহ আকর্ষণ করিতেছে, ঐ যে বৃক্ষ ফলভরে অবনত হইয়াছে, ঐ যে পতঙ্গ উর্ণা-তন্তু নির্ম্মাণ করিতেছে, ঐ যে গো দুগ্ধ প্রদান করিতেছে, ঐ যে মানব স্ত্রী-পুত্রের জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতেছে, সকলেই ঈশ্বরের কার্য্য করিতেছে, কেহই আপনার কার্য্য করিতেছে না। বাস্তবিক লৌহাকর্ষণ করিয়া চুম্বকের কোন লাভ নাই, বরফে পরিণত হইয়া জলের কোনও লাভ নাই, সুন্দর রূপ ধারণ করিয়া ময়ূরের কোন লাভ নাই, বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া মানবের কোনও লাভ নাই। সমস্ত লাভালাভই ঈশ্বরের। তিনি যে কার্য্য সাধন জন্য যে পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন ও যে পদার্থে যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন সে পদার্থ যদি না থাকে বা সে পদার্থ সে শক্তি প্রকাশ না করে তবে তাঁহারই উদ্দেশ্য সফল হইবে না। আমি যদি সৃষ্ট না হইতাম তবে ঈশ্বর যে উদ্দেশ্য সাধন জন্য আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইত না। সুতরাং আহার, বিহার, ভ্রমণ, লুণ্ঠন প্রভৃতি যাহা জীবগণ করিতেছে সমস্তই ঈশ্বরের কার্য্যোদ্দেশে করিতেছে। কেহ বা বুঝিয়া করিতেছে কেহ বা না বুঝিয়া করিতেছে। বুঝা না বুঝা তাহাও ঈশ্বরের হাত। ইতর প্রাণীকে তিনি ইহা বুঝিতে দেন নাই, এই জন্য তাহারা বুঝে না, মানবকে বুঝিতে দিয়াছেন এই জন্য মানব বুঝে। যে মানব ইহা বুঝে না সে প্রকৃত মানব-পদ বাচ্য নহে।

অতএব মানব বুঝিবার চেষ্টা কর "তুমি কেহই নহ তোমার স্বার্থ এ জগতে কিছুই নাই—তুমি যাহা কর সমস্তই ঈশ্বর বা বিশ্বকার্য্য সাধনোদ্দেশে"। এই উদ্দেশেই তোমার সমস্ত কার্য্য করা উচিত। ইহারই নাম নিষ্কাম ধর্ম্ম। আর্য্য ঋষিগণ এই পরমতত্ত্ব অবগত হইয়া নিষ্কাম ধর্ম্মের এত প্রশংসা করিয়াছেন। যে কার্য্যে নিজের কোন কামনা নাই—ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধন জন্য যে কার্য্য সম্পন্ন করা হয় তাহারই নাম নিষ্কাম ধর্ম্ম।

"এই নিষ্কাম কর্ম্ম করা যে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিত গণ বুঝেন না, এই জন্য পাশ্চাত্য সভ্যতানুরাগী বঙ্গীয় যুবকগণের এই দশা। তাঁহারা পাশ্চাত্য গুরুর নিকট শিখিয়াছেন সুখ সাধনই মানবের মুখ্য উদ্দেশ্য, ঐ উদ্দেশ্য সাধনের যে উপায় তাহাই উৎকৃষ্ট ও কর্ত্তব্য এবং যাহা উহার বাধা প্রদান করে তাহাই অপকৃট এবং অকর্ত্তব্য। এই জন্য তাঁহারা সমাজ ও ধর্ম্মের এত বিদ্রোহী। সামাজিক নিয়ম সকল ও ধর্ম্ম মত সকল অনেক সময়ে দুঃখজনক বোধ হয় এই জন্য তাঁহারা উহাকে বন্ধন বিশেষ বিবেচনা করেন। ধর্ম্ম ও সমাজের অধীন থাকিলে মানবের স্বাধীনতা থাকে না, অর্থাৎ সুখী হইবার জন্য মানব আপন রুচিমত চেষ্টা করিতে পারে না বিবেচনায় আধুনিক যুবকগণ সমাজ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছেন। তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছেন, অট্টালিকায় বাস, পাখার বাতাস খাওয়া, বরফ জলে পিপাসা নিবারণ করা, মহামূল্য বস্ত্র পরিধান করা ইত্যাদি সুখলাভ করিবার জন্যই মানবের সৃষ্টি, ঐ সকলে যাঁহারা বঞ্চিত তাঁহারা সমাজ বা ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা দিগের উৎপীড়নে পীড়িত। এই জন্য তাঁহারা তারস্বরে বলিয়া থাকেন হে কৃষকপুত্র। কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ কর, হে ধীবর পুত্র! জল পরিত্যাগ কর, হে বিন্মূত্রজীবি! বিন্মূত্র স্পর্শ ত্যাগ কর—সমাজপতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতাদিগের স্বার্থপরতাময় প্রতারণা বাক্য শুনিও না-সকলেই চেষ্টা করিয়া ঈশ্বরের দেওয়া স্বত্ব উপভোগ কর—সকলেই বাবু হও, লেখা পড়া শেখ, চাকরী কর, অট্টালিকাবাসী হও ইত্যাদি। মূল উদ্দেশ্য বুঝিবার দোষে যে নব্য সম্প্রদায়ের এই ভ্রম হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহারা যদি বুঝিতেন ঐরূপ সুখ আমাদের উদ্দেশ্য নহে, কৃষি প্রভৃতি সমস্তই ঈশ্বরের কার্য্য এবং তৎ সমস্তই আমাদের কর্ত্তব্য, তাহা হইলে তাঁহারা কখনও এরূপ বলিতেন না এবং সমাজ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর খড়্গহস্ত হইতেন না।

ক্রমশঃ।

শিব-সংকীর্ত্তন।

রাগিণী রামকেলী—তাল একতালা।

বাজরে মৃদঙ্গ ১ হর হর হর-
বম্ বম্ বম্ হর হর হর।
এক তানে গাও যতেক অমর,
এক তানে গাও মানব নিকর,
এক তানে গাও ভূচর খেচর,
বম্ বম্ বম্ হর হর হর।

২

জ্ঞান কল্পতরু আদিগুরু তুমি,
তব কীর্ত্তি হেতু এ ভারত ভূমি-
আজিও অতুল গৌরব মণ্ডিত,
আজিও পবিত্র সবার পূজিত,
কীর্ত্তিবাস নাম তাই বুঝি ধর?
বম্ বম্ বম্ হর হর হর।

৩

কে বুঝিবে কেন শ্মশানে বিহর,
অস্থি মালা পর, বিষপান কর?
কে বুঝিবে কেন জটা জূট রাখ?
কে বুঝিবে কেন ছাই ভস্ম মাখ?
কে বুঝিবে কেন বিষধর ধর?
বম্ বম্ বম্ হর হর হর।

৪

আগম নিগম আয়ুর্ব্বেদ আর
যোগ শাস্ত্র তুমি করিলা প্রচার;

শক্তির ভাবনা, শক্তিআরাধনা,
যোগেতে করিলা শক্তির সাধনা;
মহাযোগী তুমি যোগের ঈশ্বর।
বম্ বম্ বম্ হর হর হর।

৫

ভূতের শকতি, ভূতের প্রকৃতি,
সম্যক বুঝিতে কাহার শকতি?
তুমি ভূতনাথ বুঝিলা কেবল-
বাখানি সাধিলা প্রভূত মঙ্গল।
যোগ বলে তুমি ত্রিলোচন ধর'
বম্ বম্ বম্ হর হর হর।

৬

যোগ বলে তুমি রিপু বিনাশিলা,
মদন নিধন কটাক্ষে সাধিলা,
সমান করিলা অমিয়া গরল,
জীবে বিতরিলা পরম মঙ্গল।
সদানন্দ তুমি শিবেশ শঙ্কর,
বম্ বম্ বম্ হর হর হর।

৭

তবগুণ গান গাবে নিরন্তর
ভারতে রহিবে যতদিন নর-
ভারতে রহিবে যতদিন নর
গাবে বম্ বম্ হর হর হর।
বম ভোলানাথ প্রথম ঈশ্বর
বম্ বম্ বম্ হর হর হর॥

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী।

পৌত্তলিক ধর্ম্ম।

মনুষ্য স্বভাবতঃ চিরকাল ক্রীড়াশক্ত থাকে। ক্রীড়া কি? চিত্ত-বিনোদক সত্যের অনুকরণ বা প্রতিকৃতির নামই ক্রীড়া। ক্রীড়া স্বয়ং সত্য নহে, সত্যের ছায়া বা প্রতিবিম্ব মাত্র। ক্রীড়ার উজ্জ্বল একটি দৃষ্টান্ত নাটকাভিনয়। ইতিহাসে কোন সত্য ঘটনার বিষয় লিখিত আছে, কিম্বা সমাজে কোন নূতন ঘটনা ঘটিল, আমরা তাহার অনুরূপ ছবি নাট্য-শালায় প্রদর্শন করি। রাম রাবণকে যুদ্ধে আহত করিয়া ছিলেন, আমরা অবিকল একজনকে রাম ও অন্যজনকে রাবণ সাজাইয়া অরাতিনির্ঘাতক আহব উপস্থিত করিলাম, রাম রাবণকে মারিল, দর্শকগণের কৌতুহল পরিতৃপ্ত হইল। কল্য শুনিলাম নবীন এলোকেশীকে হত্যা করিয়াছে, তৎ-ক্ষণাৎ নবীনএলোকেশীর হত্যাকাণ্ড চিত্রিত করিয়া সমাজ চক্ষে ধরিলাম, অমনি সমাজ-হৃদয়ে কৌতুকপ্রবাহ ছুটিল। আমরা যে তাস, দাবা, পাসা, ক্রীড়া করি, বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে তাহাও স্বাভাবিক ঘটনার অনু-লিপি ভিন্ন আর কিছুই নহে। রাবণ রাজা যুদ্ধবিরাম সময়ে সুস্থির থাকিতে না পারিয়া সংগ্রামলালসা তৃপ্তির বাসনায় স্বীয় পত্নীর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষে হস্ত্যশ্ব রথ পদাতি চতুরঙ্গসেনা সজ্জিত হইল, রাজা মন্ত্রী মধ্যস্থ হইলেন, তুমুল সংগ্রাম হইল, একপক্ষের জয় অপর পক্ষের পরাজয় হইল, যুদ্ধানল নিবৃত্ত হইল, রাজার কৌতুহল নিবৃত্ত হইল। তাস ক্রীড়াও ঐ রূপ। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্ম কি বুঝাইবার নিমিত্ত নররূপী হইয়া গোপীগণের সহিত নানাবিধ কৌতুকাবহ ক্রীড়া করিয়া ছিলেন।

ব্যাস প্রভৃতি ঋষি প্রণীত গ্রন্থে ধর্ম্ম ও নীতি উপদেশ দিবার জন্য কৌতুকগর্ভ, নানাবিধ সত্য প্রতিরূপিণী চিত্রগাথা সন্নিবেশিত আছে।

খৃষ্টধর্ম্মে যীশু কি করিলেন? ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নারিকুক্ষিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া নরদেহ ধারণ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব অত্যাশ্চার্য্য অভিনয় করিলেন। ক্রীড়া বা ক্রীড়াত্মক চিত্র মাত্রেরই উদ্দেশ্য শিক্ষা ও তৃপ্তি সাধন।

আবার দেখ বালক বালিকারা কি করে? তাহারা মাটি লইয়া হস্ত, পদ, নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অবয়ব বিশিষ্ট একটী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিল। উহার নাম পুত্তলিকা অর্থাৎ পুতুল। মৃত্তিকায় মানবাকার সৃজন করিতে তাহাদিগকে কে শিখাইল? তাহার উদ্দেশ্য বা কি? মনে যাহা কিছু আমরা ভাবনা করি, তাহা অক্ষর বা কোন চিহ্নদ্বারা ব্যক্ত করি। সেই বাঞ্ছিত চিত্র মানস চিত্রের প্রতিরূপ। অগ্রে কোন পদার্থ ধারণা করি, পরে তাহার যথাযথ অবয়বপরম্পরা বহিরাকারে পরিণত করি। এখন কথা এই কেন আমরা কল্পনা-প্রসূত হৃদয়নিহিত মূর্ত্তিকে হৃদয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া স্থূল-নেত্রের সম্মুখে রাখি? হৃদয় স্ফুরিত না হইলে হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন হয় না। হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত না হইলে অন্তর্নিহিত গূঢ় চিত্তাধিষ্ঠাত্রী দেবীর মোহিনী মূর্ত্তি প্রত্যক্ষীভূত হয় না। চিত্তস্ফূরণই পৌত্তলিক ধর্ম্মের মূল কারণ বা সকল ধর্ম্মেরই মূল কারণ। চিত্তের প্রশস্ততার কারণ কি? প্রেম। প্রেমের আকর কোথায়? সহানুভূতি। আমি যেমন আর এক জন যদি সেই রূপ হয়, তাহাতে আমাতে প্রেম হইল। এই জন্য সমান অবস্থা সম্পন্ন দিগের পরস্পর যেমন প্রেম হয় অন্যের সেরূপ হয় না। এই জন্য সতের সহিত সতের, অসতের সহিত অসতের প্রেম হয় ও পিশাচের সহিত পিশাচের প্রেম সংঘটিত হয়। এই জন্যই ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী অসভ্যেরা পিশাচ দেবতা মানিত। দেখা গেল প্রেম দুইটী বস্তুর মিলন ও সেই দুইটি বস্তু এক নহিলে প্রেম সম্ভবেনা।

সাকার উপাসনার মৌলিক ভিত্তি এই প্রেম মুকুরে প্রতিফলিত আছে। সাকার উপাসনা সত্য মিথ্যা বিচার করিতেছি না। এই মাত্র বলিতেছি সাকার উপাসনা মানব স্বভাবের অন্তস্তলে প্রোথিত। সাকার মানব সাকার ভিন্ন নিরাকার ধারণা করিতে পারেনা ও চাহে না। সাকারদণ্ড ভিন্ন হৃদয় সাগর মন্থন করিয়া প্রেমামৃত উত্তাবন করাইতে আর

কিছুতেই পারেনা। সুবিখ্যাত সাক্ষাৎ ব্রহ্মাংশ রাজা রামচন্দ্র তদীয় পত্নীর যে হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা প্রেমের উৎকৃষ্টতর পরিচয় আর কি হইতে পারে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সমানে সমানে প্রেম হয়। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস ঈশ্বরের সাকার ভাবনা ভিন্ন ঈশ্বরের প্রতি কখনই প্রেম হইতনা। হিন্দুরা সাকারবাদী, প্রতিমূর্ত্তি পূজা করেন। সালগ্রাম তাঁহাদিগের প্রধান দেবতা। কৃষ্ণপ্রস্তরখণ্ডকে চন্দনাচ্চিত ও প্রসূনশোভিত দেখিয়া নিরাকারবাদী উপহাস করেন। তিনি উপহাস করিতে পারেন, কেন না স্থূল দৃষ্টিতে স্থূল ভিন্ন সূক্ষ্ম চিদ্‌গত ভাব তাঁহার প্রত্যক্ষ হয় না। তিনি জানিতে পারেন না যে স্থূল নেত্রাতীত সূক্ষ্ম ভাবনাসূত্রের দ্বারা ঐ প্রস্তরখণ্ডে নারায়ণকে অধিষ্ঠিত করা হইয়াছে। তিনি জানেন না যে ভক্তের হৃদয় প্রেমময়। প্রেমের শাসনে কল্পনা ইষ্টদেবের অভীষ্ট মূর্ত্তি হৃৎপটে অগ্রে অঙ্কিত করিয়াছে। ঐ স্থূল প্রস্তর খণ্ড সেই কল্পিত চিত্রের উচ্ছ্বাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে সাকার ও নিরাকার বাদীর মধ্যে প্রভেদ এই, নিরাকার বাদীরা ডুবদিয়া জল পান করেন— মনে মনে মূর্ত্তি পূজা করেন, আমরা প্রকাশ্যে করি। তাঁহাদিগের ভক্তিপ্রবাহিণী অন্তঃশীলাবৎ মৃদুগতি আমাদিগের ভক্তি তরঙ্গিনী তটোল্লঙ্ঘিনী তীব্রগতি। তাঁহাদিগের অন্তরে এক মুখে আর এক, মুখে তাঁহারা যতই ভান করুন না কেন "বিধাতৃবিহিতং মার্গং কোহপি বর্ত্তিতুং শক্নোতি" স্বভাবের পথ কেহই অতিক্রম করিতে পারেন না। কি মুসলমান, কি হিন্দু, কি খৃষ্টান কি ব্রাহ্ম, সকলের হৃদয়ে ঈশ্বরের কোন না কোন মূর্ত্তি রচিত আছে— আমরা নিশ্চয় বলিতেছি আছে—সংগোপিত আছে। এক সময়ে সর্ব্বত্রই তাহার প্রকাশ ছিল—এক সময়ে ঈশ্বরের রচিত মূর্ত্তি সকল জাতিই পূজা করিত, সমস্ত জাতি এককালে পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। এখনও তাহাদিগের সংখ্যা অপেক্ষা কৃত অধিক। যাঁহারা চিরন্তন প্রাচীন মতের বিসম্বাদী হইয়াছেন, তাঁহারা যে কপটহৃদয়, কুতার্কিক ও কলহপ্রিয় তাহার আর সন্দেহ নাই।

ঈশ্বরকে চিন্তা করি বা তাঁহার মূর্ত্তি রচনা করিয়া পূজা করি কেন?

করি এই কারণে যে, তাহাতে আনন্দ আছে, তৃপ্তি আছে। মনুষ্যজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সুখ। সুখের নিমিত্ত শিশুগণ পুতুল লইয়া ক্রীড়াকরে, সুখের নিমিত্তই সেই পুত্তলিকা যোগী ঋষি আর্য্যগণের উপাসনার আধার হইয়াছে। পৌত্তলিক ধর্ম্ম আমাদিগের এক দিনের নহে, দুই দিনের নহে। ইহার সৃষ্টি মানব সৃষ্টি হইতে, ইহার শক্তি ও প্রক্রিয়া শৈশবকাল হইতে সমাধিকাল পর্য্যন্ত বিদ্যামান।

ঈশ্বরভাবনা ক্রীড়া স্বরূপ, কারণ আমরা যাহা প্রকৃত রূপে ভাবি, তাহা স্বয়ং সত্য নহে, সত্যের প্রতিভা মাত্র, এবং উহাতে চিত্তবিনোদন আছে। আমরা ঈশ্বরভাবনায় স্বয়ং সত্যকেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা লব্ধ করি, একথা ঈশ্বরতুল্য জীবন্মুক্ত সিদ্ধপুরুষ ভিন্ন আর কেহই বলিতে পারেন না। যদি সত্যই ভাবনার বিষয় না হইল, তাহার প্রতিভামাত্র হইল, এবং তাহাতে যদি আনন্দ থাকিল, তবে ঈশ্বর ভাবনা অবশ্যই ক্রীড়া স্বরূপ বলিতে পারি। ঈশ্বর আরাধনাকে ক্রীড়া বলি কেন? কারণ শাস্ত্র-বিশারদ্ পণ্ডিতগণ বলেন যে ক্রীড়া বা অভিনয় বা চিত্রব্যঞ্জন দ্বারা ঈশ্বর ও ধর্ম্ম কি তাহা বুঝা হয়, উহা ভিন্ন মানবমনকে ধর্ম্মপথে আনিবার অন্য উপায় নাই।

ঈশ্বর উপাসনা কালে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি আমরা ভাবনা করি। তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার তবে কি ঈশ্বর সাকার? তাহা যদি না হয় তবে এবংবিধ কাল্পনিক উপাসনা কেন? পাঠক তোমার এই প্রশ্নটি অতি গভীর। আমাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্রচেতা মনুষ্যের পক্ষে ইহার প্রকৃত উত্তর দেওয়া দুঃসাধ্য। যে মহাত্মারা কঠোর তপস্যা ও উপাসনাদি দ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, সেই মহাত্মা দিগের বাক্য স্মৃত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দ্বিতীয় প্রবন্ধে তোমার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। এই ক্ষণে একটি কথা বলিয়া রাখি। ঈশ্বর সাকার নহেন ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত ও সকল ধর্ম্মের মত কিন্তু ঈশ্বর উপাসনায় চৈতন্য গুণ ও শক্তি ভাবনার আবশ্যক। ও ঐ তিনেরই ব্যঞ্জক মূর্ত্তি।

কল্পিত মূর্ত্তিকে আমরা প্রকৃত ঈশ্বরের মূর্ত্তি বলি না। উহা সর্ব্বথা

অলীক উহা কেবল চিন্তার আধার মাত্র। ডিম্বকুটস্থ প্রাণির সহিত, ডিম্ব-কুটের যেরূপ সম্বন্ধ, দেহীর সহিত দেহের যে সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সহিত কল্পিত ঈশ্বরপ্রতিমূর্ত্তির ও আমরা সেইরূপ সম্বন্ধ বুঝিয়াছি। কেবল মাত্র প্রভেদ এই ডিম্বকোষ ও দেহ স্বভাব সৃষ্ট, নির্ম্মিত ঈশ্বরমূর্ত্তি কল্পনারচিত। আমরা জানি ডিম্বকোষ ও দেহ বিনশ্বর, তাহাদিগের স্থায়িত্ব নাই, সুতরাং তাহরা অসত্য। কিন্তু তাই বলিয়া সত্যাসত্যের সহযোগ কি অসম্ভব? অসত্য দেহের সহিত সত্য অবিনশ্বর আত্মার মিলন কি হইল না? ঈশ্বরের কোন মূর্ত্তি নাই সত্য, কিন্তু কোন মূর্ত্তি না ভাবিয়া তাঁহার ভাবনা আমাদিগের পক্ষে দুঃসাধ্য। স্বভাবের সর্ব্বব্যাপী অপরিবর্ত্তনীয় নির্বিশেষ নিয়ম এই যে, সমস্ত সত্য বা শক্তি কোনও আধার বা আকার হইতেই মনুষ্যের জ্ঞান-গোচর হয়। তদ্ভিন্ন উহা মানবের জ্ঞানের বিষয়ই হইতে পারে না। আমরা শক্তির নিরবয়ব স্বরূপ জানি না, জানিবার ক্ষমতাও আমাদের নাই। বৃক্ষ হইতে ফল পতিত হইল দেখিয়া নিউটন্ বলিয়া উঠিলেন অবশ্যই কোন অদৃশ্য গূঢ় শক্তি আছে, নহিলে ফলের অধঃপতন অসম্ভব। জিজ্ঞাসা করি, বিজ্ঞানবিৎ নিউটনের পূর্ব্বে পশ্চিমরাজ্যের কেহ কি কখন ধ্যানে জানিতে পারিয়া ছিলেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কি? আমরা জানি অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে, জ্বলন্ত অঙ্গার বা অগ্নিশিখা চক্ষুর্গোচর না হইলে আমাদিগের তাহা জানিবার অন্যবিধ কি উপায় ছিল? অধিক কি মূর্ত্তিমান জগতে আধ্যাত্মিক শক্তির অযৌগিক জ্ঞান হইতেই পারে না। আর্য্য মহাত্মারা বলেন ঈশ্বর বহুরূপী, চতুর্দ্দিকে যাহা আমরা দেখি, সকলই সেই অনন্তশক্তির প্রকাশ মাত্র। তিনি ইচ্ছাক্রমে এই দৃশ্যমান নানা বিগ্রহধারণ করিয়াছেন। ঋষিগণ পরম জ্ঞানী ছিলেন সুতরাং ঋষিদিগের বাক্য আমাদিগের শিরোধার্য্য ও অবশ্য প্রতিপাল্য। আমরা অশক্ততা প্রযুক্ত তাঁহাদের ব্যবস্থানুযায়ী বিগ্রহধারী ভগবানের উপাসনা করিলে দোষ কি?। বিশেষতঃ আমরা পুত্তলিকা বা প্রতিমূর্ত্তি মাত্রকে ঈশ্বর জ্ঞান করি না। বিপক্ষেরা ঐরূপ বলেন বটে, কিন্তু সেটি যে ভুল তাহা লৌকিক উপাসনা প্রথার বিষয় চিন্তা করিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। কুম্ভকার প্রতিমা গঠন করিল, আমরা

তখন তাহাকে ঈশ্বর বলি না। পরে ঐ প্রতিমা যথাবিধি পূজাস্থানে বেদির উপর স্থাপিত হইল, শুভদিনে শুভলগ্নে উপাসক শুদ্ধশরীব, শুদ্ধমন, শুদ্ধাসন হইয়া প্রতিমার সম্মুখীন হইয়া বসিলেন, উপবেসনান্তে তিনি উপাস্য দেবীকে আহ্বানানন্তর মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উক্ত প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন। উপাসকের মনের কথা তখন বোধ হয় এই—

"জাগ মা আমার" জাগ মা আমার"
সম্বৎসর পরে, জগত-জননি!
ও রাঙ্গা চবণে, লুটাই আবার;—
"জাগ মা আমার," ভব-নিস্তারিণী।"

তখন উপাসক সেই পুরস্থিত মূর্ত্তিতে ঈশ্বরী ভিন্ন আর কিছুই দেখিতেছেন না। মৃত্তিকা তৃণ যুক্ত রঞ্জিত মূর্ত্তির ভেদ জ্ঞান তখন তাঁহার আদৌ নাই। তখন তাঁহার চিত্ত ঈশ্বরময়, ভাবপরিপূর্ণ। পাঠক! উপাসকের চিত্ত তখন এই বলে না কি?—

"কে বলে পাষাণময়ী মায়ের মূরতি,
কে বলে রে মৃন্ময়ী অনন্ত শকতি,
কে বলে মা সুপ্ত মৃত;—কোন্ মূঢ়মতি!
অন্ধ অন্ধ!! তার নাহি নয়ন"!!!

উপাসকের উপাসনা শেষ হইল, অমনি তিনি ধ্যানের সহিত সেই বিশ্বম্ভরার মোহিনীমূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিলেন। তিনি ধ্যানোত্থিত হইলেন, সম্মুখের প্রতিমূর্ত্তি তখন তাঁহার নিকট শবদেহ ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহাতে তাঁহার আর ঈশ্বর জ্ঞান নাই। অতএব সাকার উপাসক মূর্ত্তির ভজনা করেন না—মূর্ত্তিতে ঈশ্বরের আবির্ভাব করিয়া সর্ব্বাবয়ব দ্বারা তাঁহার সম্পূর্ণ পূজা করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

বেদ অনাদি কেন?

বেদ অনাদি কেন? এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দেওয়া আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। আমরা এখন বেদরহস্য জানি না, বেদ যে কি বস্তু তাহার বিন্দু-বিসর্গও জ্ঞাত নহি। ম্যাকসমুলার বেদ ছাপাইলেন, আর আমরা বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের ব্যাকরণের সাহায্যে তাহা বুঝিয়া লইলাম, এরূপ বুঝায় বেদ ও পুরুষের প্রকৃত মহিমা কি তাহা জানা যায় না।

"বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদোমাময়ং প্রহরিষ্যতি।"

বেদ আমাদের ন্যায় অল্পজ্ঞ ব্যক্তি দেখিয়া ভয় পান। পাছে আমরা তাঁহাকে প্রহার করি, এই ভয়ে তিনি জড়সড় হন। বস্তুতঃ আমরা তাঁহাকে নিরন্তরই প্রহার করিতেছি। বেদ আমাদের এখন খেল্‌না হইয়াছে, বেদ আমাদের এখন পরিহাসের উপকরণ হইয়াছে। বেদ পুরুষ পূর্ব্বে "অগ্নি-হোত্রফলা বেদাঃ" অগ্নিহোত্র যাগ ও যজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্যের সাহায্যকারী ছিলেন, এখন তিনি লোকদিগের লেখনীর উপজীব্য। কেহ লিখিলেন, বেদ কি? না আদিম অসভ্য কবির কবিতা। কেহ বলিলেন, বেদ খৃষ্টজন্মের ১২০০ বৎ-সর পূর্ব্বে হইয়াছিল। কেহ বলিলেন, বেদ আদিম অসভ্য জাতিকৃত দেবস্তুতি। শুনিয়া শুনিয়া আমরা হতজ্ঞান; কি করি, আমরা আজও অতদূর জ্ঞানী হইতে পারি নাই, সব্‌জান্‌তা হইতে পারি নাই। কাযে কাযেই আমরা অবাক্। একটা গল্প শুনা আছে, এক ছাত্রএক অধ্যাপকের নিকট পড়িতে গিয়াছিল। তাহার পিতা তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল, পুত্র! যাবৎ না তোমার বিদ্যা হইবে, তাবৎ তুমি গুরুগৃহে বাস করিবে, কদাচ বাটী আসিবে না। পুত্র তথায় কিছু কাল থাকিয়া একদিন ভাবিল, বিদ্যা না হইলে বাটী যাওয়া হইবে না, কিন্তু বিদ্যা যে হইবে, তাহা আমি কিরূপে জানিব! অনন্তর গুরুকে জিজ্ঞাসা করিল, বলি ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আমার

যখন বিদ্যা হইবে, তখন আমি তাহা কিরূপে জানিব? গুরু সে শিষ্যের বুদ্ধিশুদ্ধি জানিতেন, সুতরাং তিনি কৌশলে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন, বাপু হে! যখন দেখিবে যে, পড়া পুথী ও অপড়া পুথী সমান হইয়াছে, তখনই জানিবে যে বিদ্যা হইয়াছে।" ইহা শুনিয়া শিষ্য সেই দিনেই টোলের সমস্ত পুথী খুলিয়া এক একটু করিয়া পড়িয়া দেখিল। দেখিল, সব সমান হইয়াছে। সে যাহা পড়িয়াছিল তাহা যেরূপ বুঝিল, যাহা পড়ে নাই তাঁহাও তদ্রূপ বুঝিল, সুতরাং তুলনায় তাহা সব সমান হইল। সে বুঝিল আমার আর টোলে থাকিবার আবশ্যক নাই। কাযে কাযেই সে তখন বিদ্যাবান্ হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইল। আমরাও এখন এই গল্পকথার ছাত্রেরন্যায় বিদ্বান্। কেন না আমরা ঋজুপাঠ যেরূপ বুঝি—বেদও সেইরূপ বুঝি। যাহাই হউক, আজ কাল যাঁহারা লোককে বেদ বুঝাইতে প্রস্তুত, যাঁহারা বলেন বেবস্তা কি? না সব্জেক্ট, তাঁহাদের নিকট এবং নব্য প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়িদিগের নিকট আমরা একটী মাত্র তত্ত্বকথা জানিতে চাহি।

কেহ পড়িয়া শুনিয়া স্থির করিতেছেন, অমুক স্থানের অমুক লাট (বৌদ্ধস্তূপ) খৃঃ জঃ ৫০০ বৎসর পূর্ব্বের। কেহ বা দূর বীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে দেখিলেন, সূর্য্য দশ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়াছিল। কেহ অনুমান করিলেন, ঋগ্বেদ গ্রন্থখানি খৃঃ জঃ পূঃ ১২০০বৎসরর পূর্ব্বের রচিত। এই সকল ক্রান্তদর্শী কবিদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, তাহারা আমাদিগকে বলুন যে বৈদিক শব্দ সমূহের মধ্যে কোন্ শব্দটী কত কালের? এক একটী বস্তু বুঝাইবার জন্য যে ১০।১২ টী করিয়া শব্দ এখনও তক বিদ্যমান আছে, সে সকল শব্দ কি এক সময়ে উৎপন্ন হইয়াছিল? না সময়ে সময়ে আবিষ্কৃত হইয়া আসিয়াছে? কোন শব্দটী বৈদিক? এবং কোন শব্দটীই বা লৌকিক? ইহা কি আপনারা জানেন? কোন্ শব্দের প্রথম উচ্চারয়িতা কে? তাহা কি আপনারা জানেন? একার্থপ্রতিপাদক ১০টী শব্দের মধ্যে কি এমন কোন শব্দ আছে, যাহাকে আপনারা অনাদি বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন? শৃঙ্গলাঙ্গুলবিশিষ্ট পশু বিশেষকে গো, গাবী, গোণী ইত্যাদি বহু নামে উল্লেখ করা হইয়া থাকে,

কিন্তু কোন শব্দটী কত কালের? কেই বা তাহা প্রথম উচ্চারণ করিয়াছিল? কেই বা ঐ সকল শব্দের দ্বারা শৃঙ্গলাঙ্গুলবিশিষ্ট পশু বিশেষ বুঝাইবার সঙ্কেত করিয়া ছিল, ইহা যদি আপনারা স্থির করিয়া বলিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাদের সমস্ত কথাই আমাদের শিরোধার্য্য হইবে—বেদ যে খৃষ্ট জন্মের ১২০০ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছে, এ কথাও আমাদের বিশ্বাস্য হইবে। নচেৎ উহা অন্যায় অশ্রদ্ধেয় কথা! যাহারা একটী শব্দেরও উপজ্ঞতা (প্রথম উচ্চারণ বা প্রথম সৃষ্টি) জানে না, তাহারা যে শব্দ ব্রহ্ম অনন্ত বেদের সময়াবধারণ করিতে চায়, ইহা সামান্য ধৃষ্টতা নহে।

বেদ যখন শব্দময় এবং শব্দ যখন অনাদি, তখন বেদ অনাদি কেন? এরূপ প্রশ্ন চলচ্চিত্ত অদূরদর্শী শাস্ত্র ও শ্রদ্ধালহৃদয়ের মনে উঠিতে পারে না। উঠিলেও তাহা স্থায়ী হয় না!

শব্দ অনাদি কি সাদি, কোন্ শব্দ অনাদি কোন শব্দই বা সাদি, কে কোন্ শব্দের প্রথম উচ্চারয়িতা কোন সময়ে কোন্ বস্তুতে কোন শব্দের সঙ্কেত আবদ্ধ হইয়াছে, এ সকল কিছুই বলিতে পারিব না, কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিব না, অথচ বেদকে সাদি বলিয়া উপেক্ষা করিব, খৃষ্ট জন্মের ১২০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রচার করিব, ইহা জ্ঞানের বা বুদ্ধিযন্ত্রের পক্ষাঘাত ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। যাহাই হউক, পূর্ব্বকালের ঋষিরা, যাঁহারা বেদকে অনাদি বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, শব্দসমূহের অবিচ্ছিন্ন পারম্পর্য্য উপদেশ থাকা অনুমান করিয়া তদ্বিধ শব্দ ব্রহ্মকে (অবিচ্ছিন্ন পারম্পর্য্যে উপদিষ্ট বা ধারাবাহিকক্রমে সমাগত শব্দ রাশিকে) অনাদি বলিয়া প্রচার করিতেন, সেই সকল মহর্ষিদিগের বেদবিচার বা বৈদিকতত্ত্ব নিরূপণ কিরূপ তাহা আমরা যথাসাধ্য বঙ্গানুবাদ করিয়া পাঠকগণের গোচর করিব, এরূপ ইচ্ছা করিয়াছি; পাঠকগণ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া অত্যল্প প্রতীক্ষা করিয়া, আমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন।

ক্রমশঃ

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

সুখ দুঃখ ও নিষ্কামধর্ম্ম।

সুখ আমাদের উদ্দেশ্য নয়, দুঃখনিবারণ আমাদের উদ্দেশ্য নয়—ঈশ্বরকার্য্যই আমাদের উদ্দেশ্য। তবে কি সুখ ও দুঃখনিবারণ আমাদের প্রার্থনীয় নয়? ঈশ্বর কি এমত স্বার্থ-পর যে, তিনি আপন কার্য্যের জন্য আমাদিগকে দুঃখ প্রদান করেন? আর ঈশ্বরের আবার কার্য্য কি? যদি থাকে তাহা হইলেও আমাদের দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইবে, তিনি নিজে তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন না এ কথারই বা অর্থ কি? এবম্বিধ নানা তর্ক উক্ত বাক্যের উত্তরে হইতে পারে। ঐ সকল কথার উত্তর এক কথায় হইতে পারে না। যথা সাধ্য উহার উত্তর দিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ ঈশ্বরের কোনও কার্য্য নাই বলিলে 'ঈশ্বর আছেনও' বলা যাইতে পারে না। কেননা শক্তিপ্রকাশের নামই কার্য্য, কোনও পদার্থ যখন শক্তি প্রকাশ করে তখনই কার্য্যকরে বলা যায়। যে পদার্থ কার্য্য না করে তাহার কোন শক্তি প্রকাশ হয়না—সুতরাং তাহার শক্তি আছে কি না বলিতে পারা যায় না। যাহার শক্তি আছে তাহার সে শক্তি অবশ্য প্রকাশিত হইবে, প্রকাশিত হইলেই কার্য্য হইল। কার্য্য দেখিয়াই আমরা শক্তি অনুমান করি। যাহাতে যে কার্য্য দেখি তাহার সেই শক্তি আছে বলি, যাহার দ্বারা যে কার্য্য হয় না দেখি, তাহার সে শক্তি নাই বলি। সুতরাং ঈশ্বরের কার্য্য নাই বলিলে ঈশ্বরের শক্তি নাই বলিতে হয়। শক্তির আধারের শক্তি নাই এ কথার অর্থ কি? তাহা অপেক্ষা ঈশ্বর নাই বলাই ভাল, বাস্তবিক উহার অর্থই ঐ। অথবা সর্ব্ব শক্তিমানের শক্তি প্রকাশিত না হইলে সর্ব্বশক্তি-মানের প্রয়োজন কি? শক্তি যদি প্রকাশিত না হইল তবে শক্তির প্রয়োজন কি? সুতরাং ঈশ্বরের কার্য্য নাই বলিলে ঈশ্বর নাই বলিতে হয়। ঈশ্বর

আছেন বলিলে তাঁহার কার্য্য আছে বলিতে হয়। আমরা যখন প্রমাণ করিয়াছি ঈশ্বর আছেন তখন বলিতে হইবে ঈশ্বরের কার্য্য আছে। এই বিশ্বই কি তাহার প্রমাণ নহে? এই বিশ্বদ্বারাই কি তিনি প্রকাশিত হয়েন না? এই বিশ্বই কি তাঁহার কার্য্য নহে? অতএব যিনি বলেন ঈশ্বরের কার্য্য নাই তিনি নিতান্ত ভ্রান্ত। প্রকাশ নাই অথচ শক্তি আছে তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত। তবে কথা এই যে, ঈশ্বরশক্তির আমরা পরিমাণ করিতে পারি না, সুতরাং বিশ্বরূপ কার্য্যের তাঁহার উদ্দেশ্য কি তাহা আমরা বুঝি না? বিশ্বদ্বারা তাঁহার কোনও স্বার্থসিদ্ধ হয় কিনা তাহা আমরা কি প্রকারে বুঝিব? তবে যতদূর বুঝিতে পারি তাহাতে ঈশ্বরের কোনও স্বার্থ নাই বলিতে হয়। কেননা তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। সর্ব্বশক্তিমানের কোন অভাব নাই, থাকিলেও তাহা অনায়াসে পূরিত হয়, তজ্জন্য অন্যের সহায়তার আবশ্যকতা বা চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। বিশেষতঃ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুরই বিদ্যমানতা নাই; যাহা আছে দেখিতেছি তাহা প্রকৃত অন্য নহে। কেননা সে সকলই তাঁহার শক্তি হইতে উদ্ভূত। তিনি যাহাকে যে শক্তি দিয়াছেন সে সেই শক্তি পাইয়াছে। সুতরাং অন্যের দ্বারা যদি তাঁহার কোনও কার্য্য সাধিত হয় তাহা তাঁহারই দ্বারা সম্পাদিত হইল বলিতে হইবে। অতএব ঈশ্বরকার্য্য বলিলে ঈশ্বরের স্বার্থ-পরতা বুঝায় না। পরের দিকে দৃষ্টি না করিয়া কেবল আপন সুখের দিকে দৃষ্টি করার নাম স্বার্থপরতা। ঈশ্বরের যখন পর কেহই নাই, তখন তাঁহার কার্য্য স্বার্থপর কি প্রকারে হইবে? বস্তুতঃ তাঁহার কার্য্যই প্রকৃত কার্য্যপদ বাচ্য। ঈশ্বরকার্য্য বলিলে বিশ্বকার্য্য বুঝায়, সুতরাং উহা আমাদেরও কার্য্য বটে। কেননা আমরাও বিশ্বের অন্তর্গত। ঈশ্বরকার্য্য করিলে অর্থাৎ বিশ্বের মঙ্গলোদ্দেশে কার্য্য করিলে আমাদের নিজেরও মঙ্গল কার্য্য করা হইল।

বিশ্বের মঙ্গল কি জন্য প্রয়োজন, ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন কেন, বিশ্বের কিরূপ অবস্থা হওয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত: তাহা আমরা বুঝি না। তাহা বুঝি না বলিয়াই অনেকে ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যদি সর্ব্বশক্তিমান দয়াবান ঈশ্বর থাকেন তবে আমাদের অবস্থা এত

শোচনীয় কেন? তিনি যখন ইচ্ছা করিলে সকলকে সুখী করিতে পারিতেন, সকলকে চিরকাল বাঁচাইয়া রাখিতে পারিতেন, রোগ, শোক, অভাবজনিত কষ্টের সৃষ্টি আদৌ না করিতে পারিতেন, কবিকল্পিত স্বর্গসুখ আমাদিগকে নিয়ত প্রদান করিতে পারিতেন, তখন তিনি তাহা করেন নাই কেন? যখন করেন নাই তখন অবশ্য বলিব সর্ব্বশক্তিমান করুণানিধান কেহ নাই। যদি কেহ সর্ব্বশক্তিমান থাকেন তবে তিনি নিতান্ত নিষ্ঠুর অথবা যদি কেহ দয়ার্দ্রচিত্ত থাকেন, তিনি যথেচ্ছসাধনে অক্ষম। কিন্তু এরূপ অসম্ভব গুণসম্পন্ন আদিশক্তি স্বীকার করা অপেক্ষা না করাই ভাল। তাঁহাদের এ যুক্তি যে নিতান্ত দূষণীয় তাহা আর বলার অপেক্ষা নাই। কি জন্য জগৎ সুখময় নহে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না বলিয়া ঈশ্বর নাই স্থির করার অর্থ কি? যখন স্পষ্ট বুঝিতেছি আমরা স্বশক্তিতে জাত বা মৃত নহি, যখন স্পষ্ট বুঝিতেছি পদার্থমাত্রই প্রাপ্ত শক্তিবিশিষ্ট ও প্রাপ্ত শক্তি অনুসারে কার্য্য করে, তখন উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি না, সুখ পাইনা ইত্যাদি কারণে ঈশ্বর—সৃষ্টিকর্ত্তা—শক্তিদাতা অস্বীকার করিব? প্রত্যেক্ষের বিরোধ অনুমানের কল্পনা করিব? তাহা কখনই হইতে পারে না। তাঁহার নিষ্ঠুরতা দোষ পরিহার করিবার জন্য কেন ভাব না যাহাকে আমরা জন্ম বলি তাহা প্রকৃত জন্ম নহে, যাহাকে আমরা মৃত্যু বলি তাহা প্রকৃত মৃত্যু নহে এবং যাহাকে আমরা সুখ দুঃখ বলি তাহা প্রকৃত সুখ দুঃখ নহে? ঈশ্বর আমাদের জন্ম দিয়া মারিয়া ফেলিতেছেন না বলিয়া, আমরা চিরকাল জীবিত আছি বল না কেন? বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্যের ন্যায় জন্মের পূর্ব্ব ও পর অবস্থাকে আমাদের অবস্থাবিশেষ বলনা কেন? আর যাহাকে তোমরা সুখ দুঃখ বলিতেছ তাহা প্রকৃত সুখ দুঃখ নহে বিবেচনা কর না কেন? তাহা হইলে ত ঈশ্বর জন্ম দিয়া মারিয়া ফেলিতেছেন এবং আমাদিগকে দুঃখ দিতেছেন বলা হয় না এবং তাহা হইলে ঈশ্বরে আরোপিত দোষও খণ্ডিত হইয়া যায়। তুমি বলিবে আমি মনে মনে ভাবিলেই ত দুঃখকে সুখ ও সুখকে দুঃখ করা যায় না? উহা যে আপনা হইতেই আমাদিগকে ব্যথিত ও তৃপ্ত করে। যাহা দুঃখ তাহা যে মিলিত হইলেই ব্যথার কারণ হয় এবং

যাহা সুখ তাহা যে মিলিত হইলেই তৃপ্তির কারণ হয়। ব্যথাকে তৃপ্তি ও তৃপ্তিকে ব্যথা বিবেচনা কি প্রকারে করিব? ঈশ্বর বা স্বভাব যাহাকে যেরূপে অনুভব করিতে বলিয়াছেন আমরা তাহা সেই রূপেই অনুভব করিতে পারি, তাহার বিপরীত কখনও পারি না। তাহা যদি পারি তবে অন্ধকারে দর্শন ও আলোকে অদর্শন জন্মিতে পারে, আহারে ক্ষুধা ও অনাহারে ক্ষুধা নিবারণ হইতে পারে, শ্রমে আরাম ও বিশ্রামে কষ্ট হইতে পারে। আমরা ইহার উত্তরে বলিতেছি তাহাই বটে। যাহাকে তুমি অন্ধকার ভাবিতেছ তাহাই আলোক এবং যাহাকে তুমি আলোক ভাবিতেছ তাহাই অন্ধকার, যাহাকে তুমি দুঃখ ভাবিতেছ তাহাই সুখ এবং যাহাকে তুমি সুখ ভাবিতেছ তাহাই দুঃখ। সুখ ও দুঃখ বলিয়া জগতে কিছু নাই। উহা মনের আপেক্ষিক জ্ঞান মাত্র। আমরা সম্যক্‌রূপে উহা বুঝিতে পারি না বলিয়াই আমাদের ভ্রান্তি জন্মে। যেমন আমরা পদার্থ সকলকে বিবিধ বর্ণ বিশিষ্ট দেখি, কিন্তু বাস্তবিক পদার্থের কোন বর্ণ নাই, আলোকবিক্ষেপের প্রকরণ অনুসারে পদার্থ সকলে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রতিভাত হয়, সেইরূপ কোন পদার্থই সুখ বা দুঃখ দায়ক নহে, আমাদের গ্রহণের অবস্থা অনুসারে কোন পদার্থ দুঃখকর ও কোন পদার্থ সুখকর বলিয়া বোধ হয়। নিম্নে তাহার কয়েকটী উদাহরণ দেখাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

তুমি ভাগ্যবানের পুত্র, রৌদ্র তোমার শরীরে অত্যন্ত কষ্ট প্রদান করে এই জন্য তুমি ভাবিতেছ রৌদ্র বড় দুঃখজনক, কিন্তু ঐ দেখ কৃষকপুত্র বিনা ক্লেশে রৌদ্রে বিচরণ করিতেছে, উহার নিকট রৌদ্র দুঃখকর নহে। বিবিধ মসলা ও বহু ঘৃত সমন্বিত যে পলান্ন ভোজন করিয়া তুমি রন্ধনকারীর এত প্রশংসা করিতেছ ঐ দরিদ্র তাহা খাইয়া কি বলিতেছে শুন দেখি! দরিদ্র স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছে, ইহারই নাম পলান্ন? ইহাই বাবুরা খান? ইহার ত কোনও আস্বাদই নাই—খাইলে যে বমি হয়"! পলাণ্ডু ও হিঙ্গু অতি দুর্গন্ধ দ্রব্য, উহার গন্ধে বমি হয় কিন্তু কত লোকে ঐ পলাণ্ডুকে এত উৎকৃষ্ট ও সুখাদ্য মনে করে যে, তাহারা উহা ব্যতীত প্রস্তুত আহারীয় আহারীয়ই নহে মনে করে। ঘৃত অতি উৎকৃষ্ট দ্রব্য,

কিন্তু কত লোকে ঘৃতের গন্ধও সহ্য করিতে পারে না, এমত অনেক লোক আছে যে, তাহারা ঘৃত দেওয়া তরকারি পর্য্যন্ত খাইতে পারে না। সুক্তা তিক্ত বলিয়া, ওল কচু গাল ধরে বলিয়া, লঙ্কা তীব্র বলিয়া অনেকে খাইতে পারে না—আবার অনেকে ঐ সকল অতি উপাদেয় জ্ঞানে ভোজন করে। কেহ কেহ সুক্তার অতি ভক্ত, কেহ কেহ ওল কচুর অতি ভক্ত, কেহ কেহ লঙ্কার অতি ভক্ত; অনেকে লঙ্কা ব্যতীত কোন পদার্থই খাইতে পারে না। কতকগুলি লোক তৈলের ও কতকগুলি লোক ঘৃতের অতিপ্রিয়। রাঢ়দেশের লোক অন্ন ভিন্ন এক দিনও খাইতে পারে না। কোনও দেশের লোক অন্ন ভিন্ন বাঁচে না ও কোন দেশের লোক অন্ন খাইতে পারে না, রুটি তাহাদের সুপথ্য। তুমি মনে করিতেছ মদ্যপান করিলে, অহিফেন সেবন করিলে, গাঁজার ধূম পান করিলে নেশা হয় ও অতিরিক্ত ব্যবহার করিলে প্রাণ যায়! কিন্তু ঐ দেখ কত কত লোক এক বোতল মদ্যপান করিয়া, যথেষ্ট পরিমাণ আফিঙ্গ সেবন করিয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিয়াছে। তুমি ভাবিতেছ ১০ রতি অহিফেন ভক্ষণে প্রাণ যায়, কিন্তু ঐ ব্যক্তি নিত্য অর্দ্ধতোলা পরিমিত অহিফেন খাইয়া ফেলিতেছে। তুমি জান রৌদ্রে বেড়াইলে, জলে ভিজিলে, দুর্গন্ধময় স্থানে বাস করিলে, আর্দ্র স্থানে শয়ন করিলে, শরীরে হিম লাগাইলে পীড়া হয় কিন্তু দেখ কত লক্ষ লক্ষ লোক নিয়ত রৌদ্রবাতাদি সেবন, আর্দ্রস্থানে শয়ন, ন্যক্কারজনক পল্লীতে বাস করিয়াও সুস্থ শরীরে রহিয়াছে এবং ঐ সকল নিয়ম পালনকারী শত শত ব্যক্তি রোগ ও যন্ত্রণায় অস্থির ও অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। তুমি ভাবিতেছ, মাংস ও নানাবিধ বলকর দ্রব্য বার বার যথেষ্ট পরিমাণে আহার না করিলে শরীর দুর্ব্বল হয়, কিন্তু ঐ দেখ ব্রাহ্মণবিধবাগণ একবার মাত্র শাকান্ন ভোজন করিয়া কেমন বলশালীনী ও সুস্থ শরীরা রহিয়াছে। হিন্দুস্থানীগণ নিরামিস মাত্র ভোজন করিয়া কিরূপ শারীরিক বলের পরিচয় দিয়াছে তাহা ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে। অতএব মনে করিও না যে পদার্থ সকল নির্দ্দিষ্ট কোন গুণ বিশিষ্ট। পদার্থ সকল যেমন কোনও বর্ণ বিশিষ্ট নহে তেমনি কোনও গুণ বিশিষ্টও নহে। পদার্থ সকল যে পদার্থের সহিত যেরূপ ভাবে সংমিলিত হইবে সেইরূপ গুণ প্রকাশ

করিবে। বিষ্ঠা অতি অশ্রদ্ধেয় ও পরিত্যজ্য দ্রব্য, উহা খাদ্য নয়, উহাতে রক্তকর কোন দ্রব্য নাই কিন্তু উহা শূকরাদি কত জীবের রক্ত ও জীবনের কারণ। মৃত্তিকা ভোজনে পীড়া হয়, উহাতে কোনও বলকর দ্রব্য নাই ভাবিতেছ কিন্তু উহাই আবার কত জীব ও সমগ্র উদ্ভিজ্জ শরীরে রক্তউৎপাদন করে ও তাহাদের জীবন রক্ষার কারণ হয়। অতএব ঐ সকল পদার্থে রক্ত বা পুষ্টিকর দ্রব্য নাই বলা যেরূপ ভ্রম, মাংস প্রভৃতিতে অধিক রক্তকর পদার্থ আছে বলাও সেইরূপ ভ্রম। প্রকৃত কথা এই যে, কোন পদার্থে রক্ত বা কিছু নাই—অথচ সকল পদার্থেই রক্ত প্রভৃতি সমস্ত আছে। পদার্থ বিশেষের সহিত অবস্থা বিশেষে সংযুক্ত হইলে সকল পদার্থ হইতেই সকল কার্য্য পাওয়া যায়। পূর্ব্বে কেবল ইক্ষুতে চিনি পাওয়া যাইত কিন্তু ক্রমে ক্রমে এক্ষণে খর্জ্জুর নাটা, বিটপালন এমন কি পুরাতনবস্ত্র হইতেও চিনি প্রস্তুত হইতেছে। ভঙ্গপ্রবণ কাচ ও কাগজ লৌহ অপেক্ষা কঠিন হইয়াছে। বিজ্ঞান যেমন বলিয়াছে পদার্থ মাত্রেরই তাপ আছে তাপশূন্য পদার্থ আদৌ নাই, সেইরূপ সকল পদার্থেই সুখ ও দুঃখদা শক্তি আছে। গ্রহণের প্রকার ভেদে আমরা বিভিন্ন ফললাভ করি। বাস্তবিক কোনও পদার্থ আমাদের দুঃখ কর নহে এবং কোন পদার্থই সুখকর নহে। ঈশ্বর আমাদিগকে দুঃখময় জগতে আনয়ন করেন নাই। তিনি জন্ম দেন না মৃতও করেন না—দুঃখও দেন না সুখীও করেন না। তিনি চিরকাল আমাদিগকে সমানভাবে বর্ত্তমান থাকিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন, আমরা বুঝিতে পারিলেই সমান সুখে চিরকাল অতিবাহন করিতে পারি একবারও দুঃখ পাই না। সে কিরূপে সম্পন্ন হয় তাহা জানাই আমাদের কার্য্য, পদার্থ বিশেষ প্রার্থনা আমাদের কার্য্য নহে।

যেরূপ দেখা গেল তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, সুখ দুঃখ পদার্থগত নহে। সুতরাং সুখের প্রার্থনা করিতে হইলে কোনও পদার্থের প্রার্থনা আবশ্যক নহে। যখন সকল পদার্থই সুখকর ও সকল পদার্থই দুঃখকর তখন সুখ কামনায় কোনও পদার্থেরই কামনা করা যায় না। আরও দেখা যাইতেছে একই পদার্থ এক জনের কখনও দুঃখকর হইতেছে ও কখনও সুখকর হইতেছে। অদ্য যাহা

দুঃখকর কল্য তাহাতে আর দুঃখ থাকে না এবং অদ্য যাহা সুখকর কল্য তাহাতে আর সুখ থাকেনা। প্রথমে পলাণ্ডু খাইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বোধ হয়, অভ্যাস কর ক্রমে উহা অতি উপাদেয় বোধ হইবে, লঙ্কা, তাম্রকুট, চা, অহিফেন, মদ্য প্রভৃতি সমস্তই প্রথম আস্বাদনে অত্যন্ত কটু বোধ হয় কিন্তু অভ্যাস করিলে ঐ সকল আবার অতি উপাদেয় বলিয়া বোধ হয়, এমন কি ঐ সকল না পাইলে মানবের কষ্টের সীমা থাকে না। সকল অবস্থায় মনুষ্যের যে দ্রব্য প্রথমে দুঃখকর বোধ হয় অভ্যাস বলে সেই দ্রব্যে আর দুঃখ থাকে না বরং তাহা সুখের কারণ হয়। সুখের সম্বন্ধেও ঐরূপ। সন্দেস বড় মিষ্ট লাগিল, প্রতিদিন যথেষ্ট সন্দেশ খাও আর তাহাতে সে মিষ্টত্ব থাকিবে না; কোমল শয্যায় শয়নে বড় আরাম হইল, কিছু দিন ঐরূপ শয়ন করিলে আর তাহাতে সে সুখ থাকে না। ঐরূপ স্ত্রী সম্ভোগ, অট্টালিকাবাস, সুগন্ধ দ্রব্য আঘ্রাণ, সংগীত শ্রবণ প্রভৃতি যাহা কিছু প্রথমে সুখকর বলিয়া বোধ হয়, নিত্য অভ্যাস করিলে তৎসমস্তেরই সুখ নষ্ট হইয়া যায়, এমন কি অনেক সময়ে ঐ সকল অত্যন্ত কষ্টদায়কও হয়। অতএব যখন একই পদার্থ এক সময়ে দুঃখকর ও অন্য সময়ে সুখকর হয় ও যখন এক পদার্থ একের দুঃখকর ও অন্যের সুখকর হয়, তখন পদার্থের গুণে সুখ দুঃখ হয় কি প্রকারে বলা যাইবে? বরং ইহাই বলিতে হইবে যে, অভ্যাসই সমস্ত সুখ দুঃখের নিদান। ঐ উর্দ্ধবাহু হস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া রাখিয়াছে, ঐ সন্ন্যাসী কণ্টকশয্যায় শয়ান রহিয়াছে, ঐ যোগী অনাহারে সমাধি করিতেছে, উহাদের কাহারও দুঃখ নাই। আবার ঐ বাবু অট্টালিকায় বাস করিতেছেন, ঐ রাজা মহাধুমধামের সহিত বাস করিতেছেন, ঐ সম্রাট্ সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন উহাদের কাহারও মনে সুখ নাই। কেন না সুখ দুঃখ পদার্থ গত নহে, প্রকৃত সুখ দুঃখ অভ্যাস মূলক ও মনোগত। যে পদার্থ ভয়ানক কষ্টকর অভ্যাস গুণে তাহাই সুখকর হয় এবং যাহা নিতান্ত জঘন্য, মনে শ্রদ্ধা থাকিলে তাহাই উৎকৃষ্ট হয়। মনের শ্রদ্ধার উপর পদার্থের গুণাগুণ এত নির্ভর করে যে, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয় শ্রদ্ধার বলে অতি কুৎসিতা রমণী নিতান্ত রূপবতী হয়, অতি সামান্য ঔষধ

বা বিনা ঔষধে রোগ আরাম হয়। নিত্য ইহার শত শত উদাহরণ দেখা যাইতেছে।

অতএব বুঝা গেল, সুখ দুঃখ পদার্থগত নহে। কার্য্যগত প্রক্রিয়ার উপরেই সমস্ত সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে, অভ্যাস ও মনোগত শ্রদ্ধার উপরেই সমস্ত সুখ দুঃখ নির্ভর করে। যদি মানবের সুখই এই জগৎ সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে কখনই সুখ দুঃখের এরূপ অবস্থা হইত না। তাহা হইলে ঈশ্বর এমত কতকগুলি পদার্থ সৃষ্টি করিতেন যে, তাহার সংস্পর্শে সুখ হইতই হইত এবং এমত কতকগুলি পদার্থ সৃষ্টি করিতেন যে তাহার সংস্পর্শে দুঃখ হইতই হইত। ঐ সকল পদার্থ প্রাপ্ত হইলে কি ইতর কি ভদ্র, কি ধনী কি নির্ধন, কি পণ্ডিত কি মূর্খ, কি বলবান কি দুর্ব্বল, কি বৃদ্ধ কি শিশু, কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলেই সুখী অথবা দুঃখী হইত অর্থাৎ ঐ সুখকর পদার্থ যেই কেন পাউক না সেই সুখী হইত এবং ঐ দুঃখকর পদার্থ যেই কেন পাউক না দুঃখী হইত। কিন্তু এরূপ পদার্থ যখন ঈশ্বর সৃষ্টি করেন নাই তখন মানব কি কাহাকেই সুখী বা দুঃখী করিবার জন্য যে ঈশ্বর সৃষ্টি করেন নাই তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। অথচ যখন দেখা যাইতেছে প্রক্রিয়া অনুসারে পদার্থ গ্রহণ করিতে পারিলে সকল পদার্থ হইতেই সুখ পাওয়া যায়, তখন স্পষ্টই বুঝিতে হইবে যে, পদার্থ সকল নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ব্যবহার করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত। তাঁহার অভিপ্রেতরূপে কার্য্য করিতে পারিলে সকল পদার্থ হইতেই সুখ পাওয়া যায়। প্রতিবাদকারীরা হয়ত বলিবেন, বাস্তবিক এরূপ পদার্থ জগতে আছে। যে সকল পদার্থ প্রথমেই উত্তম বোধ হয়, সেইগুলি ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত। মিষ্ট দ্রব্যও দুগ্ধ প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ ব্যক্তি মাত্রেরই প্রথমাবস্থায় প্রিয়, অধিক অভ্যাস জন্য তাহার সুখদায়িতা না থাকিলেও প্রথমে উহা সুখকর। ঐ সকল দ্রব্যকেই আমরা প্রকৃত সুখকর দ্রব্য বলিব। যখন অভ্যাস-বশতঃ ঐ সকলের সুখাস্বাদ কমিয়া যাইবে, তখন আমারা উহার পরিমাণ বৃদ্ধকিরিব অথবা তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দ্রব্য গ্রহণ করিব। এই জন্যই মানবের উন্নতির আবশ্যক। একই অবস্থায় মানব চিরকাল সুখী হয় না বলিয়াই

মানবের উন্নতি আবশ্যক; উন্নতি থাকিলেই মানব সুখী হইবে। এই সকল কথার ভিতর কিয়ৎ পরিমাণ সত্য আছে বটে, কিন্তু ইহার মূল সত্য নহে। অর্থাৎ কতকগুলি বাস্তবিক সুখকর পদার্থ নাই। তবে যে কতকগুলি পদার্থ প্রথম হইতে প্রিয় হয় তাহারও কারণ অভ্যাস। বাল্যকাল হইতে ঐ সকল দ্রব্য ব্যবহার করা অভ্যাস হইয়াছে বলিয়াই ঐ সকল সুখকর,—যে শোণিতে জন্ম সে শোণিতে ঐ সকল অভ্যস্থ বলিয়াই সুখকর, নচেৎ উহা কখনও সুখকর হইত না। যদি অন্নপ্রাশন না হইয়া ঘাসপ্রাশন হইত তাহা হইলে কি হইত বলা যায় না। তাহা হইলে যে প্রথম হইতে ঘাস আমাদের মিষ্ট লাগিত না একথা বলা যাইতে পারে না। তবে জন্ম শোণিতের অভ্যাস বশতঃ রুচিকর না হইতে পারে। ফলতঃ জন্মপ্রকৃতির সহিত আমাদের শরীর বিশেষরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট। এই জন্য জন্মের অবস্থা অনুসারে কতকগুলি পদার্থ আমাদের প্রথম হইতে সুখের ও কতকগুলি পদার্থ দুঃখের কারণ হয়। এই জন্যই আর্য্যঋষিরা জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। যে যে প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে যেন তদনুরূপ পদার্থ প্রাপ্ত হয়, এই জন্য বংশানু ক্রমিক প্রকৃতি অনুযায়ী কার্য্য ও অবস্থার ব্যবস্থা হইয়াছে। উন্নতি যদি সুখের কারণ হয় তাহা হইলে আপনাপন প্রকৃতি অনুসারে উন্নতি করা উচিত। যে কোনও প্রকারে উন্নতি অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট কোন অবস্থা বা বস্তু প্রাপ্ত হইবার জন্য উন্নতি আবশ্যক নহে। কেন না ঈশ্বর যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার কিছুই মন্দ নহে, সমস্তই প্রয়োজনীয়। বিষ হইতে অমৃত পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থই বিশ্বকার্য্য জন্য আবশ্যক। অনাবশ্যক বা দুঃখ-দায়ক পদার্থ সৃষ্টি করার প্রয়োজন ঈশ্বরের হওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না। আমরা কেবল অনুমান করিয়া এ কথা বলিতেছি না—স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। সকল দেখা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে বটে, কিন্তু যাহা যাহা আমরা দেখিতেছি তাহা দ্বারাই আমরা ইহা বুঝিতে পারিতেছি। যাহা আমরা অতি অপকারী ভাবি তাহাতেও অনেক গুণ দেখা যায়। প্রাণ-ঘাতক বিষ প্রাণ রক্ষার অতি চমৎকার ঔষধ, নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি কাম সৃষ্টি রক্ষার একমাত্র উপায়। ঈশ্বরানুমত রূপে ঈশ্বরকার্য্যে ব্যবহার করিবার জন্য

ব্যবহার করিলে বিষ অমৃত হয় এবং কাম বহু কল্যানপ্রসূ হয়। কিন্তু সুখসাধন মানসে ব্যবহার করিলে বিষ কেন অমৃতও বিষ হয় এবং কাম কেন দয়াও কুফলপ্রসূ হয়। এই জন্য সুখসাধন মানসে না করিয়া ঈশ্বরাভিপ্রেত সাধন মানসে কার্য্য করা আমাদের উচিত। উহারই নাম নিষ্কামধর্ম্ম এবং উহাই প্রকৃত সুখের উপায়।

বাস্তবিক সুখকর বা দুঃখকর পদার্থ কিছুই নাই। সুখ দুঃখ সমস্তই নিজের কাছে। একটী সস্কৃত শ্লোক আছে সেটী স্মরণ হইতেছে না, তাহার মর্ম্ম এই—পৃথিবীকে চর্ম্মদ্বারা মণ্ডিত করিয়া তদুপরি ভ্রমণ করা কখনও সাধ্যায়ত্ত নহে, কিন্তু আপনি যদি জুতা পরিয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করি তাহা হইলেই পৃথিবীকে চর্ম্মাবৃত করা হইল। সেইরূপ জগতের সমস্ত লোক ভাল হইবে সকল পদার্থই আমাকে সুখী করিবে এরূপ চেষ্টা অসম্ভব, আপনি ভাল হইলে আপনি সন্তুষ্ট থাকিলে সকলকেই ভাল দেখা যায় এবং সকলে আমাকে ভাল বাসিতেছে বুঝা যায়। বাস্তবিক ঐ কথাই ঠিক। আপনি ভাল হইলে—সন্তুষ্ট হইলে সকল পদার্থ ও সকল অবস্থাই সুখের হয়, আপনি মন্দ হইলে সকল পদার্থ ও সকল অবস্থাই মন্দ হয়। সুখের জন্য ব্যস্ত হইলে কখনও সুখ পাওয়া যায় না। পৃথিবীর তাবৎ লোকে সুখের জন্য নিয়ত বিবিধ চেষ্টা করিতেছে কিন্তু কেহ কি সুখের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে? কাহার আশা সম্পূর্ণ হইয়াছে? অবশ্য বলিতে হইবে কাহারই নয়। যদি মানব কার্য্যচেষ্টাকে সুখ মনে না করিত তাহা হইলে দেখা যাইত পৃথিবীর কোনও ব্যক্তিই এক দিনের জন্যও সুখী হয় নাই। ভোগদ্বারা কখনও তৃপ্ত হইতে দেখা যায় নাই। যত ভোগ হয়, ততই ভোগের লালসা বৃদ্ধি হইতে থাকে। মানুষ চেষ্টা করিয়াই সুখী—কার্য্য করিয়াই সুখী, ফললাভ করিয়া সুখী নয়। যদি ফলদ্বারা সুখী হইত তাহা হইলে ঐ যে দরিদ্র দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া অর্দ্ধ মুদ্রামাত্র প্রাপ্ত হইয়া সুখলাভ করিল কিন্তু ঐ ধনীর গৃহে উক্তরূপ লক্ষ অর্দ্ধমুদ্রা সঞ্চিত থাকিয়াও সুখী নহে কেন? মুদ্রাই সুখের কারণ হইলে ঐ ধনী অবশ্য ঐ দরিদ্র অপেক্ষা লক্ষ গুণে সুখী হইত। কিন্তু তাহা দূরে থাকুক ঐ দরিদ্র অপেক্ষা ঐ ধনী অনেক পরি-

মাণে দুঃখী। আবার দেখ ঐ ধনী দরিদ্রদিগকে দান করিয়া কত সুখ অনুভব করিতেছে। যদি মুদ্রাই সুখের কারণ হইত তাহা হইলে মুদ্রা ত্যাগে কখনও সুখ হইত না—দুঃখই হইত। অতএব আমরা ফল প্রাপ্তে সুখী নহি কার্য্য করিয়া সুখী। এই জন্য শ্রমজীবীরা দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়াও সুখী এবং ধনীরা আলস্যে সময় অতিবাহন করিয়া দুঃখী। যে যত কার্য্যে রত সে তত দুশ্চিন্তাশূন্য এবং যে যত কার্য্যশূন্য সে তত দুশ্চিন্তারত। দুশ্চিন্তা যে কত ক্লেশকর তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। কার্য্যফল যে সুখের কারণ নহে তাহা রাসেলাসের বিবরণ পাঠেও জানা যায়। রাসেলাসের সুখের সমস্ত দ্রব্যই ছিল, কোন অভাবই তাঁহাকে ব্যথিত করিতে পারিত না—যে সকলের জন্য মানব চেষ্টা ও পরিশ্রম করে তাহার ফল স্বরূপে সমস্ত উপকরণই তাঁহার ছিল। কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে সুখী করিতে পারে নাই। তিনি নিয়তই চিন্তা করিতেন এবং বলিতেন কি পাইলে আমি সুখী হইব তাহা যদি জানিতে পারি, তাহা হইলে তাহার চেষ্টা করিতে পারি, চেষ্টা করিতে পারিলে, অন্ততঃ চেষ্টা করিতেছি ভাবিয়াও সুখী হই। পরিশেষে রাসেলাস পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সুখের অনুসন্ধানে ভ্রমণ করিলেন, সকল সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে মিসিলেন কিন্তু কোনও খানেই সুখ দেখিতে পাইলেন না; অর্থাৎ ফলভোগী সুখী কোথায়ও দেখিতে পাইলেন না। যদি ফলে সুখ হইত তাহাহইলে স্বয়মাগত ফলেও অবশ্য সুখ জন্মিত—শ্রমের ফলস্বরূপ অর্থভূয়িষ্ঠ ধনীসন্তানের সুখের অবধি থাকিত না। বাস্তবিক ফলদ্বারা যদি সুখ হওয়ার ব্যবস্থা হইত তাহা হইলে সকলেই কার্য্যের ফল প্রাপ্ত হইত। কিন্তু কয় জন লোক কার্য্যের ফলভোগ করে? আমরা বোধ করি অতি অল্পলোক অথবা কেহই নহে। যদি ফলভোগই সুখের একমাত্র কারণ, তবে ফলপ্রাপ্তির এরূপ অবস্থা কেন? কেন কেহ অজস্র চেষ্টা করিয়াও ফল প্রাপ্ত হয় না ও কেহ বিনা চেষ্টায় ফললাভ করে? কেন একজন ভয়ানক পরিশ্রম করিয়া ১০ টাকা পায় না ও একজন পিতার উপার্জ্জিত লক্ষ টাকা পায়? যদি চেষ্টা জনিত শ্রম কষ্টের কারণ হয় ও ফলস্বরূপ অর্থ সুখের কারণ হয়, তবে এরূপ অবস্থা কেন?

এবং কেনই বা মহাধনীগণ আবার ধন বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন? যখন কার্য্য কষ্টের হেতু ও কার্য্যফল সুখের হেতু তখন কেন ধনীসন্তানগণ ধন বৃদ্ধির চেষ্টা রূপ কার্য্য করিয়া বৃথা দুঃখভোগ করে? বাস্তবিক ফল সুখের কারণ নহে— কার্য্যই সুখের কারণ। এই জন্যই মহাধনীগণ ধনবৃদ্ধির চেষ্টা করেন অর্থাৎ কার্য্যদ্বারা সুখলাভ করেন। নচেৎ তাঁহারা কোনও কার্য্যই করিতেন না। অতএব আমরা কার্য্য মাত্র করিব, ফলের দিকে দেখিব না। ফল ফলিল কি না তাহা দেখা আমাদের কার্য্য নহে। কার্য্যফল সমস্ত ঈশ্বরের। আমরা যে সকল কার্য্য করি তৎসমস্ত ঈশ্বরের কার্য্য এবং ঐ কার্য্যের যে ফললাভ করি তাহাও ঈশ্বরের; কার্য্য করা মাত্র আমাদের কার্য্য, তাহাই আমরা করিব। ফললাভ হওয়া না হওয়া ঈশ্বরের হাত, আমাদের হাত নহে, সুতরাং তজ্জন্য আমরা দুঃখিত বা সুখী হইব না। ঈশ্বর ফললাভ হইতে দেন ফল হইবে, না দেন হইবে না। আমাদের তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই।

ক্রমশঃ

বেদরহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কতকগুলিন বেদমন্ত্র কেবলমাত্র লোকপ্রসিদ্ধ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। যথা—(১) "আপ উন্দন্তু" জল সকল ক্লেদান্বিত করুক। এই বেদমন্ত্রটি ক্ষৌর কর্ম্ম করিবার সময় জল দ্বারা যজমানের মস্তকের ক্লেদ করা অর্থ প্রকাশ করিতেছে। (২) "শুভিকে! শির আরোহ শোভয়ন্তী মুখং মম।" হে শুভিকে! (অর্থাৎ টোপর) তুমি আমার মুখ শোভিত করিয়া মস্তকে আরোহণ কর। এই বেদমন্ত্রটি বিবাহ কালে বরবধূর মঙ্গলাচারের নিমিত্ত পুষ্পনির্ম্মিত শুভিকার (টোপরের) উভয়ের মস্তকে অবস্থান করা অর্থ প্রকাশ করিতেছে। এই দুটী বেদমন্ত্র কেবলমাত্র লোকপ্রসিদ্ধ অর্থ অনুবাদ

করিয়া দিতেছে, কিন্তু অজ্ঞাত অর্থের বোধ করিয়া দিতে পারিতেছে না। পূর্ব্বে প্রমাণের লক্ষণ করা হইয়াছে যে, অজ্ঞাত অর্থের বোধ করাইলে তাহাকে প্রমাণ বলে। এই মন্ত্রদ্বারা সামান্যমাত্র লৌকিক রীতি বা লোকাচার উদ্ভাসিত হইয়াছে। তবে আর উক্ত বেদমন্ত্র কিরূপে অজ্ঞাত অর্থের বোধক হইল? অজ্ঞাত অর্থের বোধক না হইলে তাহা লক্ষণের অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে না—লক্ষণের অন্তর্নিবিষ্ট না হইলে তাহাকে বেদের লক্ষণও বলা যাইবে না। অতএব এক্ষণে আপনারা সকলে বিবেচনাপূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখুন বেদের মন্ত্রভাগ কিরূপে সপ্রমাণ হইবে? মন্ত্রভাগকে বাদ দিলে পূর্ব্বে যে বেদের লক্ষণ করা হইয়াছে অর্থাৎ যে মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মক শব্দরাশিকে বেদ বলা হইয়াছে তাহাতে দোষ ঘটে। সুতরাং পূর্ব্বে প্রমাণের যেরূপ লক্ষণ করা হইয়াছিল, এ স্থানে কিছুতেই তাহা খাটিল না।

বেদের মন্ত্রভাগের প্রামাণ্য সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই—"অম্যকুসাত" প্রভৃতি বেদমন্ত্রসকল আশু দুর্ব্বোধ বলিয়া প্রতীত হয় সত্য, কিন্তু নিরুক্তকার মহাত্মা যাস্ক স্বপ্রণীত নিরুক্তগ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত সমুদয় কঠিন ও দুর্জ্ঞেয় মন্ত্র সমুদয়ের অর্থ নির্ব্বাচন করিয়াছেন। তবে যাঁহাদের যাস্কপ্রণীত নিরুক্ত-গ্রন্থে দৃষ্টি নাই, তাঁহাদের পক্ষে এ বেদমন্ত্র কেন, সমুদয় বেদমন্ত্র কঠিন বলিয়া বোধ হইবে। কঠিন বলিয়া বোধ হইলেই মন্ত্রে কোন দোষারোপ করা যাইতে পারে না। বস্তুতঃ আমি মন্ত্র পড়িলাম না, পুস্তক চক্ষে দেখিলাম না—কাহারও মুখে শুনিয়ামাত্র তাহাতে যদি বেদমন্ত্রের অর্থ বোধ না হয়, তবে সে দোষ কাহার? মূর্খ কখনই শাস্ত্রের দোষ দিতে পারে না—কারণ, মূর্খতাবশতঃ শাস্ত্রে দৃষ্টি না থাকিলে শাস্ত্রের অপরাধ কি? তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন—অন্ধ ব্যক্তি স্থাণু (শাখারহিত বৃক্ষ) দেখিতে পায় না, কিন্তু এ দোষ কাহার হইবে? যে ব্যক্তি স্থাণুর অপরাধ দিতে উদ্যত তিনি মূর্খ, তাঁহাকে আর কি বলিব? অন্ধ ব্যক্তির অন্ধত্ব দোষেই স্থাণুদর্শন হইল না, সুতরাং স্থাণুর অপরাধ না ভাবিয়া পুরুষের অপরাধ স্বীকার করাই উচিত।

"অধঃ স্বিদাসীৎ" এই বেদমন্ত্রে সন্দেহ থাকা প্রযুক্ত যাঁহারা, এই মন্ত্রকে সন্দেহদায়ক বলিবেন তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত। কারণ উক্ত বেদমন্ত্র পাঠ

করিলে সন্দেহ বৃদ্ধি হয় না, প্রত্যুত জগৎকারণ পরমপদার্থ পরমেশ্বরের সমধিক গাম্ভীর্য্য প্রকাশ হওয়াতে ঐ মন্ত্রের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বস্তুতঃ জগতে যাহারা গুরুসম্প্রদায় বা শাস্ত্রপরম্পরা বর্জ্জিত তাহারা যাহাতে কিছুতেই বেদমন্ত্রের অর্থবোধ করিতে না পারে—তাহার নিমিত্তই কেবল "অধঃস্বিদাসীৎ" ইত্যাদি বেদমন্ত্রের বচনভঙ্গী দ্বারা মন্ত্রপরম্পরা সমুল্লিখিত হইয়াছে।

"ওষধে! ত্রায়স্ব" ইত্যাদি বেদমন্ত্রে আপাততঃ অচেতন পদার্থ সম্বোধিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অচেতন পদার্থ হইলেও তাহাদের এক একটী অভিমানিদেবতা সচেতন পদার্থরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বেদমন্ত্রে ওষধি, ক্ষুর ও প্রস্তর ইত্যাদির সচেতন অভিমানিদেবতা থাকাতে তাহাদিগকেই সচেতনরূপে সম্বোধন করা হইয়াছে জানিবে। ভগবান্ বাদরায়ণ "অভিমানিব্যপদেশঃ" বেদান্ত দর্শনের এই সূত্রে অচেতনের সচেতনত্ব আরোপ করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত বেদমন্ত্রে রুদ্র এক হইয়াও সহস্র সহস্র বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তাহাতে কোন দোষের আশঙ্কা নাই। কারণ, রুদ্র নিজ মহিমাবলে এক হইয়াও সহস্রমূর্ত্তি স্বীকার করাতে বেদমন্ত্রের কোন স্থানে সামঞ্জস্যের ব্যাঘাত হয় নাই।

"আপ উন্দন্তু" ইত্যাদি বেদমন্ত্রের লোকপ্রসিদ্ধ অর্থ প্রতীত হইয়া থাকে। কিন্তু মন্ত্র পাঠকালে জলাভিমানিদেবতার অর্থবোধ হয় না। বস্তুতঃ জলাভিমানিদেবতার অর্থ বোধ হওয়া একান্ত আবশ্যক। যদি ঐ মন্ত্রে অভিমানিদেবতার অর্থ প্রকাশ হওয়া উচিত হয়, তবে অবশ্যই অজ্ঞাত অর্থের বোধ করান শক্তি ঐ বেদমন্ত্রে নিহিত আছে। তাহা হইলে পূর্ব্বে যে বেদের লক্ষণ করা হইয়াছিল, তাহাও রহিল অথচ মন্ত্রভাগের প্রামাণ্য খণ্ডন করিতে কেহই সক্ষম হইতে পারিলেন না।

ক্রমশঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

আমরা দ্বিতীয় সংখ্যা জাহ্নবীতে হিন্দুশাস্ত্র সকলের যথাসম্ভব আলোচনা করিবার সংকল্প করিয়াছিলাম, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমরা তাহা পারিয়া উঠি নাই। অদ্য আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ভগবদ্গীতা কি গ্রন্থ, কাহার প্রণীত ও কোন্ সময়ে রচিত অনেকে তাহা জানেন না—কিন্তু তাহা জানাইতে আমাদের অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না। কেন না উহা সুপ্রসিদ্ধ মহাভারতের অন্তর্গত। যাঁহারা মহাভারত পাঠ করিয়াছেন, ভীষ্ম পর্ব্বান্তর্গত ভগবদ্গীতাপর্ব্বাধ্যায় পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য ভগবদ্গীতা পাঠ করিয়াছেন; তবে অত্যন্ত দুরূহ বলিয়া সকলে বুঝিতে না পারিয়া থাকিবেন। আমরা যথাসাধ্য সরল ভাষায় উহার মর্ম্ম সাধারণের গোচর করিবার চেষ্টা করিব।

ভগবদ্গীতা অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এরূপ গ্রন্থ পৃথিবীর কোন দেশে নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কর্ম্মের সহিত সন্ন্যাসের অপূর্ব্ব সংযোগ ও নিষ্কাম ধর্ম্মের চমৎকার লক্ষণ ভগবদ্গীতায় যেরূপ ব্যখ্যাত হইয়াছে তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রকে যে বিজ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায় তাহা ভগবদ্গীতা পাঠে বুঝা যায়। ভগবদ্গীতা যথার্থ ভগবদ্বাক্য। উহা পাঠ করিলে ঈশ্বরতত্ত্ব এবং আত্মতত্ত্ব জ্ঞানলাভ হয় প্রকৃত কর্ত্তব্য জ্ঞান জন্মে। বেদের পরেই বা বেদের তুল্য ভগবদ্গীতার প্রতি এ দেশের লোকের শ্রদ্ধা। মহাভারতে উহার উপনিষদ্ নাম দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ ভগবদ্গীতা ধর্ম্মশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের একীকরণ। ঐ সকলের এরূপ চমৎকার একীকরণ আর কুত্রাপি দেখা যায় না আধুনিক বঙ্গীয় বুদ্ধিমানগণ ও ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও ইহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছেন।

ভগবদ্গীতায় আরম্ভ অতি নূতন প্রকারের। কোনও ধর্ম্ম গ্রন্থের এরূপ আরম্ভ দেখা যায় না। সকল ধর্ম্ম গ্রন্থেরই উপদেশের মুখ্য উদ্দেশ্য বিনীত ও শান্ত হওয়া এবং নিবৃত্তিমার্গ অনুসরণ করা। কিন্তু ভগবদ্গীতার উদ্দেশ্য তাহা নহে। ইহার প্রারম্ভ দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। প্রারম্ভ দেখিলে ভগবদ্গীতাকে ধর্ম্ম গ্রন্থ বলা দূরে থাকুক সামান্য নীতি গ্রন্থও বলা যায় না; প্রত্যুত উহা অধর্ম্ম শিক্ষার গ্রন্থ বলিয়াই বোধ হয়। কেন না ভগবদ্গীতার মূল উদ্দেশ্য অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্তি দেওয়া—মানবপ্রাণনাশে নিযুক্ত করা। যুদ্ধ করা ও লোক নাশ করা যে ধর্ম্ম কর্ম্ম ইহা কাহার মনে বিশ্বাস হইবে? কিন্তু আর্য্যঋষি এমনই চমৎকার শক্তিসম্পন্ন যে, অবস্থা বিশেষে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ-হানি করা ধর্ম্ম ও না করা অধর্ম্ম তাহা উত্তমরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

বোধ হয় সকলেই জানেন যে পৈতৃক রাজ্য লইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডব-গণের ভয়ানক বিবাদ হইয়াছিল। ক্রূরমনা দুর্য্যোধন দ্যূতে পারজিত করিয়া পাণ্ডবগণকে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে বাধ্য করেন। পাণ্ডবগণ ঐ প্রতিজ্ঞা অনুসারে অজ্ঞাতবাসানন্তর প্রকাশিত হইয়া, স্বীয় রাজ্য প্রার্থনা করিলে দুর্য্যোধন কহিলেন 'বিনাযুদ্ধে শূচ্যগ্র-ভুলি প্রদান করিব না'। সেই জন্য উভয়পক্ষ যুদ্ধের উদ্যোগ করিয়া কুরু-ক্ষেত্রে শিবির সন্নিবেশ করেন। উভয় পক্ষের সৈন্য একত্রিত হইলে অর্জ্জুন উভয় সৈন্য মধ্যে বহুতর আত্মীয় দেখিয়া এত আত্মীয়ের প্রাণনাশ করিয়া রাজ্যগ্রহণ করা মহাপাপ বিবেচনা করিয়া যুদ্ধ করিব না বলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে বিমুখ দেখিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্য যে সকল উপদেশ দেন তাহাই ভগবদ্গীতা নামে বিখ্যাত। আমরা ভগবদ্গীতার প্রথমাংশটী অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত।।
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধু কামানবস্থিতান্।

কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্‌রণসমুদ্যমে ॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং যত্রতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধে র্যুদ্ধেপ্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥
এবমুক্তো হৃষিকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমং ॥
ভীষ্মদ্রোণ প্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাং।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান ভ্রাতৃন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥
তান্ সমীক্ষ্য সকৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥
দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎত্বক্‌চৈব পরিদহ্যতে ॥
নচ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥
ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাং স্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোপি মধুসূদন ॥
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃকিন্ন মহীকৃতে।

নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব॥
যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জ্জনার্দ্দন॥
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত॥
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥
উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম॥
অহো বত মহৎপাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ং॥
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ॥
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ॥
এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ॥
তন্তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥
কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতং।

অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥
মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে ।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন ।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥
গুরূন্ হত্বা হি মহানুভাবান্ শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে ।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥
ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষামস্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥
কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং সাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং ॥
নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্ যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্ ।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যং ॥
এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তুষ্ণীং বভূব হ ॥

"অনন্তর ধনঞ্জয় এই সমারব্ধ যুদ্ধে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে যথাযোগ্যরূপে অবস্থিত দেখিয়া নিজ শরাসন উত্তোলন পূর্ব্বক বাসুদেবকে কহিলেন, হে অচ্যুত! উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ স্থাপন কর; দুর্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের প্রিয়াচরণ বাসনায় যে সকল ব্যক্তি আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারা যুদ্ধ করিবেন, আমারে কাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে এবং কে যুদ্ধকাম হইয়া অবস্থান করিতেছেন, নিরীক্ষণ করিব। তখন হৃষীকেশ উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ স্থাপন করিয়া কহিলেন, হে পার্থ! ঐ ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি যোদ্ধা ও সমস্ত কৌরবগণ সমবেত হইয়াছেন, অবলোকন কর।"

"ধনঞ্জয় উভয় সেনার মধ্যে তাঁহার পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, শ্বশুর ও মিত্রগণ অবস্থান করিতেছেন অবলোকন করিবামাত্র কারুণ্যরসবশম্বদ ও বিষণ্ণ হইয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে

মধুসূদন! এই সমস্ত আত্মীয়গণ যুদ্ধার্থী হইয়া আগমন করিয়াছেন দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন, কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে; মুখ শুষ্ক হইতেছে; গাণ্ডীব হস্ত হইতে স্রস্ত হইয়া পতিত হইতেছে; সমুদয় ত্বক্ দগ্ধ হইতেছে; আমার আর অবস্থান করিবার সামর্থ্য নাই; চিত্ত যেন উদ্ভ্রান্ত হইতেছে; আমি কেবল দুর্নিমিত্তই নিরীক্ষণ করিতেছি। এই সমস্ত আত্মীয়গণকে নিহত করা হইতেছে না! হে কৃষ্ণ! আমি আর জয়, রাজ্য ও সুখের আকাঙ্ক্ষা করি না। যাঁহাদিগের নিমিত্ত রাজ্য, ভোগ ও সুখের কামনা করিতে হয়, সেই আচার্য্য, পিতা, পুত্র, প্রভৃতি সকলেই এই যুদ্ধে জীবন ও ধন পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়া অবস্থান করিতেছেন; তবে আর আমাদিগের রাজ্য, ধন ও জীবনে প্রয়োজন কি! ইহাঁরা আমাদিগকে বধ করিলেও আমি ইহাঁদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি না; পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক, ত্রৈলক্য লাভ হইলেও আমি ইহাঁদিগকে বধ করিতে বাসনা করি না। ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে নিহত করিলে আমাদিগের কি প্রীতি হইবে? এই আততায়ীদিগকে বিনাশ করিলে আমাদিগকেই পাপভাগী হইতে হইবে; অতএব আমাদিগের বান্ধব ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বধ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নয়। হে মাধব! আত্মীয়গণকে বিনাশ করিয়া আমরা কি সুখী হইব? ইহাদিগের চিত্ত লোভদ্বারা অভিভূত হইয়াছে বলিয়া ইহারাই যেন কুলক্ষয়জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহজনিত পাতক দেখিতেছে না, কিন্তু আমরা কুলক্ষয়ের দোষ দর্শন করিয়াও কি নিমিত্ত এই পাপবুদ্ধি হইতে নিবৃত্ত হইব না! কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হয়; কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে সমস্ত কুল অধর্ম্মে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে; কুল অধর্ম্মপূর্ণ হইতে কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচার দোষে দূষিত হয়; কুলস্ত্রীগণ দূষিত হইলে বর্ণসঙ্কর সমুৎপন্ন হয়; এই বর্ণসঙ্কর কুল ও কুলনাশকদিগকে নিরয়গামী করে; কুল-নাশকদিগের পিতৃগণের পিণ্ড ও উদকক্রিয়া বিলুপ্ত হয়, সুতরাং তাঁহারা পতিত হইয়া থাকেন। কুলনাশক ব্যক্তিদিগের বর্ণসঙ্করের হেতুভূত এই সমস্ত দোষে জাতিধর্ম্ম ও সনাতন কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায়। শুনিয়াছি, কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে মনুষ্যগণকে চিরকাল নরকে বাস করিতে হয়; হা!

কি কষ্ট ! আমরা এই মহাপাপের অনুষ্ঠানে অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়াছি ! আমি প্রতিকার-পরাঙ্মুখ ও শস্ত্রহীন হইলে যদি রাজ্যসুখলোভে স্বজনবিনাশসমুদ্যত শস্ত্রপাণি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আমারে বিনাশ করে, তাহাও আমার কল্যাণকর হইবে। ধনঞ্জয় এইরূপ কহিয়া শর ও শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকাকুলিতচিত্তে রথে উপবেশন করিলেন।”

“তখন ভগবান্ বাসুদেব কৃপাবশম্বদ অশ্রুপূর্ণলোচন, বিষণ্ণবদন অর্জ্জুনকে কহিলেন, অর্জ্জুন ! ঈদৃশ বিষম সময়ে কি নিমিত্ত তোমার অনার্য্যজনোচিত স্বর্গপ্রতিরোধক অকীর্ত্তিকর মোহ উপস্থিত হইল। তুমি ক্লীবতা অবলম্বন করিও না; ইহা তোমার উপযুক্ত নয়। হে পরন্তপ ! অতি তুচ্ছ হৃদয়-দৌর্ব্বল্য দূরীকৃত করিয়া উত্থান কর।

অর্জ্জুন কহিলেন, ভগবন্ ! আমি কি প্রকারে পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত শরজাল দ্বারা প্রতিযুদ্ধ করিব। মহানুভাব গুরুজনদিগকে বধ না করিয়া যদি ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজন করিতে হয় তাহাও শ্রেয়। কিন্তু ইঁহাদিগকে বধ করিলে ইহকালেই রুধিরলিপ্ত অর্থ ও কাম উপভোগ করিতে হইবে। ফলতঃ এই যুদ্ধে জয় ও পরাজয়ের মধ্যে কোন্টীর গৌরব অধিক তাহা বুঝিতে পারিতেছি না; কেন না, যাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া আমরা স্বয়ং জীবিত থাকিতে অভিলাষ করি না, সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণই সম্মুখে উপস্থিত ! কাতরতা ও অবশ্যম্ভাবী কুলক্ষয়জনিত দোষে আমার স্বাভাবিক শৌর্য্যাদি অভিভূত ও আমার চিত্ত ধর্ম্মান্ধ হইয়াছে; এই নিমিত্ত তোমারে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাহা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর হয় বল, আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি; আমারে উপদেশ প্রদান কর। ভূমণ্ডলে অকণ্টক সুসমৃদ্ধ রাজ্য ও সুরগণের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও আমার ইন্দ্রিয়গণ এই শোকে পরিশুষ্ক হইবে। আমি এমন কিছুই দেখিতেছি না, যাহাতে আমার শোকাপনোদন হইতে পারে; অতএব আমি যুদ্ধ করিব না। শত্রুতাপন গুড়াকেশ হৃষীকেশ সম্মুখে এইরূপ বলিয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন।

ক্রমশঃ

নিষ্কামধর্ম্ম।

আমরা ফলের দিকে দৃষ্টি করিব না, সুখ কামনা করিব না, অথচ কার্য্য করিব। আপত্তিকারী একথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিবেন। তিনি বলিবেন যদি ফলকামনাশূন্য হইলাম—যদি সুখের আশা করিলাম না, তবে কার্য্য করিব কেন? কার্য্য করিয়া সুখী হইতে পারি বটে, কিন্তু কার্য্য করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হইবে কেন? ফললাভ—সুখলাভ কামনাই কি কার্য্যে প্রবর্ত্তনার একমাত্র কারণ নহে? সেই মূল কারণের যখন অভাব হইল তখন কার্য্য হইবে কেন? প্রথমতঃ ইচ্ছা, পরে চেষ্টা ও কার্য্য। কিন্তু ইচ্ছা কিসের? ফল লাভের ও সুখ লাভেরই কি ইচ্ছা নহে? ঐ দরিদ্র যে এত পরিশ্রম করিতেছে, উদরপূর্ত্তি ও পরিবার প্রতিপালন জনিত সুখলাভ চেষ্টা যদি উহার অভীষ্ট না হইত, তাহা হইলে কি ও এত পরিশ্রম করিত? আর ঐ যে কেরানি বাবু আফিস হইতে মনিবের নিকট হইতে অযথা গালি খাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাটী আসিতেছেন, যদি উক্তরূপ সুখলাভ বা উক্ত সুখের অভাব জনিত দুঃখ উহাকে ব্যথিত না করিত তাহা হইলে কি আর কল্য ঐ ব্যক্তি পুনর্ব্বার ঐ আফিসে কার্য্য করিতে যাইত? কখনই নহে। অতএব ফলেরদিকে—সুখের দিকে দৃষ্টি না করিয়া কার্য্য করা নিতান্ত অসম্ভব। তবে ক্রীড়ারূপ কার্য্য হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতেও যদি জয় পরাজয় রূপ সুখ দুঃখ না থাকিত, তাহা হইলে তাহাতেও কেহ প্রবৃত্ত হইত না। অতএব নিষ্কামধর্ম্ম আকাশ কুসুমবৎ নিতান্ত অলীক। আমরাও উক্তরূপ লক্ষণাক্রান্ত নিষ্কাম ধর্ম্মকে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া থাকি। আমরা সুখের জন্য সৃষ্ট

না হইলেও সুখ দুঃখ যে আমাদের প্রার্থনীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেননা তাহা না হইলে ঈশ্বরকার্য্য করা হইল কিনা তাহা বুঝিব কি প্রকারে? সুখ দুঃখ জ্ঞানই উহা বুঝিবার একমাত্র উপায়। ঈশ্বরকার্য্য করিলে সুখ ও তাহার বিপরীত কার্য্য করিলে দুঃখ হয়। সুতরাং ঈশ্বরকার্য্য কর্ত্তব্য হইলে সুখ আমাদের কাম্য। কিন্তু আমাদের রুচি অনুসারে সুখের কামনা কর্ত্তব্য নহে। আমি মিষ্টান্ন খাইয়া জানিয়াছি উহা বড় সুখাদ্য ও সুখকর অতএব নিয়ত মিষ্টান্ন খাইয়া সুখী হইবার চেষ্টা করা অন্যায়। কামরিপু চরিতার্থ করিয়া সুখ পাইলাম—ঐ কার্য্য দ্বারাই সুখলাভ করিবার চেষ্টা নিতান্ত অন্যায়। আমাদের বিবেচনা করা উচিত ঈশ্বর যে কার্য্য যে প্রণালীতে যে অবস্থায় সুখকর করিয়াছেন, আমি তাহাই মাত্র করিব। তাহা হইলেই সুখী হইব, আমার আপন রুচিমত করিলে কখনই সুখী হইব না। ঈশ্বরা-ভিমত রূপে কার্য্য করিলেই যখন আমরা সুখী হইব, তখন সুখের স্বতন্ত্র প্রার্থনা করার আবশ্যক কি? যদি ঐরূপ কার্য্য করিয়া সুখী না হই তাহাতেও আমরা দুঃখিত হইব না, কেন না সেরূপ সুখলাভ আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে; অথবা রুচির দোষে আমরা প্রকৃত সুখের আস্বাদ পাই নাই। যাহা সাধ্যা-য়ত্ত নহে তাহার চেষ্টা করা বা তাহা পাইনাই বলিয়া দুঃখিত হওয়ায় কোন ফল নাই, অধিকন্তু তাহা দুঃখ বৃদ্ধি করে মাত্র, সুতরাং তাহা ঈশ্বরের অনভি-প্রেত। আমরা যখন সুখের জন্য কার্য্য করিব তখন বৃথা দুঃখভার বহন করিব কেন? কার্য্য করিলাম সুখের জন্য, ফল হইল দুঃখ? ইহা কি নিতান্ত অন্যায় নহে? সুখলাভে সফল না হইলাম সুখই হইল না, কিন্তু তাহা বলিয়া দুঃখ পাইব কেন? অতএব ফললাভ না হইলেও দুঃখিত হইব না। সুখ তত আমাদের প্রার্থনীয় নয়, যত দুঃখ না পাওয়া প্রার্থনীয়; দুঃখের অভাবই এক প্রকার সুখ। অতএব ফলকামনাশূন্য কার্য্যই আমাদের সুখের হেতু। ফললাভ কামনাতেই আমরা কার্য্য করি বটে, কিন্তু সে কোন ফল? সুখই কি চরম ফল নহে? তাহা যদি হইল, তবে গৌণ ফলশূন্য কার্য্যে আমাদের প্রবৃত্তি হইবে না কেন? যখন প্রমাণ হইল যে, ফল সুখের কারণ নহে, কার্য্যই সুখের কারণ, তখন আমরা সুখ ইচ্ছা করিলে কার্য্য করিব না কেন?

যখন স্পষ্ট বুঝিতেছি কার্য্য না করিলে সুখ হইবে না, তখন যে, কার্য্য আমাদিগকে করিতেই হইবে। বিশেষতঃ যখন কার্য্য করিলেই, মানব সুখী হয়, তখন অন্ততঃ সে সুখের জন্য ও মানব কার্য্য করিবে।

তুমি বলিতে পার, মানব যে কার্য্য করিয়া সুখী হয়, সে কেবল ফল পাইবার আশা আছে বলিয়া। স্বয়মাগত ফলদ্বারা সুখ না হউক কিন্তু কার্য্যের ফলে। সুখ হয় কেবল মাত্র কার্য্য বা কেবল মাত্র ফলদ্বারা সুখ হয় না, কিন্তু যখন কার্য্য ও ফল একত্রিত হয়, তখনই প্রকৃত সুখ হয়। কার্য্যশূন্য ফলদ্বারা যেমন সুখ হয় না, সেইরূপ ফলশূন্য কার্য্য দ্বারাও সুখ হয় না। তবে যে ফলহীন কার্য্য করণ সময়ে সুখ হয় তাহার কারণ ফল লাভের আশা আছে বলিয়া। যদি পূর্ব্বেই জানা যাইত যে কার্য্য সফল হইব না তাহা হইলে কখনই কার্য্য করণ সময়ে সুখ হইত না। অতএব ফলকামনাশূন্য কার্য্য কখনও সুখেরই কারণ হইতে পারে না। একথা তুমি বলিতে পার। কার্য্য ও কার্য্যফল সম্মিলনই যে সুখের কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কার্য্য করিলেই যে তাহার ফল ফলিবে। তবে তুমি যে উদ্দেশে কার্য্য করিতেছ তাহা সকল সময়ে সফল না হইতে পারে বটে, কিন্তু সে দোষ কার্য্যের নহে, সে দোষ হয় তোমার মনের, না হয় তোমার কার্য্যপ্রণালীর। কার্য্য করিলে তাহার ফল ফলিবেই ফলিবে—কার্য্যের অনুরূপ ফল ফলিবে, তোমার ইচ্ছা মত ফল হইবে না। তাহারই জন্য তুমি কি দুঃখিত হইবে? তুমি আম্রবীজ রোপণ করিয়া নারিকেল ফল পাইলে না বলিয়া দুঃখিত হইবে? না অগ্নিদ্বারা গাত্র শীতল হইল না বলিয়া দুঃখিত হইবে? অথবা তজ্জন্য আম্রবীজ ও অগ্নির নিন্দা করিবে? না ঐ সকলে সৃষ্টি কর্ত্তার নিন্দা করিবে? তুমি যদি তোমার উপযোগী সুখমাত্র কামনা করিয়া কার্য্য কর তাহা হইলে তাহা সফল হইবেই হইবে। কেননা তদুপযোগী শক্তি আদি তোমার আছে। আর যদি তুমি নির্দ্দিষ্ট পদার্থ বা পদ পাইবার জন্য কার্য্য কর তাহা সকল সময়ে সফল না হইতে পারে। কেননা তদুপযোগী শক্তি তোমার না থাকিলে তদনুরূপ কার্য্য হইবে না। সুতরাং তাহা হইলে তোমার আম্রবীজ রোপণ করিয়ার নারিকেল পাওয়া কামনা করা হয়—

তাহা ঈশ্বরানভিপ্রেত সুতরাং অসম্ভব। তুমি দরিদ্র সন্তান সামান্য একখানি ঘরে তোমার সুখ হইতে পারে, কিন্তু তুমি রাজার অট্টালিকা প্রার্থনা করিলে তোমার কার্য্যের ফললাভ কি প্রকারে হইবে? তোমার যেরূপ অবস্থা, যেমন শক্তি, যেমন কাল, যেমন দেশ বা সমাজ তদ্রূপ কার্য্য তোমাদ্বারা হইতে পারে। সুতরাং তদ্রূপ কার্য্যের যেরূপ ফল সম্ভব হইতে পারে, তদনুরূপ তোমার প্রার্থনা আবশ্যক। তাহা হইলেই সকল সময়ে তোমার প্রার্থনা পূরণ হইবে ও কার্য্য সফল হইবে—কার্য্য করিলেই ফল পাইবে। যখন জানা গেল, যে কার্য্য করিলেই ফল পাওয়া যাইবে, তখন ফলেরদিকে দৃষ্টি করা আবশ্যক কি? কার্য্য মাত্রের দিকে দৃষ্ট করিলেই যথেষ্ট। যিনি কার্য্য করিয়া ফল পাইলেন না তিনি কখনই আপন অবস্থা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি করেন নাই। বলিতে হইবে, সেরূপ করিয়া যিনি ফল প্রত্যাশী, যিনি অসম্ভব বিষয়ের আশা করেন, ঈশ্বরের অনভিপ্রেত বিষয়ের প্রার্থনা করেন, তিনি অন্যায় কার্য্য করেন তাঁহার সুখ বা ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া কদাপি সম্ভব নহে। যিনি আপন অবস্থা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ফল প্রার্থনা করেন তিনি সকল কার্য্যেরই ফল প্রাপ্ত হয়েন সুতরাং তাঁহার দৃষ্টি ফলের দিকে থাকে না—কার্য্যের দিকেই থাকে। ঐ প্রকারে কৃত কার্য্যের নামই নিষ্কাম ধর্ম্ম।

আর একটী কথা বলার আবশ্যক হইতেছে। প্রতিবাদকারী হয় ত বলিবেন যে, যাহার যেমন অবস্থা প্রভৃতি সে যদি তদনুরূপ ফললাভে সুখী হয়, তবে মানবের উন্নতি হইবে কেন? তাহা হইলে যে যে অবস্থায় আছে চিরদিনই সে সেই অবস্থায় থাকিবে, তাহা হইলে আর মানবে ও পশুতে প্রভেদ থাকিল কৈ? আর যে উন্নতিমার্গ মানবের প্রার্থনীয় তাহা মানব ভোগ করিল কৈ? সভ্য, বিদ্বান ও জ্ঞানী মানবই প্রকৃত মানব পদবাচ্য কিন্তু উক্ত প্রণালীতে কার্য্য করিলে কয় জন মনুষ্য সভ্য, পণ্ডিত ও জ্ঞানী হইতে পারে? বোধ হয় এ প্রণালীতে কেহই প্রকৃত মানব পদবাচ্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ যাহা প্রকৃত সুখের ও দুঃখের কারণ, অবস্থাদির দোষ জনিত তাহার সম্মিলনে সুখ দুঃখ হইবে না ইহার অর্থ কি? অন্ন ভিন্ন ক্ষুধা

নিবারণ হয় না—চেষ্টা করিয়াও অবস্থাদির দোষে আমি অন্ন পাইলাম না, তথাপি আমি ঐ চেষ্টাকে সফল জ্ঞান করিয়া সুখী হইব ? সে দুঃখকে দুঃখবোধ যে করিতেই হইবে। আমরা এই কথা গুলির উত্তর করিয়া প্রবন্ধের শেষ করিব।

কার্য্য করিয়া ফললাভ না হইলে দুঃখ করিলে আমাদের উন্নতি হইবে। এ কথার অর্থ কি ? উন্নতি কি কাঁদিয়া হইবে ? না কার্য্য করিয়া হইবে ? অবশ্য প্রতিবাদকারীকে বলিতে হইবে যে, উন্নতি কার্য্য দ্বারাই হইয়া থাকে, ক্রন্দন দ্বারা হয় না। তাহা যদি হইল তবে না কাঁদিলে উন্নতি হইবে না কেন ? বরং তাহাতে যে অধিকতর উন্নতি হইবে। কেননা আমরা বলিতেছি নিয়ত কর্ত্তব্য কার্য্য কর, কর্ত্তব্য করিয়া অভীপ্সিত ফললাভ না হইলে দুঃখিত হইও না। ইহা দ্বারা ইহাই বলা হইল যে, কার্য্য সফল না হয়, পুনরায় কার্য্য কর। দুঃখী করিলে পরে কার্য্য করিবার ব্যাঘাত জন্মে এবং পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল হইলে কার্য্যের প্রতি এমত অনাস্থা জন্মে যে, তখন আর কার্য্য করিতে প্রবৃত্তিই হয় না। কিন্তু নিষ্ফল হইলে যদি দুঃখ না করা যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ কার্য্যের কোনও ব্যাঘাতই ঘটে না—সমান উৎসাহের সহিত চির-জীবন কার্য্য করা যায়। সুতরাং নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে উন্নতি হয় না যাঁহারা বলেন তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। তবে ইহাদ্বারা অস্বাভাবিক উন্নতির কিছু বাধা পড়ে বটে,—যে উন্নতি দ্বারা অন্যের অবনতি হয়, সাধারণের কষ্ট হয়, সেই রূপ উন্নতির ব্যাঘাত হয় বটে,—পাশ্চাত্য সভ্যতা যেরূপ উন্নতির চেষ্টা করিতেছে সেইরূপ উন্নতির ব্যাঘাত হয় বটে। কিন্তু সে উন্নতি বাস্তবিক উন্নতি নহে। তাহাকেই উন্নতি বলিব—যে উন্নতিদ্বারা সকলেরই সর্ব্ব প্রকারে উন্নতি হইতে পারে অথবা যেরূপ উন্নতি করিলে তদ্বারা পরের বা আপনার বিষয় বিশেষে অবনতি না হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা যেরূপ উন্নতির পরামর্শ দেন, সে সেরূপ উন্নতি নহে। পরস্বাপহরণ করিয়া ধনী হওয়া যেরূপ উন্নতি সে সেই রূপ উন্নতি। আমরা এ বিষয় স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করিব। ফল কথা কার্য্য সফল হইলে উচ্চহাস্ত ও কার্য্যে নিষ্ফল হইলে ক্রন্দন না করিলে প্রকৃত উন্নতির ব্যাঘাত হয় না, বরং অধিক উন্নতিই হয়। তুমি বলিতেছ ক্ষুধা

নিবারণ জন্য অন্ন চেষ্টা করিয়া পাইলাম না অথচ তাহার জন্য দুঃখ করিব না—কিন্তু ক্ষুধা দুঃখ নিবারণ হইবে কি প্রকারে?' আমরা জিজ্ঞাসা করি ক্রন্দন করিলে কি দুঃখ নিবারিত হইবে? তাহা যখন হইবে না, তখন বৃথা ক্রন্দন করিয়া ফল কি? যে সময়ে তুমি ক্রন্দন করিবে, সেই সময়ে পুনরায় অন্নের চেষ্টা কর না? তুমি কেন ভাবনা যে তোমার অবস্থা ও শক্তি প্রভৃতির অনুরূপ চেষ্টা হয় নাই বলিয়াই তুমি ফল পাও নাই, পুনরায় ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান কর, অবশ্য ঈশ্বরাভিপ্রেত ফল পাইবে। যদি কিছুতেই তোমার কার্য্য সফল না হয় কি করিবে? কাঁদিলে ত ফল পাইবে না, যতক্ষণ দেহে জীবন থাকিবে বৈধ চেষ্টা কর—তাহাই মাত্র তোমার ক্ষমতা তদতিরিক্ত আর কিছুই তোমার শক্তি নাই। যদি প্রার্থনানুরূপ কার্য্যকরণোপযোগী শক্তি আদি তোমার না থাকে, তাহা হইলে ক্রন্দন দ্বারা দূরে থাকুক চেষ্টা দ্বারাও ফল লাভ হইবে না, সুতরাং তুমি কাঁদ বা না কাঁদ শক্তি না থাকিলে ফল পাইবে না, উন্নত হইবে না, অন্ন পাইবে না—ঈশ্বর যদি তোমাকে ফল দেন—খাইতে দেন, অবশ্য পাইবে, না দেন পাইবে না। ঈশ্বর দিবেন কি না তাহার পরীক্ষা তোমার কার্য্যের উপর নির্ভর করিতেছে। সুতরাং তোমাকে অনুক্ষণ কার্য্য করিতে হইবে। কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিবে তাহার উত্তর আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে দিব। এ প্রবন্ধ সেজন্য নহে। ইহার উদ্দেশ্য নিষ্কাম ধর্ম্ম। আপনাকে সর্ব্বক্ষম ও আপনার শক্তিকে যথেষ্ট জ্ঞান না করিয়া ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া ন্যায্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া ও ফলের দিকে কিছু মাত্র দৃষ্টি না করিয়া কার্য্য করার নামই নিষ্কাম ধর্ম্ম। কামনা মাত্রই না করিয়া যাহা তাহা করার নাম নিষ্কাম ধর্ম্ম নহে।

অনেকে কিন্তু ভাবেন যে, কামনা মাত্র শূন্য কার্য্যের নামই নিষ্কাম ধর্ম্ম। এই জন্যই তাঁহারা উহা নিতান্ত অসম্ভব মনে করেন। ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। কেননা কামনা ভিন্ন কার্য্য হয় না। সুখ কামনায় কার্য্য না করিলাম কিন্তু ঈশ্বর কার্য্য কামনা করিয়াও ত কার্য্য করিতে হইবে। তাহা হইলেই ত কামনা থাকিল, কার্য্য নিষ্কাম হইল কৈ? বাস্তবিক উহাকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলে না। যে কার্য্যের মূলে আত্মরুচিঅনুযায়ী কামনা—ঈশ্বরাভিপ্রায় বিরুদ্ধ কামনা

নাই, তাহাকেই নিষ্কাম ধর্ম্ম বলে। ঈশ্বরাভিপ্রায় সাধন ও তদ্দ্বারা আপনার সুখ সম্পাদন যে কার্য্যের উদ্দেশ্য তাহারই নাম নিষ্কামধর্ম্ম। নিষ্কাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে মানবের দুঃখ থাকে না। উক্ত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সুখ কার্য্যদ্বারা পরিমিত হয়, ইচ্ছা বা দুরাকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিমিত হয় না। নিষ্কাম ধর্ম্মাবলম্বীগণ মৃত্যুকে ভয় করেন না, কোনও প্রকার শোকে বা দুঃখে ব্যথিত হয়েন না, তাঁহারা নিয়ত প্রাণপণে যথা শক্তি যথা জ্ঞান কার্য্য করিয়া সুখী হয়েন, জগতের হিতকারী হয়েন ও ঈশ্বরের অভিপ্রায় সাধন করেন। দুঃখ ক্ষণমাত্রও তাঁহাদিগকে ব্যথিত করিতে পারে না, নিয়ত তাঁহাদের মনে আনন্দ বিরাজিত থাকে। তাঁহারাই প্রকৃত মানব পদবাচ্য অথবা মানবকুলে দেব-পদবাচ্য। আর্য্যঋষি এই ধর্ম্মের আবিষ্কর্ত্তা, ভগবান বাসুদেব এই ধর্ম্মের বক্তা, ভারতবর্ষ এই ধর্ম্মের নিবাস ভূমি এবং সংস্কৃত ভাষায় এই ধর্ম্ম বাক্য লিখিত, এই জন্যই—কেবল মাত্র এই কারণেই আর্য্য ঋষি জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, বাসুদেব পূর্ণ ঈশ্বরাবতার, ভারতবর্ষ স্বর্ণভূমি ও সংস্কৃত ভাষা দেব ভাষা। জগতে যদি সত্যধর্ম্ম থাকে তবে এই নিষ্কাম ধর্ম্মই সত্য ও তজ্জন্যই হিন্দুধর্ম্ম সত্য। আমরা নিষ্কাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে আর অধিক বলিব না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আলোচনায় সমস্ত বলিব ইচ্ছা করিতেছি।

পাতঞ্জল দর্শন।

ও

যোগ পরিশিষ্ট। *

ভারতবর্ষে দর্শনশাস্ত্রের বিলক্ষণ চর্চ্চা হইয়াছিল। অধিক কি সেই প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণগণ যেরূপ দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া ছিলে আজিও পৃথিবীর কোনও দেশে সেরূপ হয় নাই। আজি পাশ্চাত্যভূমি সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত—প্রাচীন ভারত অপেক্ষাও উন্নত, কিন্তু দর্শন বিষয়ে তাঁহারা আজিও ভারতীয় ঋষিদিগের অনেক নিম্নে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। আজিও তাঁহারা দর্শনশাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলিয়া সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেন না। মিল, কম্‌টি প্রভৃতি কএক জন পণ্ডিত উহাকে বিজ্ঞানের মধ্যে পরিগণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু এখনও তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে স্থান পায় নাই আজিও অনেকের মতে দর্শনশাস্ত্র ভিত্তিশূন্য বাক্‌জাল মাত্র—বৃথা তর্ক মাত্র। কিন্তু ঋষিগণ উহাকেই শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান মনে করিতেন। আর্য্য ঋষিগণ দর্শনশাস্ত্র সকল এরূপে আলোচনা করিয়াছিলেন যে, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। দর্শনশাস্ত্রগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে জানা যায় যে ঋষিরা কিরূপ মস্তিষ্ক চালনা করিয়াছিলেন—কেবলমাত্র উহাই তাঁহাদিগকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

এ দেশে ১৬ খানি প্রধান দর্শনশাস্ত্র প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে

---

* শ্রীকালীবর বেদান্ত বাগীশ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও অনুবাদিত, মূল্য ২ টাকা।

গ্রন্থখানি অতি প্রাচীন। আলোচ্য পাতঞ্জলদর্শন তাহারই অন্তর্গত একখানি। এ খানিতে যোগ প্রকরণ অতি চমৎকাররূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে যোগের নাম মাত্রও শিক্ষিত সমাজে স্থান পাইত না, প্রত্যুত: উহা হাস্যের কারণই হইত। কিন্তু এক্ষণে অলকট প্রভৃতি সাহেবের কল্যাণে ও অন্য নানাবিধ কারণে ভারতীয় নব্য সম্প্রদায়ের আর সেরূপ অবস্থা নাই। এখন অনেকে যোগ বিশ্বাস করেন এবং যাঁহারা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না তাঁহারাও হাঁসিয়া উড়াইয়া দেন না। উহা যে গবেষণার বিষয়, অন্ততঃ এ কথাও তাঁহারা স্বীকার করেন। এই সময়ে বেদান্তবাগীশ মহাশয় পাতঞ্জলদর্শন প্রকাশ করিয়া অতি উত্তম কার্য্য করিয়াছেন। এইখানি অবলম্বন করিয়া অনেকে যোগ বিষয়ে অনেকে শিক্ষা করিতে পারিবেন, যাঁহাদের যোগের প্রতি বিশ্বাস নাই তাঁহারা অন্ততঃ ইহা বুঝিতে পারিবেন যে, যোগক্রিয়া একবারে অসম্ভব নহে। গ্রন্থখানি যেরূপ সরল প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে সকলেই ইহা অল্পায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

এই গ্রন্থের প্রথমে একটী অবতরণিকা ও শেষে একটী পরিশিষ্ট আছে। যোগ ব্যাপার যে অসম্ভব নহে প্রত্যুত সত্য হইবার অনেক সম্ভব, তাহাই ইহাতে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আমরা বোধ করি গ্রন্থকার ইহাতে সম্পূর্ণ সকল প্রযত্ন হইয়াছেন। আমরা প্রথমতঃ ইহার অবতরণিকা হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকদিগকে প্রদর্শন করিতেছি।

অবতরণিকার একস্থানে লিখিত আছে—

"যোগের সুফল ও অলৌকিক ক্ষমতা আছে শুনিয়া হয় ত অনেকেই হাঁসিবেন। অনেকেই হয় ত বুদ্ধিমোহবশতঃ যোগের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। না পারেন, না পারিবেন, তজ্জন্য আমরা ব্যথিত বা ঈর্ষ্যান্বিত নহি। * * * যে কখন অলৌকিক দৃশ্য দেখে নাই, কি প্রকারে সে অলৌকিক অস্তিত্বে প্রত্যয় উৎপাদন করিবে? যাহাই হউক, ফল কথা এই যে, আমরা যখন যোগী নহি—যোগ করি নাই—যোগী দেখিও নাই,—তখন হঠকারিতামাত্র অবলম্বন করিয়া যোগফলকে সম্পূর্ণ মিথ্যা

বলিবার চেষ্টা করিলে আমাদিগকে উডুম্বর-মশকের ন্যায় নিন্দনীয় হইতে হয় সন্দেহ নাই। যোগফলের প্রতি মিথ্যাদৃষ্টি প্রয়োগ না করিয়া তাহার অবশ্য কোন সত্য ফল আছে, এরূপ নিশ্চয় করিয়া তদ্বোধার্থ যত্নবান্ হওয়াই কর্ত্তব্য।”

“যোগীরা সর্ব্বজ্ঞ হন, দীর্ঘজীবী হন, অনাহারে জীবন ধারণ করিতে পারেন, শ্বাসরোধেও তাঁহাদের জীবন রক্ষা হয়,—এ সকল কথা নিতান্ত অবিশ্বাস্য নহে। প্রকৃতি-শরীরে বা জীব-জগতে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যাহা দেখিয়া, যোগীগণের উল্লিখিত সামর্থ্য থাকার প্রতি অন্ততঃ আংশিক বিশ্বাস উৎপাদন করা যাইতে পারে। বুদ্ধিমান্ মনুষ্য যদি তন্মনা হইয়া কিছু কাল ধরিয়া প্রকৃতি পুস্তক পাঠ করে, স্বভাবতত্ত্ব অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে শীঘ্রই যোগফলের প্রতি বিশ্বস্ত হইতে পারে। মনুষ্য এ যাবৎ যে কিছু শিখিয়াছে, আমাদের বিশ্বাস এই যে, তাহার একটীও মনুষ্যগুরুর নিকট শিখে নাই। সমস্তই প্রকৃতি-গুরুর নিকট শিখিয়াছে। * * * “প্রকৃতিই যোগীদিগের গুরু, এবং প্রকৃতিই যোগীদিগের বর্ণিত যোগফল বুঝিবার দৃষ্টান্ত স্থল। এই দুই কথা এক্ষণে বিশদ করিয়া বুঝান আবশ্যক হইতেছে। প্রথম যোগী কোন্ স্বভাবের নিকট, বা কোন্ প্রকৃতির নিকট, কি কি শিক্ষা করিয়াছিলেন?”

এই বলিয়া প্রাকৃতিক কোন পদার্থের নিকট যোগীরা কি শিখিয়াছেন তাহা দেখাইতেছেন।

“প্রথম সার্ব্বজ্ঞ্য-শিক্ষা।—মানুষ সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে, এই জ্ঞান তাঁহারা প্রথমে সূর্য্যকান্তমণির নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যথা—

“যথার্করশ্মিসংযোগাদর্ককান্তোহুতাশনম্।
আবিঃকরোতি নৈকঃসন্ দৃষ্টান্তঃ স তু যোগিনঃ॥”

“সূর্য্যরশ্মিসংযোগে সূর্য্যকান্তমণি বহ্নি আবিষ্কার করে, ইহা দেখিয়া যোগীগণ সার্ব্বজ্ঞ বিজ্ঞান শিক্ষা করিবেন।”

“কি আশ্চর্য্য উপদেশ! এ উপদেশের কি গভীর মর্ম্ম নহে? ঐ অত্যল্প কথার ভিতর কি শত সহস্র বিজ্ঞান লুকায়িত নাই? চিন্তা করিয়া দেখিলে

কি অঙ্গে পুলকোদ্গম হয় না? মস্তক কি বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয় না? ঘুড়ীর লকে বিদ্যুতের আবেশ দেখিয়া তাড়িত বিজ্ঞান Telegraph শিক্ষা অপেক্ষা, বাষ্পবলে রন্ধন-স্থালীর মুখশরাব উৎপতিত হইতে দেখিয়া ষ্টিম্‌ওয়ার্কের সৃষ্টি করা অপেক্ষা, ফল-পতন-দৃষ্টে পার্থিব আকর্ষণ (Gravitation) জ্ঞাত হওয়া অপেক্ষা, আতস্ পাথরের দ্বারা সূর্য্যকিরণ কেন্দ্রীকৃত বা পুঞ্জীকৃত করিয়া তদ্দ্বারা তৃণপুঞ্জ দগ্ধ করিতে দেখিয়া, ইতঃস্ততোবিক্ষিপ্ত বা সহস্রমুখী বুদ্ধিবৃত্তিকে এককেন্দ্রক করিয়া তদ্দ্বারা সূক্ষ্মবিজ্ঞান, ব্যবহিত বিজ্ঞান ও অতীতানাগতবিজ্ঞান আবিষ্কার করা কি অত্যধিক ক্ষমতার বিষয় নহে? সমধিক বিস্ময়াবহ নহে? সম্পূর্ণ নূতন নহে? বিস্তৃত, তরল বা বিরলাবয়ব সূর্য্যকিরণ,—যাহাকে আমরা প্রভা বা আলোক বলি,—সে কাহাকেও দগ্ধ করে না। প্রত্যুত তাহাতে উত্তাপ নাই বলিয়াই প্রতীতি হয়। কিন্তু কৌশলক্রমে, বা উপায়ের বলে, সেই তরলায়িত আলোক রাশিকে যদি কেন্দ্রীকৃত করা যায়, ঘন বা পুঞ্জীকৃত করা যায়, তাহা হইলে দেখিবে যে, সেই সূর্য্যালোক সমূহের পুঞ্জন-স্থানে অর্থাৎ কেন্দ্র স্থানে প্রলয়াগ্নি সদৃশ দাহিকাশক্তি আবির্ভূত হইয়াছে।" * * *

এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, ইন্দ্রিয়পথে বহির্গত, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত ও বহুস্থানে ব্যাপৃত বুদ্ধিতত্ত্বকে যদি প্রযত্নের দ্বারা, পথনিরোধের দ্বারা, একত্রিত করা যায়, ক্রমসঙ্কোচ প্রণালীতে পুঞ্জীকৃত বা কেন্দ্রীকৃত করা যায়; তাহা হইলে সেই পুঞ্জীকৃত বা কেন্দ্রীকৃত বুদ্ধিতত্ত্বের অগ্রস্থিত যে কোন বস্তু—সমস্তই তাহার বিষয় বা প্রকাশ্য হইবে। যে সকল বিষয় আমরা সহজে বুঝিতে পারি না, সে সকল বিষয় বুদ্ধ্যারোহ করিবার জন্য আমরা একাগ্রচিত্ত বা তন্মনা হই। বহুক্ষণ একাগ্র হইয়া চিন্তা করিলেই তাহা আমরা বুঝিতে পারি। কেন পারি?—না দিগ্‌ দিগন্ত প্রসারিণী বুদ্ধিবৃত্তি তখন একাগ্রতার দ্বারা, প্রযত্নবিশেষের দ্বারা, পুঞ্জীকৃত হয়। পুঞ্জীকৃত হইলেই তাহার ক্ষমতা অধিক হয়।"

"দীর্ঘ জীবন, অনাহার ও কুম্ভক শিক্ষা।—যোগিগণ প্রকৃতিপুস্তক পাঠ করিতে করিতে আরও দেখিলেন যে, যদি আমরা উপায়ক্রমে ভেক, কচ্ছপ

ও সর্পাদি জাতির স্বভাব অনুকরণ করিতে পারি ত অবশ্যই দীর্ঘজীবী হইতে পারিব, এবং দীর্ঘকাল অনাহারে থাকিলেও আমাদের দেহ বিয়োগ হইবে না।"

"নাশ্নন্তি দর্দ্দুরাঃ শীতে ফণিনঃ পবনাশনাঃ।
কূর্ম্মশ্চ স্বাগোপ্তারো দৃষ্টান্তা যোগিনো মতাঃ॥"

"ঐ সকল জীব শীতকালে মৃত্তিকাবিবর ও গিরি গহ্বরাদি আশ্রয় করিয়া অনাহারে জড়বৎ কালযাপন করে। বিশেষতঃ শীতকালে ভেক জাতির দেহ প্রায় মৃত্তিকাতুল্য হইয়া যায়। তৎকালে তাহাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কি অন্য কোনরূপ চেতনকার্য্য বর্ত্তমান থাকে না। পরন্তু বর্ষার প্রারম্ভ হইলে পুনশ্চ তাহারা নবজীবন প্রাপ্ত হয়। তখন তাহারা আহার বিহারাদি দৈবিক কার্য্য করিতে থাকে। যে যোগী কৌশলক্রমে ঐ সকল জীবের স্বভাব অনুকরণ বা অভ্যস্ত করিতে পারেন, তিনি সহজেই সমাহিত হইতে পারেন; এবং অনাহারেও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারেন।"

"যোগীরা যে প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করেন, তাহা তাঁহারা উল্লিখিত প্রাণিসমূহের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে সকল প্রাণীর শ্বাসসংখ্যা অল্প ও অল্পায়ত;—সেই সকল প্রাণীরাই দীর্ঘজীবী। আর যাহাদের শ্বাসসংখ্যা কিছু অধিক ও দীর্ঘ;—তাহারা অল্পায়ু অর্থাৎ তাহারা অল্প কাল জীবিত থাকে। ইহা দেখিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন যে, মনুষ্য যদি আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসকে অল্পায়ত ও অল্পসংখ্যক করিতে পারে ত অবশ্যই তাহারা আপন আপন নির্দ্দিষ্ট জীবন-কাল অপেক্ষা অধিক কাল জীবিত থাকিতে পারে।"

এই স্থানে কতকগুলি প্রাণীর শ্বাস সংখ্যা ও পরমায়ুর পরিমাণের একটী তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। পরে বলিতেছেন—

"আরও দেখা যায় যে, যে সকল জীবের শ্বাসক্রিয়া ধীরে ধীরে সম্পন্ন

হয়,—তাহাদের দৈহিক সন্তাপ অতি অল্প। যাহারা ঘনঘন নিঃশ্বাস ছাড়ে,—তাহাদের দৈহিক উষ্ণতা কিছু অধিক। জীব সকল আত্ম-শরীরের তাপ-পরিমাণের অল্পাধিক্য অনুসারে ক্ষুৎপিপাসাকুল হইয়া থাকে। শিশুগণ ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস নির্বাহ করে বলিয়া তাহাদের দেহের তাপপরিমাণ কিছু অধিক। তজ্জন্যই তাহারা ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করিতে অক্ষম। যুবকদিগের শ্বাস সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প, তন্নিবন্ধন তাহাদের দৈহিক তাপও অল্প,—সুতরাং তাঁহারা কিছু অধিক সহিষ্ণু। পক্ষিজাতির দৈহিক সন্তাপ প্রায় ১০৬ হইতে ১০৭। সেই জন্যই তাহারা দুই তিন দিনের অধিক ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করিয়া জীবিত থাকিতে পারে না। সর্পজাতির দেহ পক্ষিজাতির দেহের ন্যায় সন্তপ্ত নহে। সেই কারণে তাহাদের নিকট অল্পপরিমিত (Oxygen) অম্লজান বায়ুই যথেষ্ট। এবং সেই কারণেই তাহারা তিন চারি মাস আহার না করিয়াও থাকিতে পারে। প্রাণায়ামপরায়ণ যোগীদিগেরও দৈহিক সন্তাপ অল্প,—সুতরাং তাঁহারাও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহিষ্ণু। এমন কি তাঁহারা সর্পজাতির ন্যায় দীর্ঘকাল পান ভোজন ও নির্ম্মলবায়ু সেবন না করিয়াও জীবিত ও বিনা উদ্বেগে গিরিবিবরে ধ্যাননিমীলিতনেত্রে থাকিতে পারেন।"

"শ্বাসপ্রশ্বাসের অল্পাধিক্য শরীরের উপর যে কত কার্য্য করে, কত ক্ষমতা বিস্তার করে, এক জন বিলাতী ডাক্তারের চিকিৎসা বৃত্তান্ত শুনিলে তাহার যৎকিঞ্চিৎ মর্ম্ম বোধগম্য হইতে পারে। ইয়ুরোপবাসী জনৈক খ্যাতনামা ডাক্তার, শস্ত্রচিকিৎসাকালে তিনি রোগীকে ক্লোরোফরম্ প্রভৃতি চৈতন্যহারক ঔষধ ব্যবহার না করাইয়া, অন্য একটী নূতন উপায় অবলম্বন করিতে বলেন। অর্থাৎ রোগীকে তিনি ঘন ঘন নিশ্বাস তুলিতে ও ফেলিতে বলেন। আরও বলেন, যেন প্রতি মিনিটে শ্বাসপ্রশ্বাসের সংখ্যা এক শতের (১০০) ন্যূন না হয়। রোগী দক্ষিণপার্শ্বে শয়িত হইলে চিকিৎসক তাহার মুখ বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করিয়া দেন, এবং নিকটে কোনপ্রকার বিকট শব্দ কি অন্যকোন উপদ্রব হইতে দেন না। ৭। ৮ মিনিট অতীত হইতে না হইতেই ঐ প্রক্রিয়ার প্রভাবে তাহার স্নায়বিক উত্তেজনা উপশান্ত ও চৈতন্যলোপ হয়।

* * * ডাক্তার হিউসন্ বলেন যে, এই প্রক্রিয়া দ্বারা চৈতন্যহরণ করিলে কোন প্রকার বিপদের সম্ভাবনা নাই।"

তাহার পরে অনশনে থাকিয়াও যোগীগণের প্রাণক্ষয় হয় না কেন তাহার কারণ দেখাইতে গিয়া বলিতেছেন, যে দীর্ঘ নিদ্রা, স্বল্পাহার ও প্রগাঢ় চিন্তার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। এই বলিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে ৫।৭ মাস নিদ্রাবস্থায় থাকিয়া কিছু মাত্র আহার না করিয়াও মানব মরে নাই এবং যে অধিক চিন্তারত সে অতি অল্পাহার করে। ইহা দ্বারাই বুঝা যাইতেছে, যে, আহার না করিলেই যে মানুষ মরিয়া যায় তাহা নহে। তাহার পর বলিতেছেন—

"মনুষ্যের দৈনন্দিন শ্রমাদির দ্বারা যে দৈহিক উপাদানের ক্ষয় হয়—দৈনন্দিন আহারাদির দ্বারা তাহা আবার পরিপূরিত হয়। যাহাদের শ্রমাদি অল্প—তাহারা অল্পভোজী। আর যাহারা বহুপরিশ্রমী—তাহারা বহুভোজী। এক জন কৃষকের আহারের সহিত একজন শ্রমবিমুখ ভদ্রলোকের আহার তুলিত করিয়া দেখিলেই উক্ত সিদ্ধান্ত সপ্রাণ হইতে পারে। অতএব শ্রমাদির অল্পতাই যখন স্বল্পক্ষয় ও স্বল্পাহারের কারণ, তখন ভাবিয়া দেখ, যোগীর দৈহিক ক্ষয়ের ও তৎপূরণার্থ আহারের কি পরিমাণ কারণ সন্নিহিত আছে। প্রায় সর্ব্বক্ষণই তাঁহারা নিশ্চলভাবে নিদ্রাভিভূতের ন্যায় উপবিষ্ট থাকেন। সর্ব্বদাই তাঁহাদের অভ্যন্তর সাত্বিক আনন্দে পূর্ণ থাকে। সুতরাং তাঁহাদের দৈহিকক্রিয়াও উপশান্ত বা স্তম্ভিত থাকে। এরূপ স্থলে তাঁহাদের অনাহারজনিত দৈহিকক্ষয়ের সম্ভাবনা কি? প্রথম প্রথম তাঁহাদের অল্পমাত্র ভোজনের আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু যখন তাঁহাদের সমস্ত দৈহিকক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে উপশান্ত বা স্তম্ভিত হয়, তখন আর তাঁহাদের আহারের প্রয়োজন হয় না। শরীর নিশ্চল, চিত্ত আনন্দপূর্ণ ও রসবাহী থাকায় তাঁহাদের দৈহিকক্ষয় হয় না, সুতরাং তৎপূরণার্থ আহারেরও প্রয়োজন হয় না। এমন কি, সে অবস্থায় তাঁহাদের শ্বাসরোধজনিত মৃত্যুও হয় না।"

এই প্রকারে তিনি দেখাইয়াছেন যে যোগ ক্রিয়া অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে, প্রত্যুত প্রকৃতি হইতেই উহার শিক্ষা এবং প্রকৃতি দ্বারাই উহার প্রমাণ

হইতে পারে। তবে কথা এই যে, সুনিয়মে যোগ সাধন করিতে না পারিলে রোগ জন্মে। কিন্তু তাহা বলিয়া ভয় পাইয়া যোগে বিরক্ত হওয়া যাইতে পারে না। কেন না ভোগ কার্য্যের অনিয়মেও ত রোগ হয়। কিন্তু রোগ ভয়ে যেমন লোকে ভোগ ত্যাগ করে না সেইরূপ যোগও ত্যাগ করিবে না সুনিয়মে করিবে।

অবতরণিকা টুকু অতি উত্তম হইয়াছে। ইহার মধ্যে অনেক সারগর্ভ কথা ও অনেক বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে। সকলেরই মনোযোগ সহকারে এই অবতরণিকা অংশ পাঠ করা উচিত।

ক্রমশঃ

বেদরহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মক বেদভাগের মধ্যে মন্ত্রাত্মক বেদভাগের প্রামাণ্য স্থিরীকৃত হইয়াছে। ভগবান্ জৈমিনি মুনি মীমাংসা-দর্শনে মন্ত্রাধিকরণ প্রকরণে প্রত্যেক বেদমন্ত্রের যে এক একটী করিয়া অর্থ অবশ্য নিহিত থাকে—সেই বেদমন্ত্রের বিবক্ষিত অর্থ যে অন্য কোন বেদমন্ত্রের সহিত সংসৃষ্ট হয় না—তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিয়া সূত্র করিয়াছেন।

কিন্তু বিস্তার ভয়ে ঐ সমস্ত সূত্র উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের অর্থ উল্লিখিত হইল না।

যাহা হউক, মন্ত্রভাগের প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও ব্রাহ্মণ ভাগের প্রামাণ্য স্থির করা বড় কঠিন ও অনুপযুক্ত। কারণ, ব্রাহ্মণ দুই প্রকার, বিধি আর অর্থবাদ। আপস্তম্ব বলিয়াছেন—(১) কর্ম্মপ্রেরণা, অর্থাৎ যেরূপে কর্ম্ম করিতে হয়, তাহার নাম ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের যে অবশিষ্ট ভাগ, তাহার নাম অর্থবাদ। ঐ বিধি আবার দুই প্রকার, (২) যে বস্তু প্রবৃত্ত নহে তাহার প্রবৃত্ত করান, এবং যে বস্তু জ্ঞাত নহে তাহার বোধ করান। অপ্রবৃত্ত প্রবর্ত্তক বিধি যথা—(৩) দীক্ষণীয়া ইষ্টিতে (যাগে) যে পুরোডাশের (যজ্ঞীয় দ্রব্যের) অগ্নি এবং বিষ্ণু দেবতা, তাহা নির্বপন (পরিষ্কার) করিতে হইবে। বেদের এই সমস্ত কর্ম্মকাণ্ড স্থিত বিধিবাক্য সকল যে বিষয় অপ্রবৃত্ত ছিল, তাহারই প্রবর্ত্তনা করিয়াছে।

অজ্ঞাতবস্তুর জ্ঞাপক বিধি, যথা—(৪) এই যে জগৎ প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান হইতেছে, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ কেবল এক আত্মরূপে বিদ্যমান ছিল। বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা ব্রহ্মকাণ্ডস্থিত বিধি সকল অজ্ঞাত বস্তু আত্মার বোধ করাইয়া দিয়াছে।

তন্মধ্যে বেদের কর্ম্মকাণ্ডস্থিত কতকগুলিন এরূপ বিধি আছে যে, তৎসমুদয় বিধির কিছুতেই প্রামাণ্য হইতে পারে না। যথা—(৫) অরণ্যজাত তিলদ্বারা অথবা অরণ্যজাত গোধূম দ্বারা হোম করিবে। এই বিধি বাক্যে যে দ্রব্য অপ্রবৃত্ত—অথবা প্রবৃত্তির অযোগ্য—সেই সমস্ত দ্রব্যের প্রবর্ত্তনা করিয়া ঐ বেদের ব্রাহ্মণভাগের সম্যক্‌রূপে অনুভব হয় না—অনুভবের সাধন থাকে না।

ঐ সকল বিধিবাক্য যে অযোগ্য—উহাদের যে কোন যোগ্যতা নাই

---

(১) "কর্ম্মনোদনা ব্রাহ্মণানি।"

(২) "অপ্রবৃত্ত প্রবর্ত্তনমজ্ঞাত জ্ঞাপনম্।"

(৩) "আগ্নাবৈষ্ণবং পুরোডাশং নির্বপতি দীক্ষণীয়ায়াম্।"

(৪) "আত্মা বা ইদমেকমেবাগ্র আসীৎ।"

(৫) "জর্ত্তিলযবাগ্বা বা জুহুয়াৎ গবীধুকযবাগ্বাবা।"

তাহাও ঐ মন্ত্রের শেষে কথিত হইয়াছে। আর এক বেদমন্ত্রে আছে—(১) অরণ্যজাত তিলদ্বারা কিম্বা অরণ্যজাত গোধূমদ্বারা হোম করিবে না। ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ করা হইল যে, অরণ্যজাত তিল এবং অরণ্যজাত গোধূম—এই আহুতিদ্রব্যের সর্ব্বদা নিষেধ করা আবশ্যক। সুতরাং অরণ্য-জাত তিলগোধূমাদি বিধিবাক্যের অন্য বেদবচন দ্বারা বাধ থাকা প্রযুক্ত কোনরূপেই প্রামাণ্য হইতে পারে না।

কেবল এই স্থানে নহে; ঐতরেয় এবং তৈত্তিরীয় শাখায় ব্রাহ্মণভাগে অনেক স্থানে অনেক বিধি নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। যথা—(২) সেই সেই বস্তু আদরণীয় নহে—এবং কিছুতেই সেই সেই বস্তুর অনুষ্ঠান করা উচিত নহে। বস্তুতঃ এই সমস্ত বাক্যদ্বারা অনেক বিধির নিষেধ করা হইয়াছে।

অপিচ ঐতরেয় শাখার ব্রাহ্মণভাগে অনেক বিধিবাক্যের নিষেধ ও নিন্দা করা হইয়াছে। যথা—(৩) সূর্য্যোদয় না হইলে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অনেক যজ্ঞের হোম করা উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ রূপ উল্লেখ করিয়া বার-ম্বার নিন্দা করা হইয়াছে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে হোম করিবার কথা বলিয়া কেবল যে, নিষেধ পক্ষ সমর্থন করা হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তৈত্তিরীয়গণ বলিয়া থাকেন—(৪) সূর্য্যোদয় না হইলে প্রাতঃকালে হোম করিবেক—সূর্য্যোদয় হইলে প্রাতঃকালে হোম করিবেক—এই উভয় কার্য্যেরই অগ্নি দেবতা জানিবে। এই একবার হোম করার বিধি দেওয় হইল, আবার পরক্ষণে ঐ তৈত্তিরীয়গণ সূর্য্যোদয় হইলে হোম করার দোষশ্রুতি উল্লেখ করিলেন। যথা—(৫)যেরূপ কোন গৃহাগত অতিথি পলাইলে পশু সকল

(১) "অনাহুতিবৈ জর্ত্তিলাশ্চ গবীধুকাশ্চ।"

(২) তত্তন্নাদৃত্যং তত্তথা ন কার্য্যম্।"

(৩) "তস্মাদুদিতে হোতব্যম্।"

(৪) "যদনুদিতে সূর্য্যে প্রাত র্জুহুয়াদুভয়মেবাগ্নেয়ং স্যাৎ। উদিতে সূর্য্যে প্রাত র্জুহোতি।"

(৫) "যদুদিতে সূর্য্যে প্রাতর্জুহুয়াদ্ যথাতিথয়ে প্রদ্রুতায় পশূন্ পায়াবসথায়াহার্য্যং হিস্তর তাদৃগব তাদিতি।"

হরণ এবং প্রাতঃসবের জন্য আহার্য্য বস্তু হরণ করিয়া থাকে; সূর্য্যোদয় হইলে হোম করিলেও তদ্রূপ তাহার বস্তু সকল অপহৃত হয়। আর এক স্থানে আছে—(১) যে ব্যক্তি ষোড়শী (যজ্ঞীয় দ্রব্য) করে, অতিরাত্রি তাহাকে গ্রহণ করিবেক। আবার অন্য স্থানে আছে—(২) অতিরাত্রে যে ব্যক্তি ষোড়শী করিবে তাহাকে গ্রহণ করিবে না। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, পূর্ব্বে ষোড়শী গ্রহণ করার বিধি পরমন্ত্রের নিষেধ বাক্য দ্বারা বাধিত হইল। আর জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে দেখা যাইতেছে যে, যজ্ঞানুষ্ঠানের পর কখনই স্বর্গাদি ফলের উপলব্ধি হয় না—কিন্তু তুমি ভোজন কর, তখনই—তাহার পরক্ষণেই—তোমার তৃপ্তির উপলব্ধি হইবে—অতএব বেদের কর্ম্মকাণ্ডস্থিত যে সকল বিধি আছে, কিছুতেই তাহাদের প্রামাণ্য হইতে পারে না।

যে বিধি অজ্ঞাত বস্তু বোধ করাইয়া দেয়—বেদের জ্ঞানকাণ্ড স্থিত অথবা ব্রহ্মকাণ্ডস্থিত ব্রহ্মবিধিতেও পরস্পরের বিরোধ থাকা প্রযুক্ত কিছুতেই ব্রহ্মবিধির প্রামাণ্য হয় না। ঐতরেয় শাখাধ্যায়ীরা পাঠ করিয়া থাকেন—(৩) এই যে জগৎ প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান হইতেছে, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ কেবল একমাত্র আত্মরূপে বর্ত্তমান ছিল। তৈত্তিরীয়েরা পাঠ করিয়া থাকেন—(৪) সৃষ্টির পূর্ব্বে এই দৃশ্যমান বিশ্ব ছবি অসৎরূপে (নামরূপশূন্য হইয়া) বিদ্যমান ছিল। বস্তুতঃ ঐতরেয় শাখা এবং তৈত্তিরীয় শাখাতে ব্রহ্মবিধির পরস্পরের এইরূপে বিরোধ থাকাতে কিছুতেই প্রামাণ্য হয় না। অতএব বেদে যে সমস্ত বিধিবাক্য আছে, সেই যাবতীয় বিধিভাগের কোনরূপে প্রামাণ্য সংস্থাপন করিতে পারা যায় না।

এইরূপে বিধিভাগের প্রামাণ্য সংস্থাপন করা কঠিন হইলেও একেএকে পূর্ব্বোক্ত আপত্তিগুলির খণ্ডন করা যাইতেছে। প্রথমতঃ আলোচ্য এই—

---

(১) "অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি।

(২) "নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি।"

(৩) "আত্মা বা ইদমেক মেবাগ্র আসীৎ।"

(৪) "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ।"

অরণ্যজাত তিলগোধূমাদি বিধিবাক্যের অপ্রামাণ্য হয় হউক—কিন্তু ঐ বিধি বাক্য দ্বারা যে অর্থের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে, সেই অনুষ্ঠেয় অর্থের কিছুতেই অপ্রামাণ্য হয় না—"অজাক্ষীরেণ জুহোতি" অজার দুগ্ধ দ্বারা হোম করিতে হইবে। এই বিধিবাক্য দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, পূর্ব্বোক্ত বিধি-বাক্যের অর্থ অবশ্য অনুষ্ঠেয়। অর্থাৎ "অজাক্ষীরেণ জুহোতি" এই বিধি-বাক্যকে প্রশংসা করিবার জন্য উক্ত জর্ত্তিলাদি বিধির অনুবাদ করিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। যেরূপ গো, অশ্ব প্রভৃতি পশুদিগকে প্রশংসা করিবার জন্য লোকে বলিয়া থাকে, "অপশবো বা অন্যে গোঅশ্বেভ্যঃ" অর্থাৎ গো অশ্ব প্রভৃতি পশু ভিন্ন অন্য যত পশু আছে তাহারা অপশু অর্থাৎ পশু নহে। এই অর্থবাদরূপ বাক্য দ্বারা অজ প্রভৃতির পশুত্বকে যেরূপ নিন্দা করা হয় এ স্থানেও অবিকল তদ্রূপ হইয়াছে জানিবে। নতুবা অশ্ব কিম্বা গো ভিন্ন অপরে যে পশুত্বজাতি ত্যাগ করিয়া অন্য জাতি প্রাপ্ত হইবে, তাহা কখনই হইতে পারে না। তবে অশ্ব গো প্রভৃতিকে প্রশস্ত পশু বলা হইয়াছে এবং অজ প্রভৃতিকে নিকৃষ্ট পশু বলা হইয়াছে মাত্র। বস্তুতঃ বেদের কোন শাখাতে অজকে অপশু বলা হইয়াছে, আবার বেদের অন্য শাখাতে অজার দুগ্ধ দ্বারা হোম করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অতএব জর্ত্তিলাদি বিধি বাক্য এই স্থানে নিন্দিত হইলেও কোন না কোন শাখাতে অবশ্যই ঐ বিধির প্রশংসা করা হইয়াছে।

এইরূপে জর্ত্তিলাদি বিধির কথঞ্চিৎ প্রামাণ্য হইলেও সকল শাখায় প্রামাণ্য হইবে না। তবে শাখা বিশেষে প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে না সত্য। এ বিষয়ে যুক্তি এই—যেমন গৃহস্থাশ্রমে থাকিলে পরান্ন ভক্ষণ নিষিদ্ধ, আবার ঐ পরান্ন ভক্ষণ গৃহস্থাশ্রমে নিষিদ্ধ হইলেও অন্য আশ্রমে তাহা প্রামাণিক। সেইমত জর্ত্তিলাদি বিধি কোন শাখাতে অপ্রমাণ হইলেও শাখান্তরে যে প্রমাণিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

———*———

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ॥

হৃষীকেশ সহাস্য আস্যে উভয় সেনার মধ্যবর্ত্তী বিষন্নবদন অর্জ্জুনকে কহিলেন। ইহার পরে বাসুদেব যাহা কহিলেন তাহাই ভগবদগীতা নামে খ্যাত, এবং তাহাই মহাভারতে উপনিষদ নামে কথিত হইয়াছে। অর্জ্জুন যাহা কহিলেন তাহার মর্ম্ম এই যে যুদ্ধ করা অন্যায় কার্য্য। কেননা প্রথমতঃ যুদ্ধ করিলে বহুতর আত্মীয় স্বজনের প্রাণ বিনাশ হইবে তাহাদের শোক অত্যন্ত কষ্টকর হইবে। দ্বিতীয়তঃ বহুতর মানব নাশে জগতের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। সুতরাং নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আত্মীয় ও গুরুজনদিগকে বধ করিয়া রাজ্য-গ্রহণ করা অপেক্ষা ভিক্ষার দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাও ভাল। এই বিবেচনা করিয়া অর্জ্জুন যুদ্ধ করিব না বলিয়া ধনুর্ব্বান পরিত্যাগ করিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, তিনি যাহা বলিতেছেন তাহা ভ্রান্তিমূলক যুদ্ধ করা—এবং আত্মীয় ও গুরুজন বধ করা তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য। ইহা বুঝাইয়া দিয়া তিনি অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিলেন। এক্ষণে পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন এই উত্তর নীতি ধর্ম্মনীতি হইতে পারে কিনা। তুমি হয়ত বলিবে যখন ভগবদগীতার মর্ম্ম এই তখন উহা রাজনীতি—ধর্ম্মনীতি গ্রন্থ নহে। কেন না তুমি ইংরাজ গুরুর নিকট শিখিয়াছ ধর্ম্ম ও বিষয়কার্য্য সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়। বিষয়কার্য্যের সহিত ধর্ম্মাচরণ কখনও সম্ভব নয়।—যিনি ধর্ম্মের সহিত বিষয় কার্য্য করেন তিনি নিতান্ত মূর্খ, তিনি কখনও কৃতকার্য্য হয়েন না। পাশ্চাত্য গুরু বলিয়াছেন—ধর্ম্ম কর্ম্ম রবিবারে করিবে উপাসনাগৃহে

বসিয়া ঈশ্বরকে ডাকিবে ও যাহার যেমন সাধ্য তেমনি কিছু করিবে। আর সমস্ত সময়ে বিষয় কার্য্য করিবে—কার্য্যের সহিত ধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই। আমরা অনেকের নিকট শুনিতে পাইয়াছি যে তাঁহারা বিষয় কার্য্য করণ সময়ে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া থাকেন আমি ত ধর্ম্ম করিতে বসি নাই—আমি কার্য্য করিতে বসিয়াছি—এ সময়ে দয়া বা অন্য কিছু করিলে চলিবে না। পাশ্চাত্য বিদ্যা প্রভাবে আজি কালি লোকের সংস্কার হইয়াছে যে বিষয় কার্য্য করিবার সময় ধর্ম্মের দিকে তাকান আবশ্যক নয়। যিনি তাহা করিবেন, তিনি কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। এই জন্য এক্ষণে সমস্ত কার্য্যের মধ্যেই প্রবঞ্চনা, জুয়াচুরি এবং ঐ জুয়াচুরি করিয়া কেহ লজ্জিত হয়েন না। কেন না সকলেই জানিতেছেন যে, উহা বিষয় কার্য্যের আবশ্যম্ভাবী নিয়ম। সেই জন্য যাহারা মোকদ্দমা করেন, তাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য ও জাল দলিল প্রস্তুত করেন, যাঁহারা ব্যবসায় করেন তাঁহারা সহস্র মিথ্যা কহেন, যাঁহারা কোন পুস্তক, ঔষধ কিছুর দ্বারা কিছু লাভ করিতে চাহেন তাঁহারা বিজ্ঞাপনে মিথ্যার ছড়াছড়ি করেন। অথচ তাঁহারা সকলেই সমাজে লব্ধ প্রতিষ্ঠা যাঁহারা বিশেষ ধার্ম্মিক বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহারাও উক্ত বিধ আচরণ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই কারণে ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি নানাভাগে নীতিশাস্ত্র বা ধর্ম্মশাস্ত্রকে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে যে কার্য্য রাজনীতি বা সমাজনীতির বিরুদ্ধ তাহা ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ না হইতে পারে এবং যে কার্য্য ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ তাহা রাজনীতি, বা সমাজনীতির বিরুদ্ধ না হইতে পারে। সুতরাং তাঁহাদের মতে অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের বাক্যকে রাজনীতি বলিয়া বিবেচনা হইতে পারে। প্রাচীন হিন্দু কিন্তু সেরূপ বিবেচনা করিবেন না। কেন না হিন্দুর কাছে—ধর্ম্ম ছাড়া কর্ত্তব্য নাই। যাহা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ তাহা রাজনীতি বিরুদ্ধ ও সমাজবিরুদ্ধ, যাহা রাজনীতিবিরুদ্ধ তাহা সমাজবিরুদ্ধ ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ এবং যাহা সমাজবিরুদ্ধ তাহা রাজনীতি ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ, ধর্ম্মের জন্যই রাজনীতি ও সমাজনীতি। হিন্দুর মতে যাহা ধর্ম্মসঙ্গত তাহাই কর্ত্তব্য ও যাহা কর্ত্তব্য তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মবিরুদ্ধ অথচ কর্ত্তব্য এমত কর্ম্ম যে হইতে পারে, তাহা

হিন্দু জানেন না। সুতরাং অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের বাক্যকে যদি রাজনীতি বলা যাইতে পারে, তবে তাহা হিন্দুর নিকট ধর্ম্মনীতি বলিয়াও গণ্য হইবে। হিন্দুর এই বিশ্বাস সত্যের উপর স্থাপিত কি না তাহা ভগবদ্গীতার আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে।

অর্জ্জুন যুদ্ধ করা উচিত নয় বলিয়া তাহার যে সকল হেতু দেখাইয়াছেন তাহা চারিভাগে বিভক্ত হইতে পারে। (১) আত্মীয়াদি বিনাশ, (২) তাহাদের বিনাশে আপনার কষ্ট, (৩) তাহাদের বিনাশে জগতের অমঙ্গল (৪) উহা ঈশ্বরানভিপ্রেত সুতরাংঅধর্ম্ম ও অকর্ত্তব্য। ভগবান বাসুদেব ক্রমে ক্রমে ঐ সকলের উত্তর দিতেছেন।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥১১॥
ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরং ॥১২॥

প্রথমতঃ কৃষ্ণ বুঝাইতেছেন—শোকের বিষয় কিছুই নাই। তজ্জন্য কহিতেছেন হে অর্জ্জুন! তুমি পণ্ডিতের ন্যায় কথা কহিতেছ—অথচ জান না যে, শোক করার কোন কারণ নাই? পণ্ডিতগণ কি গতাসু কি অগতাসু কাহারও নিমিত্ত শোক করেন না। কেন না বাস্তবিক কাহারও মৃত্যু হয় না। কি আমি, কি তুমি, কি এই রাজাগণ কেহই জন্ম গ্রহণ করে নাই এবং কেহই মরিবে না। সকলেই চিরকাল বর্ত্তমান আছে ও চিরকাল থাকিবে। যদি বল আমরা প্রত্যক্ষ বিনাশ দেখিতেছি—তজ্জন্য বলিতেছেন যে, সে তোমাদের ভ্রম।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥১৩॥

যাহাকে তুমি প্রত্যক্ষ মৃত্যু বলিতেছ তাহা প্রকৃত বিনাশ নহে। উহা অবস্থান্তর মাত্র। কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্য যেমন অবস্থা বিশেষ মৃত্যুও সেইরূপ দেহান্তর প্রাপ্তিরূপ অবস্থা বিশেষ মাত্র, নাশ নহে। যদি উহাকে নাশ বল, তবে কৌমার অবস্থা প্রাপ্ত হইলে গর্ভাবস্থ জীবের নাশ বলিতে

হইবে, যৌবনবস্থা হইলে কৌমারাবস্থ জীবের নাশ বলিতে হইবে এবং বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত হইলে যৌবনাবস্থ জীবের নাশ বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা যখন বল না, তখন দেহান্তর প্রাপ্তিকে নাশ বল কেন? যদি বল মৃত্যু যে দেহান্তর প্রাপ্তি, প্রকৃত নাশ নহে তাহার প্রমাণ কি? আমরা ত তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই না। তজ্জন্য বলিতেছেন—

নাসতোবিদ্যতে ভাবোনাভাবোবিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥১৬॥

যদি তুমি প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত মানিতে না চাও তবে মানব, কি কোন প্রাণী বা কোন পদার্থের নাশ হয় বল কি প্রকারে? তুমি কি কোন পদার্থের জন্ম ও মৃত্যু দেখিয়াছ? কখনই না। তুমি কি কখনও কিছুনা হইতে কিছু উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছ? না কিছুকে কখনও কিছুনা হইতে দেখিয়াছ? অবশ্য কখনই না। তুমি যখন কোন পদার্থের জন্ম দেখ তখন কি শূন্য হইতে জন্ম দেখ? না, কোন পদার্থের অবস্থান্তর দেখ? কুম্ভকার যে ঐ হাঁড়িটী তৈয়ার করিল, উহা কি কিছুনা হইতে হইল? না মৃত্তিকা জলাদির রূপান্তর হইল মাত্র? আর ঐ যে হাঁড়িটী ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল—উহার কি নাশ হইল? না অবস্থান্তর হইল মাত্র? এইরূপে যে দিকে আমরা দেখি কোন স্থানেই কিছুনা অর্থাৎ শূন্য হইতে কোনও পদার্থের উদ্ভব ও কোনও পদার্থের শূন্যে পরিণতি দেখিতে পাই না। প্রত্যুত যখন আমরা উৎপত্তি ও নাশ দেখি তখনই দেখি পূর্ব্বোবস্থা হইতে অন্য অবস্থা হইল। বাস্তবিক কিছুনা কখনও কিছু হয় না এবং কিছু কখনও কিছুনা হয় না। তাহা যদি হইল, তবে মানবের বিনাশ হয়, তুমি কি প্রকারে বল? উহা তোমার কোন্ প্রত্যক্ষের বিষয়? যখন মানবের নাশ হইল না ও যখন পূর্ব্বাবস্থায় অর্থাৎ যেরূপ দেহসম্পন্ন ছিল, সে রূপ থাকিল না, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে মানবের অবস্থান্তর অর্থাৎ দেহান্তর প্রাপ্তি হইতেছে।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥২২॥

যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে

সেই রূপ দেহী জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করে—বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের ন্যায় উহা অবস্থান্তর মাত্র। যদি বল যখন দেহান্তর প্রাপ্ত জীব পূর্ব্ব জীব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও তাহাকে পূর্ব্ব পদার্থ বলিয়া চিনিয়া লওয়া যায় না—তখন তাহাকে পূর্ব্ব জীব কি প্রকারে বলিব। তাহা বলিতে পার না। কেন না গর্ভস্থ জীব কৌমার অবস্থায় উপনীত হইলে, কিম্বা কৌমার জীব যুবা হইলে অথবা যুবা বৃদ্ধ হইলে এত পরিবর্ত্তিত হয় যে, কিছুতেই চিনিতে পারা যায় না। প্রতিদিন দেখা যায় বলিয়াই আমরা চিনিতে পারি নচেৎ কিছুতেই চিনিতে পারা যাইত না। নিতান্ত পরিচিত ব্যক্তিকেও বহুকাল পরে দেখিলে চিনিতে পারা যায় না। বাস্তবিক গর্ভমধ্যস্থ জীবদেহে যে পদার্থ থাকে কৌমারে তাহার কিছুই থাকে না বলিলেই হয়। যৌবন বার্দ্ধক্য প্রভৃতিতেও ঐরূপ। কিন্তু কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্য যখন একই ব্যক্তির পরিণাম হইল তখন দেহান্তরপ্রাপ্তি তাহারই পরিণাম হইবে না কেন? যদি বল কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্য জীবের উন্নতির অবস্থা, দেহান্তরপ্রাপ্তি অবনতির অবস্থা অর্থাৎ মৃত্যুর পরে আবার হেয় গর্ভস্থাবস্থা হয়, সুতরাং উহা শোচনীয়, তাহাও বলিতে পার না। কেন না দেহান্তর প্রাপ্তি অবনতির অবস্থা নহে। উহাকে উন্নতিরই অবস্থা বলিতে হইবে। তাহা যদি না হয়, তবে পৃথিবীর উন্নতি হইতেছে কি প্রকারে? মানব সভ্য হইতেছে কি প্রকারে? যদি অসভ্য জন্মান্তরে উন্নত না হইল তবে সভ্য মানবের উদ্ভব হইল কি প্রকারে? অতএব দেহান্তরপ্রাপ্তি অবনতির কারণ নহে। তবে কর্ম্মদোষে ইহ জন্মেও যেরূপ অবনতি হয় পর জন্মেও সেইরূপ হইয়া থাকে। তাহা দেহান্তরপ্রাপ্তির দোষ নহে, কর্ম্মেরই দোষ। অতি বুদ্ধিমান বালকও যেমন কর্ম্মদোষে অতি কদর্য্য যুবায় পরিণত হয়, সেইরূপ কর্ম্মদোষে পর জন্মেও মানবের অবনতি হয়। যদি পরজন্মে আমাদের পূর্ব্ব জন্মের কথা কিছু স্মরণ থাকে না বলিয়া তাহাকে আমাদের পরিণাম না বলিতে চাও, তাহা হইলে যুবা ব্যক্তিকেও শিশুর পরিণাম বলিতে পার না। কেন না শৈশব কালের কথা কিছুই ত আমাদের স্মরণ থাকে না। ক্রমশঃ

ধর্ম্মশাস্ত্রের আবশ্যকতা।

ধর্ম্মশাস্ত্র লইয়া আজি কালি বড় আন্দোলন চলিতেছে। দ্বিবিধ নাস্তিক ও দ্বিবিধ আস্তিকদল অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রকে এরূপ টানাটানি করিতেছেন যে উহার টেকা ভার হইয়াছে। দুই প্রকার নাস্তিক বলার তাৎপর্য্য এই যে, এক প্রকার নাস্তিক আদৌ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না আর এক প্রকার নাস্তিক ঈশ্বর নাই বলেন না বটে, কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বর আছেন কি না জানার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন ঈশ্বর থাকিলেও তাঁহার উপাসনার প্রয়োজন নাই ও স্বর্গ নরক বা পরকাল নাই, ভাল মন্দ সমস্তই ইহকাল লইয়া। আমরা প্রথমোক্ত নাস্তিককে পূর্ণ নাস্তিক ও শেষোক্ত নাস্তিককে আংশিক নাস্তিক বলিব। পূর্ণ নাস্তিক আবার দুই প্রকার ;—এক প্রকারের নাস্তিকেরা যেমন ঈশ্বর নাই বলেন তেমনই পাপ পুণ্য অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যও নাই বলেন ; তাঁহাদের মতে যাহাতে আপনার সুখ হয় তাহাই কর্ত্তব্য ও যাহাতে আপনার অসুখ হয় তাহাই অকর্ত্তব্য। সুতরাং চৌর্য্য, দস্যুতা, পরদারহরণ প্রভৃতি সমস্তই বুঝিয়া করিতে পারিলে অর্থাৎ ঐ সকল কার্য্য করিয়া ধরা না পড়িলে অথবা ধরা পড়িলেও তদ্দারা আপনার অনিষ্ট সাধিত না হইলে, তাঁহাদের মতে কর্ত্তব্য। এইরূপ নাস্তিকদিগকে আমরা চার্ব্বাক্ নাস্তিক বলিব। দ্বিতীয় প্রকার পূর্ণ নাস্তিকেরা ঈশ্বর স্বীকার করেন না বটে কিন্তু তাঁহারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য মানেন। তাঁহারা বলেন চৌর্য্য, দস্যুতা, পরদারাভিগমন প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা বাস্তবিক সুখ হয় না প্রত্যুত উহদ্বারা নিজের অনিষ্টই হয়, মানব সামাজিক জীব, যাহাতে অন্যের অর্থাৎ সমাজের অনিষ্ট হয় তদ্দারা আপনার অনিষ্ট ও সাধিত হয়, সুতরাং

চৌর্য্যাদি অকর্ত্তব্য। শেষোক্ত প্রকার নাস্তিকদিগকে আমরা পাশ্চাত্য নাস্তিক বলিব।

সহজ করিয়া বলিতে হইলে বলিতে হয়, নাস্তিক তিন প্রকার ;—চার্ব্বাক্ নাস্তিক, পাশ্চাত্য নাস্তিক ও উন্নত নাস্তিক। বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, এই তিন দলেরই মূল মত এক। সকলেই আপনার সুখ মাত্রের উপর নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করেন ও আপনার বুদ্ধি মাত্রের উপর নির্ভর করিয়া স্বীয় মতের সত্যতা স্থাপন করেন। শাখামত প্রভেদের কারণ কেবল ক্রমোন্নতি—জ্ঞান বৃদ্ধিই এইমতত্রয়ের মধ্যে ভিন্নতার একমাত্র কারণ। আদিম নাস্তিকেরা ঈশ্বরের সত্তা কিছু মাত্র বুঝিলেন না, মূর্খতা, অজ্ঞতা বা জ্ঞানভাবই নাস্তিকতা সৃষ্টির মূল কারণ। অর্থাৎ ঈশ্বর জানিতে না পারিয়াই নাস্তিক। কেননা নাস্তিত্ব অর্থাৎ অভাব কখনও প্রমাণ হইতে পারে না। আছে প্রমাণ না হইলেই নাই বলিতে হইল। সুতরাং ঈশ্বর আছেন প্রমাণিত না হইলে বা বুঝিতে না পারিয়াই নাস্তিক। এই জন্য নাস্তিক ঈশ্বর নাই প্রমাণ করিতে পারেন না, করিতে অগ্রসরও হয়েন না। আস্তিকের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলেই তাঁহার জয়। আস্তিকেরা যেরূপ বুঝাইলেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না—বলিলেন উহা প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ ও অসম্ভব—তাঁহারা নাস্তিক হইলেন। তাঁহারা বলিলেন ঈশ্বর থাকা অসম্ভব নয়, ঈশ্বর থাকিলে মানবের দুঃখ হইবে কেন? সর্ব্ব শক্তিমান দয়ালু ঈশ্বর থাকিলে মানবের দুঃখ হইবে কেন?—ধর্ম্মশাস্ত্র নাই ঈশ্বর নাই, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতাগণ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া অনর্থক মানবগণকে দুঃখ প্রদান করিতেছেন, শাস্ত্র প্রণেতাগণ অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন বা আপনাদের স্বার্থপরতা সাধন মানসে কতকগুলি অন্যায় বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তদনুসারে চলিয়াই মানব দুঃখার্ণবে ভাসিতেছে। নির্ব্বোধ মানব ঐ সকল নির্ব্বোধ বা প্রতারকদিগের দ্বারা প্রতারিত হইয়াই এবম্বিধ কষ্ট পাইতেছে। যদি মানব ধর্ম্মশাস্ত্র বা বিধি মাত্রেরই অধীন না হয়—যাহাতে সুখ হয় তাহারই চেষ্টা করে তাহা হইলে কখনই তাহাদের দুঃখ হয় না। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা শাস্ত্রপ্রণেতাদিগের বিরুদ্ধাচারী হইলেন।

তথনকার রাজা ও সমাজ ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া চলিতেন—তখন স্বতন্ত্র সমাজশাস্ত্র ছিলনা, তজ্জন্য ঐ নাস্তিকগণ রাজবিধি ও সমাজ বিধিরও বিরুদ্ধাচারী হইলেন। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্যের যেরূপ প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাওয়া যায়না, রাজবিধি ও সমাজবিধির বিরুদ্ধ ফলের ত তাহা নহে, রাজা ও সমাজের বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে হাতে হাতে তাহার ফল ফলে। এই জন্য চার্ব্বাক্ নাস্তিকগণ সাবধানের সহিত পরানিষ্ট করিতে বলেন অর্থাৎ নির্ব্বোধ বা স্বার্থপর রাজা ও সমাজ যাহাতে দণ্ড দিতে না পারেন এরূপ ভাবে সতর্ক হইয়া গোপনে কার্য্য করিতে বলেন। নচেৎ তাঁহাদের মতে অকর্ত্তব্য কিছুই নাই। তাঁহাদের মতে যাহা করিলে নিজের অনিষ্ট বা ইষ্ট সাধনে বিঘ্ন হয় তাহাই অকর্ত্তব্য। কেবল রাজা ও সমাজ ধর্ম্মশাস্ত্রের কুপরামর্শে চৌর্য্যদস্যুতাকারীদিগকে দণ্ড দেন এই জন্যই চৌর্য্যাদিতে আপনার অনিষ্ট সাধিত হয়। প্রকৃততঃ ঐ সকল অনিষ্টের কারণ নহে। পশু পক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীসকলের উদাহরণ দেখিয়া তাঁহাদের এই সংস্কার আরও বদ্ধমূল হইল। নাস্তিকগণ দেখিলেন, পশ্বাদি যথেচ্ছাচরণ করিয়া সুখী হয়, মানবও যথেচ্ছাচরণ করিলে সুখী হইবে! পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলমন্ত্র স্বাধীনতা ও সাম্যবাদের অঙ্কুর সেই নাস্তিকদিগের মনে প্রথম উদিত হইল— মানব যথেচ্ছাচারী (স্বাধীন) হইলে সুখী হইবে ভাবিল। নাস্তিক বলিলেন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতাগণ যদি মানবকে কলুষিত না করিত তাহা হইলে যথেচ্ছাচার সুতরাং চৌর্য্যাদি দ্বারা কখনই মানবের অনিষ্ট সাধিত হইত না। আধুনিক সভ্যগণ যেমন বলিয়া থাকেন যে, পুরুষের অত্যাচারই স্ত্রীজাতির হীনতার একমাত্র কারণ, বাস্তবিক নারীজাতি দুর্ব্বলা নহে, যদি পুরুষগণ উহাদিগকে যথেচ্ছ কার্য্য করিতে বাধা না দিত তাহা হইলে কখনই নারীগণ দুর্ব্বল হইত না; সেইরূপ তাৎকালিক নাস্তিকগণ বলিতেন যদি শাস্ত্রপ্রণেতাগণ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া মানবকে তদধীন না করিতেন—চৌর্য্য প্রভৃতি অপকর্ম্ম ও দান প্রভৃতি সৎকর্ম্ম এরূপ সংস্কার না জন্মাইয়া দিতেন, তাহা হইলে কখনই এক্ষণে চৌর্য্যাদি দ্বারা মানবের ক্ষতি হইত না— মানব অসুখী হইত না। আধুনিক সভ্যগণের ঐ সংস্কার যেমন স্ত্রীস্বাধীনতা

প্রচারের একমাত্র কারণ, তাৎকালিক নাস্তিকগণের সেই সংস্কারই সেইরূপ যথেচ্ছাচার প্রচারের একমাত্র কারণ। স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচারকগণ যেমন বিশ্ব ব্যাপারের সকল দিক দেখেন না, তাৎকালিক নাস্তিকগণও সেইরূপ সকল দিক্ দেখিতেন না।

কিন্তু বুদ্ধিমান মানবের বুদ্ধির পাক হইতেই হইবে। কালে সংসার দেখিতে দেখিতে তাঁহারা বুঝিলেন যে, চৌর্য্যাদি প্রকৃতই আত্মানিষ্টকর—ধরা না পড়িলেও অনিষ্টকর। আজি একটী অন্যায় কার্য্য করিয়া ধরা পড়িলাম না বটে, কিন্তু একদিন ধরা পড়িতেই হইবে; তখন এত অনিষ্ট হইবে যে, পাঁচ বার ধরা না পড়িয়া যে লাভ হইয়াছিল তাহার চতুর্গুণ অনিষ্ট হইবে। ইহা দেখিয়া নাস্তিকগণ রাজা ও সমাজের উপর বিরক্ত হইলেন। কিন্তু রাজার উপর বিরক্ত হইলে কি হইবে? অস্ত্রের বিরুদ্ধে কথা কহা সহজ নহে, সমাজের বিরুদ্ধাচারী হইলেন। কিন্তু তাহাও অসম্ভব দেখিয়া সমাজকে স্বমতে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন সমাজের লোক বড় মূর্খ তাহারা আপনার মঙ্গলামঙ্গল বুঝে না, অনর্থক তাহারা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতাগণের ভ্রান্তবাক্য বিশ্বাস করিয়া কষ্ট পায় ও অপর মনুষ্যকে কষ্ট দেয়। ইহা বলিয়া তাঁহারা প্রত্যেক মনুষ্যকেই বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা যখন উত্তর করিল যে, ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যতিরেকে আমাদের চলিবার যো নাই—যখন তাহারা বুঝাইল, তুমি যদি আমার দ্রব্য চুরি কর তাহা হইলে আমিও তোমার দ্রব্য চুরি করিব এবং আমার বিপদে তুমি যদি সাহায্য না কর, তবে আমিও তোমার সাহায্য করিব না; কিন্তু এরূপ হইলে সুখের সম্ভাবনা কোথায়? তাহা হইলে সকল মানবই নিয়ত পরের অনিষ্ট করিতে থাকিবে, দ্বন্দ্ব করিতে থাকিবে, প্রবল দুর্ব্বলকে একবারে ধ্বংস করিবে—সুখ কি প্রকারে হইবে? সমাজস্থ লোক সকল যখন নাস্তিকদিগকে এইরূপ বুঝাইল ও যখন দেখিল সমাজ বিরুদ্ধাচারী হইলে যথেচ্ছাচরণ করিতে পারা যায় না, তখন নাস্তিকের মনে বিরুদ্ধশক্তি অনুভব করিবার শক্তি হইল। ঐশী শক্তি বুঝিল না বটে কিন্তু সমাজ শক্তি বুঝিতে পারিল। নাস্তিক আপন মতের বিরুদ্ধ কথা পাইয়া তাহার উত্তর দিতে পারিলেন না, কিছু ঠেকিলেন। ভাবিতে ভাবিতে স্থির

করিলেন, স্বার্থ যাহাকে বলি সুখ যাহাকে বলি, তাহা কেবল আত্মপর নহে—সমাজপর; যে সমাজে থাকিতে হইবে সে সমাজের সুখ দুঃখ দেখা নিতান্ত আবশ্যক। যাহাতে সমাজের মঙ্গল হয় তাহা কর্ত্তব্য ও যাহাতে সমাজের অমঙ্গল হয় তাহা অকর্ত্তব্য। সমাজের সুখ আপনার সুখ ও সমাজের দুঃখ আপনার দুঃখ। এই প্রকারে পাশ্চাত্য নাস্তিকসম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হইল—চার্ব্বাক্ নাস্তিক হইতে পাশ্চাত্য নাস্তিকের উদ্ভব হইল। যে নাস্তিক পূর্ব্বে আপনাকে ভিন্ন কিছুই লক্ষ্য করিতেন না তাঁহার এক্ষণে একটী লক্ষ্য স্থান হইল, সমাজ তাঁহাদের ঈশ্বর স্থানীয় হইল—দেবতা হইল।

এখন হইতে আর তাঁহারা পুরা নাস্তিক রহিলেন না। এখন হইতে তাঁহারা আপনার অস্তিত্ব ভিন্ন অন্যের অস্তিত্বের আবশ্যকতা বুঝিলেন। কিঞ্চিৎ উন্নত হইলেন—ঈশ্বরপথে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন—আপনার সুখই সমস্ত নয়, তদতিরিক্ত আর কিছু আছে, যাহা ইচ্ছা তাহা করা যায় না, আপনার সুখ সাধন করিতে হইলে অন্য কিছুর সাধনা করিতে হয় ইত্যাদি বিষয় তাঁহারা এক্ষণে বুঝিলেন। কিন্তু বুঝিয়াও বৃথা হইল। যে মূল স্বার্থপরতা সাধন তাঁহাদের মূল মন্ত্র ছিল তাহা ছাড়িতে পারিলেন না। স্বার্থপরতার প্রকার ভেদ হইল মাত্র। প্রভেদ এই মাত্র হইল—যে পূর্ব্বে কেবল আপনাকেই আমি ভাবিতেন, এক্ষণে প্রতিবেশীগণ ও সেই আমির মধ্যে পড়িল; পূর্ব্বে কেবল আপনার স্ত্রীপুত্র, পিতা মাতা, আত্মীয়মণ্ডল রক্ষণীয় ও সুখের হেতু বিবেচিত হইত, এক্ষণে প্রতিবেশীগণের স্ত্রীপুত্রাদিও ঐরূপ বিবেচিত হইল। পূর্ব্বে 'আমি' একটি মাত্র ছিল—হস্ত পদাদি সম্মিলনেই 'আমি' বাচ্য হইত, এক্ষণে প্রতিবেশী মণ্ডলীর সম্মিলনে 'আমি' বাচ্য হইল। সমাজ নামক স্বতন্ত্র জীবের সৃষ্টি হইল। পূর্ব্বে যেমন আপনার সুখসাধন করিতে হইলে হস্তপদাদি কোন অঙ্গের কষ্ট প্রদান অবৈধ বিবেচিত হইত, এক্ষণে সেইরূপ আপনার সুখসাধন করিতে হইলে সমাজস্থ কোন ব্যক্তির কষ্ট দেওয়া অনুচিত বিবেচিত হইল। 'আমি'র আয়তন বৃদ্ধি হইল। 'স্বার্থপরতা' শব্দের স্থানে 'Patriotism' শব্দ ব্যবহৃত হইল। আস্তিকদিগের "ধর্ম্মশাস্ত্র" শব্দের স্থানে 'Politics' শব্দ সৃষ্টি হইল স্বার্থপরতা পূর্ণ মাত্রায় বাড়িয়া

উঠিল। পূর্ব্বে একাকী স্বার্থসাধন ভাল রূপে করা যাইত না, তাহাতে আবার রাজা ও সমাজ অন্তরায় ছিল, এক্ষণে অনেকে মিলিত হওয়ায় শক্তি বৃদ্ধি হইল, সমাজ ও রাজা নামক কিছু অন্তরায় থাকিল না—পূরা দোমে স্বার্থ পরতা চলিতে লাগিল। এক্ষণে প্রত্যেক সমাজ এক এক ব্যক্তির স্থানাধিকার করিল, এক সমাজ অপর সমাজের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইল। ইহার অন্তরায় কেহই রহিল না; যে সমাজ বলবান সে সমাজ জয়লাভ করিল ও যে সমাজ দুর্ব্বল সেই সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। ইংলণ্ডের এক ব্যক্তি ইংলণ্ডের আর একজনের ক্ষতি করিল না বটে কিন্তু আয়ার্লণ্ড, ভারত প্রভৃতি অপর সমাজের অনিষ্ট সাধনে দৃঢ় মনঃ সংযোগ করিল। ঐরূপ কার্য্য অকর্ত্তব্য নহে বরং বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইল এবং উহার অন্তরায় বিপক্ষ ভিন্ন আর কেহ থাকিল না, সুতরাং সমাজে সমাজে দ্বন্দ্ব বাড়িয়া গেল, স্বার্থপরতা নামান্তর ধারণ করিয়া মানবমনে দৃঢ়ভাবে বিচরণ করিতে লাগিল। যখন অন্য সমাজের সহিত বিবাদ হয়, তখন সমাজস্থ সকলেই পরস্পর সকলকেই আপনার ভাবে, কিন্তু যখন অন্য সমাজের সহিত কোনও গোল না থাকে তখন বৃহৎ সমাজ বিভক্ত হইয়া বহুতর ক্ষুদ্র সমাজে পরিণত হইয়া পরস্পর বিবাদ করে অথবা আত্মতে (Individual) আত্মতে বিবাদ করে। কেন না তাহাদের মূল মন্ত্র স্বার্থপরতা—স্বার্থপরতা সাধনই মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্য সমাজের লোক আপন সমাজে লব্ধাধিকার হইলে আপনার অনিষ্ট হইবে ভাবিয়াই অন্য সমাজের সঙ্গে বিবাদ সময়ে সমদুঃখসুখ স্বসমাজস্থ ব্যক্তিদিগকে আপনার ও অন্য সমাজকে পর ভাবে। কিন্তু যখন সে ভাব নাই যখন স্বসমাজের ব্যক্তিকে আপন সুখের প্রতিবন্ধক মনে হয় তখন আপনি মাত্রকেই আমি ভাবিয়া তাহাদের সহিত বিরোধ করে। এই প্রকারে অপেক্ষাকৃত উন্নত নাস্তিকগণ স্বার্থ পরতাকে মাত্র লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের (Patriotism) স্বদেশহিতৈষিতা স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এইরূপে পাশ্চাত্য নাস্তিকেরা কতকগুলি বিধিনিষেধ স্বীকার করেন, অর্থাৎ যাহাতে সমাজের সহিত মিলিত হইয়া স্বার্থ সাধন করিতে পারা যায়

তদুপযোগী বিধানের আবশ্যকতা বিবেচনা করেন। কিন্তু তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে ঐ সকল বিধিনিষেধ সমাজ-শাস্ত্রে ও ব্যবহার শাস্ত্রে থাকা উচিত। ধর্ম্মশাস্ত্র সকলই মিথ্যা ও তাহাতে এমন সকল বিধান আছে যে, তদনুসারে কার্য্য করিলে অমঙ্গল সাধিত হয়। চার্ব্বাক্ নাস্তিক ও পাশ্চাত্য নাস্তিকে প্রভেদ আছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের মূল মত ও ঐ মতোৎপত্তির কারণ একই। কেন না উভয়েরই আত্মহিত মূল উদ্দেশ্য, উভয়ের মতেই আত্মহিত ভিন্ন অন্য বিষয়ে দৃষ্টি মূর্খতা এবং উভয়েরই মতোৎপত্তির কারণ অনভিজ্ঞতা। চার্ব্বাক্ মতাবলম্বীরা আপন ভিন্ন আর কিছুই বুঝিতে পারেন নাই তজ্জন্য আপনার শক্তিকেই আপনার সুখদুঃখের একমাত্র কারণ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য নাস্তিকেরা বুঝিলেন আপন শক্তি ভিন্ন আর কিছু আছে, কিন্তু সে কিছু যে প্রকৃত কি তাহা বুঝিতে না পারিয়া, সমাজকেই সেই স্থানে বসাইলেন; ভাবিলেন সমাজই আমাদের সর্ব্বস্ব, সমাজ ভিন্ন আমাদের দেখিবার আর কিছুই নাই, সমাজশক্তিই আমাদের সকল সুখ দুঃখের মূল। এই উভয় দলই আত্ম-বুদ্ধিকেই সমস্ত জ্ঞান লাভের একমাত্র কারণ বিবেচনা করেন, পরমত গ্রাহ্যই করেন না—পরমত নিজ মতের বিপরীত হইলেই তাহা ভ্রান্তি-সঙ্কুল বিবেচনা করেন। ইহারা আপন জ্ঞানের প্রতি এরূপ বিশ্বস্ত যে, প্রত্যক্ষ সহস্র বিরুদ্ধ প্রমাণ প্রদর্শন করিলেও তাঁহারা স্বমতের অন্যথা বিবেচনা করিতে স্বীকার করেন না।

একক্ষণে অনেক নাস্তিক আপনাদের অনভিজ্ঞতার বিষয় কিছু বুঝিয়াছেন। তাঁহাদিগকেই আমরা উন্নত নাস্তিক নামে অভিহিত করিয়াছি। তাঁহারা একক্ষণে বুঝিয়াছেন যে, তাঁহাদের জ্ঞান চূড়ান্ত নহে। এই জন্য তাঁহারা 'ঈশ্বর নাই' বলেন না। তাঁহারা বলেন ঈশ্বর আছেন কি না তাহা আমরা বুঝি না, বুঝিবার শক্তিও মানবের নাই—বুঝিবার প্রয়োজনও নাই; কেন না যদি ঈশ্বর থাকেন তাহা হইলে তাঁহার উপাসনার আবশ্যকতা নাই। আমাদের কর্ত্তব্য নিরূপণ করিবার জন্যও তাঁহার সত্তা প্রমাণের কোন প্রয়োজন নাই। যাহা আমাদের হিতকর তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। সুতরাং

ঈশ্বর আছেন জানিলেও যাহা কর্ত্তব্য,নাই জানিলেও তাহাই কর্ত্তব্য ; আমরা হিত লক্ষ্য করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিব—ঈশ্বর লক্ষ্য করিয়া নহে, ঐরূপে নির্ণীত কর্ত্তব্য করিলে আমরা নিশ্চয়ই সুখী হইব—তাহাতে ঈশ্বরের কোনও সম্বন্ধ নাই। যখন ঈশ্বর আছেন জানিলে আমরা যাহা করিব ও তিনি নাই বা থাকা না থাকা সন্দেহ জানিলেও তাহাই করিব, তখন ঈশ্বর নিরূপণের জন্য মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি? সেই চিন্তা কর্ত্তব্য নিরূপণের বিষয়ে প্রয়োগ করিলে বরং কার্য্য হইবে। এ নাস্তিকদল আপন অজ্ঞতা স্বীকার করেন ও পূর্ব্ব দুই দল তাহা স্বীকার করেন না এই মাত্র প্রভেদ, নচেৎ মূল মত সকলেরই এক রহিয়াছে। আপন সুখ সাধনই যে মুখ্য উদ্দেশ্য ও সেই উদ্দেশ্য সাধন করণে যে ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রতিবন্ধক তাহা উক্ত তিন দলই মুক্ত কণ্ঠে প্রকাশ করেন। হিতবাদ দর্শন নামক তাঁহাদের অভিমত গ্রন্থ তাঁহাদের মূল শাস্ত্র। ধর্ম্ম শাস্ত্রকে এই তিন দলই একবারে অগ্রাহ্য করেন এবং উহা দ্বারা যে মানবের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হয় তাহাও এই তিন সম্প্রদায়েরই মত।

আস্তিকদিগের দ্বারাও ধর্ম্ম শাস্ত্রের সামান্য লাঞ্ছনা হইতেছে না। আস্তিকগণ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত :—বিশ্বাসপরায়ণ ও যুক্তিপরায়ণ। বিশ্বাসপরায়ণেরা ধর্ম্মশাস্ত্রকে বহুমান্য করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহারা অনেক সময়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বোধে অক্ষম হইয়া অনেক অনিষ্ট সাধন করেন। যুক্তি পরায়ণ আস্তিকেরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের দ্বারাই ধর্ম্মশাস্ত্রের উৎপত্তি ও স্থিতি। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতাগণের মধ্যে যুক্তিপরায়ণ আস্তিকের সংখ্যা অধিক থাকাতেই হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র এত লব্ধপ্রতিষ্ঠ, উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এক্ষণে সেরূপ যুক্তি পরায়ণ আস্তিক অতি দুর্লভ এক্ষণে যে সকল যুক্তি পরায়ণ আস্তিক হইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা ধর্ম্ম শাস্ত্রের লাঞ্ছনাই হইতেছে। তাহার কারণ এই যে ঐ সম্প্রদায়ের উদ্ভবকারণ উত্তম নয়। এক্ষণে দুই কারণে দুই প্রকার যুক্তিপরায়ণ আস্তিকের উদ্ভব হইয়াছে,—এক প্রকার উন্নত নাস্তিকের উন্নতি হইয়া ও আর এক প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্রসকলের পরস্পরের অনৈক্য দর্শনে সন্দিগ্ধ হইয়া। যে সকল

নাস্তিক উন্নত হইয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর থাকিতেও পারেন, কিন্তু তদ্বিষয় জানার কোন আবশ্যকতা নাই, সেই নাস্তিকদল আরও উন্নতি লাভ করিয়া স্থির করিলেন, ঈশ্বর আছেন, কিন্তু তাঁহার বিশেষ প্রকার উপাসনার প্রয়োজন নাই, তাঁহার নিয়ম মত কার্য্য করাই কর্ত্তব্য—যাহাতে আপনার সুখ হয় সেই কার্য্যই তাঁহার অভিপ্রেত। তাঁহাদের মতে মানবের সুখের জন্যই ঈশ্বর সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিয়া সন্দিহান হইয়া যাঁহারা যুক্তিপরায়ণ হইয়াছেন, তাঁহারও প্রায় ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন; প্রভেদ এই যে, তাঁহারা উপাসনা ব্যাপারে অধিক লিপ্ত থাকেন—ঈশ্বরের উপাসনার নিতান্ত আবশ্যকতা প্রচার করেন। ফলতঃ এই দুই প্রকারের আস্তিক, আস্তিক নাস্তিকের মিলন স্থল। তবে নাস্তিক হইতে উন্নীত যুক্তি পরায়ণ আস্তিকগণ আত্মহিতকামনা মুখ্য উদ্দেশ্য ভাবেন, জগৎ আপনার জন্য দেখেন ও সকলই আপনার মঙ্গলের জন্য সৃষ্ট ভাবেন এবং প্রকৃত যুক্তিপরায়ণ আস্তিক আপনাকে অকিঞ্চিৎকর ভাবেন, জগৎ ঈশ্বরময় দেখেন ও আপনি শুদ্ধ সমস্ত জগৎ ঈশ্বরের অঙ্গ ও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট মনে করেন। প্রাচীন শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ উক্ত প্রকার প্রকৃত যুক্তিপরায়ণ আস্তিক। দুঃখের বিষয় এক্ষণে সেরূপ আস্তিক মেলা দুর্ঘট হইয়াছে। এক্ষণকার যুক্তিপরায়ণ আস্তিক-সম্প্রদায়দ্বয় দুই দোষ হইতে উদ্ভূত হওয়ায় তাঁহাদের দ্বারাও ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিলক্ষণ লাঞ্ছনা হইতেছে। ঐ উভয় দলই ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে আপন পছন্দ মত বাক্য সকল নির্ব্বাচন করিয়া নূতনপ্রকার ধর্ম্মের সৃষ্টি করিতেছেন। সুতরাং তাঁহারা আপনমত ও ধর্ম্মশাস্ত্র মত উভয় মতেই চলিতেছেন অথবা স্বমত কি পরমত কোনমতেই চলিতেছেন না। কিম্বা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা আপন মতেই চলিতেছেন, তবে যে পরমতগুলি আপন মতের সহিত ঐক্য হয়, সেই গুলি আপন মতের পোষক জন্য গ্রহণ করিতেছেন মাত্র। সর্ব্বথা আজি সকল সম্প্রদায়ই ধর্ম্মশাস্ত্রকে খেলার সামগ্রী বা তাচ্ছিল্যের জিনিষ করিয়া তুলিয়াছেন। কি আস্তিক কি নাস্তিক সকল বিজ্ঞ সম্প্রদায়ই অন্ততঃ ইহা বুঝাইয়া দিতেছেন যে, ধর্ম্মশাস্ত্র যে পদবীতে আরূঢ়

রহিয়াছে উহা কদাপি তাহার যোগ্য নহে, অর্থাৎ ধর্ম্ম শাস্ত্রে লিখিত আছে বলিয়া অথবা ঈশ্বরের বাক্য বা আপ্ত বাক্য বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন কথা অবশ্যপ্রতিপাল্য মনে করিতে হইবে না—যদি উহার কোনও কথা প্রতিপালন করিতে হয়, সে পণ্ডিত বাক্য বলিয়া—অন্য শাস্ত্রের ন্যায় উহাতেও ভ্রম প্রমাদ যথেষ্ট। কিন্তু বাস্তবিক ধর্ম্মশাস্ত্র যে সেরূপ জিনিষ নহে, তাহা আমরা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছি।

নাস্তিকেরা যে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী হয়েন তাহার প্রধান কারণ এই যে, তদনুসারে চলিলে মানবের স্বাধীনতা থাকে না, ইচ্ছামত আপন সুখ সাধন করিতে পারা যায় না, আপন অনিষ্ট করিয়া পরের হিত সাধন করিতে হয়, ইন্দ্রিয় ও রিপু দমনজন্য কষ্ট স্বীকার করিতে হয় এবং যথেচ্ছ প্রণালীতে আপন সুখের চেষ্টা করা যায় না। কিন্তু এ কারণে তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। কেন না চার্ব্বাক্-নাস্তিক ভিন্ন সকল সম্প্রদায়ই মানবের জন্য বিধি বিশেষ—শাসন বিশেষ থাকার আবশ্যকতা স্বীকার করেন। তবে কথা এই যে তাঁহারা বলেন ধর্ম্ম শাস্ত্র না থাকিয়া সমাজ শাস্ত্র ও ব্যবহার শাস্ত্র থাকা ভাল। কিন্তু আমরা বলি যখন এরূপ শাস্ত্র বিশেষ রাখিতে হইল ও যখন সেই শাস্ত্র বিশেষের অধীন হইয়া মানবকে স্বাধীনতা নাশ করিতে হইল, পরানিষ্ট করিতে পরাঙ্মুখ হইতে হইল, ইন্দ্রিয়াদির দমন করিতে হইল, আপনার ক্ষতি করিতে হইল তখন ধর্ম্মশাস্ত্রের অপরাধ কি? বরং আমাদের বোধ হয় এরূপ স্থানে ধর্ম্ম শাস্ত্রই উৎকৃষ্ট। কেননা সমাজশাস্ত্র ও ব্যবহারশাস্ত্রদ্বারা মানবের অনেক অনিষ্ট সাধিত হয়। অনেক সময়ে অনেক নিরপরাধী ব্যক্তি সমাজ ও রাজা কর্ত্তৃক প্রচুর দণ্ড পায় ও অনেক ভয়ানক অপরাধী বিনা দণ্ডে অব্যাহতি পায়। আবার নির্দ্দোষীকে দোষী ও দোষীকে নির্দ্দোষী করিবার জন্য অনেকে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ ও নানা প্রকার প্রতারণা করিয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্র যদি না থাকে তাহা হইলে অবৈধ কর্ম্ম নিষেধক ও বৈধকর্ম্ম সম্পাদক সমস্ত বিধিই আইনের মধ্যে থাকিবে। কিন্তু তাহা যে কত অনিষ্টকর তাহা কিঞ্চিৎমাত্র চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। সমস্ত কার্য্যব্যবস্থাই যদি আইনের

মধ্যে থাকে, তাহা হইলে মানবগণ নিয়ত বিপদে পতিত হয়। এক্ষণে ধৰ্ম্মশাসন এককালে লুপ্ত হয় নাই, সমাজবল একবারে বিদূরিত হয় নাই, মানবশাসনের এক আনাও দণ্ডবিধির অন্তর্গত হয় নাই—তথাপি আজি ভারতের কি দুর্দ্দশা উপস্থিত। পুলিসের ভয়ে, দণ্ডবিধির ভয়ে সমস্ত লোকই ভীত ও ব্যতিব্যস্ত। যদি ধৰ্ম্মশাসন না থাকে, যদি সমস্তই আইনের কঠোর শাসনের অন্তর্গত হয় তাহা হইলে কি আর রক্ষা আছে? সামান্য একটা মিথ্যা কহিলে, বেশ্যালয়ে গমন করিলে, কাহারও মনোকষ্ট দিলে, পরুষবাক্য প্রয়োগ করিলে বা যে কোনরূপ ধৰ্ম্ম ও নীতিবহির্ভূত কার্য্য করিলে যদি রাজদ্বারে অভিযোগ করিতে হয়, তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হয় ও শারীরিক বা অর্থ দণ্ড ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে কি মানজীবন নিতান্ত বিড়ম্বনা হইয়া পড়ে না? যদি বল সামান্য অপরাধগুলি রাজদ্বারে বিচারিত না হইয়া সমাজের দ্বারা তাহার শাসন হইবে—তাহাও অসম্ভব। কেন না এক্ষণে সমাজ ও রাজা একই কথা—সভ্যদেশবাসী এক্ষণে রাজাকে সমাজপতি ভিন্ন আর কিছুই বলিতে চাহেন না। সুতরাং সামাজিক শাসন ও রাজশাসন একই কথা। যদি প্রাচীন সমাজের ন্যায় সমাজ ব্যবস্থা করিতে চাও তাহাতেও সুফল প্রত্যাশা করা যায় না। কেন না প্রাচীন সমাজের দণ্ড ছিল দোষী ব্যক্তির অন্ন ভোজন নিষেধ, তাহাকে কন্যাদান নিষেধ ও তাহার সহিত সৰ্ব্বপ্রকার সংস্রব রহিত করা। কিন্তু ঐ দণ্ডবিধি হইতে দেশের অনেক অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তি, পরস্পরের সহিত পরস্পরের আহার সম্বন্ধে এত কূট নিয়মের বাড়াবাড়ি ও তজ্জনিত অনৈক্য প্রভৃতি দোষ উৎপাদনের মূল কারণই ঐরূপ সামাজিক শাসন। যে সময়ে সামাজিক শাসনের এরূপ অবস্থা ছিল সে সময়ে গুরুতর অপরাধই অথবা বিশেষ প্রকার অপরাধই সমাজ শাসনের অন্তর্গত ছিল, অন্যায় কার্য্য মাত্রই উহার অন্তর্গত ছিল না। তাহাতেই যখন এত অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, তখন অন্যায় কার্য্য মাত্রই উহার অন্তর্গত থাকিলে কত অনিষ্ট সম্ভবিতে পারে? বিশেষতঃ রাজ-শাসনে যেমন অনেক সময়ে অপরাধী নিরপরাধীরূপে এবং নিরপরাধী অপরাধীরূপে নিশ্চিত হইয়া মুক্ত ও দণ্ডিত হয়, সমাজ শাসনেও সেইরূপ

হইয়া থাকে। আমাদের বোধ হয় ঐ দোষ সমাজ মধ্যে অধিক হইবারই সম্ভব। অনেক সময়ে শত্রুতা সাধন মানসে নির্দ্দোষীকে সমাজচ্যুত করা হয় এবং মিত্রতার অনুরোধে অনেক দোষীকে সমাজমধ্যে রাখা হয়। বোধ হয় এই জন্যই, প্রায়ই দেখা যায় যে দোষী ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বর্গ মিত্রতার অনুরোধে সমাজচ্যুত দোষীর সহিত মিলিত হইয়া স্বতন্ত্র সমাজবদ্ধ হয়। সুতরাং তদ্দ্বারা দোষী সমাজচ্যুত ও দণ্ডিত হয় না—একটী স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র সমাজের সৃষ্টি হয় মাত্র। যদি সামান্য সামান্য দোষ লইয়া নিয়ত সমাজে এই রূপ শাসন চলিতে থাকে তাহা হইলে মানব একদিনও স্থির থাকিতে পারে না। যদি বল ঐ সকল অপরাধ কেবলমাত্র সামাজিক নিন্দা দ্বারা অপনীত হইবে, উহার জন্য বিশেষ কোনও প্রকার দণ্ডের আবশ্যক হইবে না,—আমরা বলি তাহা হইতে পারে না। কেন না, যে কার্য্য দণ্ডার্হ নয় সে কার্য্য যে কোনও অপরাধের অন্তর্গত তাহা প্রায় কাহারও মনে স্থান হয় না। সমাজ যখন মনুষ্য সমষ্টি ও প্রত্যেক মনুষ্যই যখন স্বার্থপর ও তজ্জন্য অন্যায় কার্য্য করিতে সচেষ্ট তখন ঐ ঐ কার্য্যে নিন্দা হয় না। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখা যাইতেছে—দেখা যাইতেছে ধর্ম্ম বিরুদ্ধ সামান্য কার্য্যের জন্য মানব যেরূপ নিন্দিত হয়, আইন বিরুদ্ধ ভয়ানক কার্য্য করিয়াও সেরূপ নিন্দিত হয় না, বরং লোকে তাহার সহানুভূতি প্রকাশ করে। আইন বিরুদ্ধ কার্য্য কারীরা অর্থ বলে উকীল বারিষ্টার নিযুক্ত করিয়া নির্দ্দোষী হইবার চেষ্টা করে ঐ সমাজস্থ ঐ সকল উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্তগণ ও অনেক সময়ে সমাজ সাধারণে ঐরূপ দোষীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাহার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন। যখন এরূপ অবস্থা অর্থাৎ যখন আইন ও সমাজ অনু-সারে দোষী ব্যক্তি সকল সময়ে সাধারণের ঘৃণার পাত্র বলিয়া গণ্য না হইয়া বরং সহানুভূতির যোগ্য হয় তখন ধর্ম্ম শাসন না থাকিলে কি প্রকারে অবৈধ কার্য্য হইতে মানবকে বিরত করা যাইতে পারে? আরও এক কথা এই যে, মানব ঘটনার দাস, অতি, সাধু ব্যক্তিও ঘটনার অধীন হইয়া কোনও সময়ে গুরুতর আইন বিরুদ্ধ কার্য্য করে ও তজ্জন্য রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়া চিরজীব-নের মত নষ্ট হইয়া যায়। সে ব্যক্তি হয়ত সেই দৈব দুর্ঘটনা জন্য কত

আক্ষেপ ও কত মনস্তাপ করিয়াছে, যে অপরাধ করিয়াছে তাহার ক্ষতি-পূরণ করিবার জন্য কত ইচ্ছা ও চেষ্টা করিয়াছে ধর্ম্ম শাসনের অধীন থাকিলে সে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা অনায়াসে, উদ্ধার হইতে পারিত কিন্তু রাজকর্ম্মচারী সে সকল কিছুই দেখিতে পাইলেন না তিনি আইনের দাস, তিনি যেমন প্রমাণ পাইলেন তদনুরূপ বিচার করিলেন—শত্রুপ্রদত্ত মিথ্যা প্রমাণ সত্য জ্ঞানে তদণ্ডেই সেই চিরসাধুর প্রতি দণ্ডবিধির কঠিন দণ্ডব্যবস্থা করিয়া তাহাকে একবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিবেন। তাই বলি ধর্ম্ম শাসনের পরিবর্ত্তে অন্য কোনও প্রকার শাসন কার্য্যকর হইতে পারে না।

আর এক কথা। অবৈধ্য কার্য্য নিষেধ সম্বন্ধে যদিও কিছু উপায় রাজ শাসনাদি দ্বারা হইতে পারে, কিন্তু বৈধ কার্য্য করণ সম্বন্ধে মানবের প্রবৃত্তি দায়ক কোন বিধিই ধর্ম্মশাসন ভিন্ন অন্য প্রকারে হইতে পারে না। স্বামী বা স্ত্রীকে ভাল বাসিবে, পুত্র কন্যাকে স্নেহ করিবে, পিতা মাতাকে ভক্তি করিবে, প্রতিবাসী বা মানবমণ্ডলীকে আপনার ন্যায় দেখিবে, দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে দান করিবে, সকলের সহিত সুমিষ্ট আলাপ করিবে,ধনের সুব্যবহার করিবে ইত্যাদির সুব্যবস্থা, না আইন না সমাজ, কেহই করিতে পারে না। ঐ সকল কর্ম্ম যিনি না করিবেন তিনি দণ্ড প্রাপ্ত হইবেন, এরূপ আইন যদি করা হয় তাহা হইলে যে স্বাধীনতার লোপ আশঙ্কায় ধর্ম্মশাস্ত্র লোপ করিবার প্রয়াস, সে স্বাধীনতা মানবে কিঞ্চিন্মাত্রও থাকে না, মানব প্রতি পাদবিক্ষেপে বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং এরূপ নিয়ম করা একান্ত অসম্ভব। যদি পুরস্কার ব্যবস্থা দ্বারা ঐ সকল কার্য্যে প্রবৃত্তি দেওয়ার চেষ্টা হয়, তাহাও অসম্ভব। কেন না কোন অবস্থায় কিরূপ স্নেহ দয়াদি করা উচিত তাহার স্পষ্ট নিরাকরণ করিয়া দেওয়া সহজ নহে—সুতরাং কোন কার্য্য না করিলে দণ্ড দিতে হইবে ও কোন্ কার্য্য করিলে পুরস্কার দিতে হইবে তাহা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন হয়; বিশেষতঃ ঐ পুরস্কার প্রাপ্তির আশয়ে এত আবেদন উপস্থিত হয় ও তাহার প্রমাণ ইত্যাদির জন্য এত ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়, যে কি অর্থী কি প্রত্যর্থী কি বিচারক সকলেই বিপন্ন

হইয়া পড়েন, সুতরাং ঐ পুরস্কারবিধি দণ্ডবিধির ন্যায় বা তদপেক্ষা অধিক অত্যাচারে কারণ হয় এবং অনেক সময়ে দুষ্কর্ম্মকারী পুরস্কার পায় ও সৎ-কার্য্য কারীর দণ্ড পায়। যদি বল কোন প্রকার পুরস্কার ব্যবস্থা না করিয়া কেবল যশোদ্বারা সৎকার্য্যে উৎসাহ দিলেই হইতে পারে, আমরা বলি তাহা নহে। নিন্দা দ্বারা যেরূপ দুষ্কর্ম্ম দমিত হইবার সম্ভব নাই যশোদ্বারাও সেইরূপ সৎকার্য্যে উৎসাহ হইবার সম্ভব নাই।

অতএব যদি মানবকে কার্য্য বিশেষ হইতে নিরস্ত করা ও কার্য্য বিশেষে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য কোন নিয়ম আবশ্যক হয় তবে ধর্ম্মশাস্ত্রই তাহার প্রকৃষ্ট উপায়, অন্য উপায় উৎকৃষ্ট নহে। যদি এরূপ বুঝা যায় যে, মানবের জন্য কোন বিধি নিষেধের আবশ্যকতা নাই, স্বাধীন ভাবে যাহা করিবে তাহাই মানবের উচিত, তাহা হইলে ধর্ম্ম শাস্ত্র বিলোপের আবশ্যক বটে। কিন্তু চার্ব্বাক্ নাস্তিক ভিন্ন কেহই সেরূপ বলেন না; সকলেই একবাক্যে বলেন মানবের জন্য নিয়মাবলীর প্রয়োজন ও সেই নিয়মাবলীর অধীন হইয়া মানবকে চলিতে হইবে। তাহা যদি হইল তবে ধর্ম্ম শাস্ত্র উঠাইবার প্রয়োজন কি? তবে উহা মানবের কষ্টের কারণ কি প্রকারে হইল? মনে কর পরদারহরণ নিষেধ করা আবশ্যক, তজ্জন্য ব্যবস্থা হইল যিনি পরদার হরণ করিবেন তিনি চতুর্দ্দশ বর্ষ কারাবদ্ধ থাকিবেন। মানব প্রবৃত্তিমার্গানুসারী—ইন্দ্রিয় ও রিপুর দাস। স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরোধী কার্য্য করা সহজ কথা নহে, অনেক শিক্ষা, অনেক অভ্যাস ও অনেক ভয় থাকিলে তবে মানব অতি কষ্টে প্রবৃত্তির বিরোধী কার্য্য করিতে পারে। যে সকল প্রবৃত্তি মানব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা চরিতার্থ করিলে মানবের সুখ ও তাহার অচরিতার্থে মানবের দুঃখ, সুতরাং প্রবৃত্তিমার্গানুসারী হওয়াই মানবের কর্ত্তব্য হইতেছে। উহার প্রতিবন্ধক কেবল সমাজের অনিষ্ট ও তজ্জন্য সামাজিক বা রাজকীয় দণ্ড। যাহারা বিশেষ বিবেচক লোক তাহারা ভিন্ন পরানিষ্ট আশঙ্কায় নিজের সুখ নষ্ট করিতে পারে না—পারিলেও প্রবৃত্তির নিরোধ করা সহজ নহে। পরকালে চিরকাল ভয়ানক কষ্ট পাইব এই আশঙ্কায় মানব প্রবৃত্তি নিরোধ করিবার জন্য নিরত অভ্যাস করে, তথাপি সকলে দূরে থাকুক

বিশেষ ধার্ম্মিক ব্যক্তিও সকল সময়ে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে ইন্দ্রিয় ও রিপুর বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারেন না। কিন্তু যদি ধর্ম্ম ভয় না থাকে, যদি পরকালে অনন্তকাল কষ্ট পাইব এ ভয় না থাকে, যদি সর্ব্বদর্শী ঈশ্বরের নিকট কিছুই লুকায়িত থাকিবে না বিবেচনা না থাকে তাহা হইলে মানব এরূপ কঠিন অভ্যাস করিবে কেন? বরং অনেক সময়েই মনে করিবে যে, আমি যে দুষ্কর্ম্ম করিতেছি তাহা লোকে জানিতে পারিবে না; সেই আশায় নির্ভর করিয়া মুখ্য আত্মসুখ চরিতার্থ করিবে। কেন না ধর্ম্মভয় ও তজ্জনিত কর্ত্তব্য জ্ঞানের স্থলে সমাজ ও রাজভয় এবং তজ্জনিত কর্ত্তব্য জ্ঞান মাত্র মানব মনে থাকে। কিন্তু গোপন করিতে পারিলে সে ভয় থাকে না। বাস্তবিক যদি তাহা গোপনে গোপনেই সাধিত হইয়া যায়, তাহা হইলে সমাজের অনিষ্ট হইল, যদি ধরা পড়িল তবে দোষী চিরজীবনের জন্য নষ্ট হইল। উভয়দিকেই মানবের অনিষ্ট ও সমাজের অনিষ্ট। রাজ দণ্ডাদিমাত্রের উপর নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্য করাইবার চেষ্টা করিলে এইরূপ বিষময় ফল পদে পদে ঘটিবে—যে মানবকে স্বাধীন ও উন্নতিশীলজীব জ্ঞানে সর্ব্ব জীবের শ্রেষ্ঠ বলা হইতেছে, সেই মানব সকল জীব অপেক্ষা হতভাগ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। পশুর পক্ষে স্বাভাবিক বৃত্তি চরিতার্থ ও সুখলাভের চেষ্টা সুখের কারণ হইলেও মানবের পক্ষে তাহা কেবল দুঃখের কারণ হইবে। পশ্বাদির যেরূপ প্রবৃত্তি তদনুসারে কার্য্য করাই তাহাদের ধর্ম্ম, সুতরাং তাহাদের কোনও শাসনের প্রয়োজন নাই—স্বাভাবিক দৃঢ় নিয়মই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু মানব যখন সেরূপ নহে, অর্থাৎ যখন যে প্রবৃত্তি দ্বারা সে চালিত হয় তদনুসারে কার্য্য করা তাহার পক্ষে যখন উচিত নয়—যখন মানব নিয়ত দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, অর্থাৎ পরস্পর বিপরীত প্রবৃত্তি সকল মানবকে যখন নিয়ত পরস্পর বিপরীত পথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে তখন মানবের চালক কে হইবে? প্রকৃতি যখন তাহার চালক হইল না—অর্থাৎ যে প্রাকৃতিক বৃত্তি তাহাকে পরদার হরণে প্রবৃত্তি দেয় সেই প্রাকৃতিক বৃত্তিই আবার যখন তাহাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে প্রবৃত্তি দেয় তখন মানব কি করিবে? কোন্ প্রাকৃতিক বৃত্তির মতানুসারে চলিবে? এবং কি প্রকারেই বা তাহার সামঞ্জস্য করিবে। ঐ সামঞ্জস্য করিতে গেলে যে বলের প্রয়োজন

সে বল কোথা হইতে আসিবে? যদি ধর্ম্ম বলের ন্যায় কোনও দৃঢ় বল মানবের না থাকে তাহা হইলে কি মানবের ভয়ানক বিড়ম্বনা নহে? মানব স্বভাবানুসারে চলিতে পারিবে না—অথচ স্বভাবকে অতিক্রম করিবার উপযুক্ত কোনও দৃঢ়শক্তি মানবের থাকিবে না তবে মানবের উপায় কি? কেবল সামাজিক বা রাজকীয় শাসনই কি মানবকে প্রবৃত্তিচরিতার্থজনিত সুখ সাধনে পরাঙ্মুখ করিবার পক্ষে যথেষ্ট? উহা দ্বারা কি কোনও বল সঞ্জাত হইতে পারে? কখনই নয়। কিন্তু ধর্ম্ম একটী প্রবল বল ঐ বল সহায়ে মানব দ্বন্দ্ব-সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে।

ক্রমশঃ

বেদরহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এইরূপে সর্ব্বত্র বিধি আর নিষেধ পরস্পর সাতিশয় বিরোধী বস্তু হইলেও পুরুষ বিশেষে তাহাদের সুব্যবস্থা হইয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন—বেদমন্ত্রে কত পাঠ ভেদ আছে, তাহার জন্য মন্ত্রের কখনই অপ্রামাণ্য হয় না। শাখাভেদে পাঠভেদের ব্যবস্থা থাকাতে এক বেদমন্ত্রের কত প্রকার আকার পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। বেদমন্ত্রের পাঠভেদের কথা আমাদের বঙ্গদেশীয় বেদানুভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও অবগত আছেন।

যজুর্ব্বেদে তৈত্তিরীয়রা একটী বেদমন্ত্রে "বায়বস্থ" (১) এই স্থানে

---

(১) "ইষেত্বা। ঊর্জ্জেত্বা। বায়বস্থ। দেবোবঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণ আপ্যায়ধ্বমঘ্ন্যা ইন্দ্রায় ভাগং প্রজাবতী রনমীবা অযক্ষ্মা মা যস্তেন ঈশত মাঘশংসো ধ্রুবা

"পায়বস্থ" পাঠ করিয়া থাকেন। বাজসনেয়ীরা ঐ বেদমন্ত্রে "উপাযরস্থ" এই ভাগটুকু পাঠ করেন না। বরং শতপথ ব্রাহ্মণে ঐ ভাগটুকু অনুবাদ করিয়া নিরাকৃত হইয়াছে। তৈত্তিরীয়েরা "সুক্তবাগ্" এই বেদমন্ত্রে অপর শাখার পাঠ নিরাকরণ করিয়া অন্য প্রকার পাঠ ধরিয়া ঐ মন্ত্রের পাঠ করিয়া থাকেন। ("সুপাবসানা চ স্বধ্যবসানাচ" এই বেদমন্ত্রের মধ্যে যে যজমান এইরূপ প্রকারে মন্ত্রপাঠ করিবেন, তিনি জগতে প্রমা (জ্ঞান) লাভ করিবেন।) এইরূপে বেদমন্ত্রের পাঠক্রম নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। আবার উক্ত বেদমন্ত্রটীর পাঠান্তরে এরূপ উপদেশ আছে যে, কখন কখন "সুপচরণাচ স্বধিচরণাচ" এই ভাবে মন্ত্রপাঠ করিতে হইবে। যে স্থানে যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্ত্তা পুরুষ যেমন হইবেন, তদনুসারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রত্যেক বিধিতে এইরূপ পুরুষ বিশেষে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে।

আদৌ যাঁহারা কখন মীমাংসা দর্শনের বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন নাই, তাঁহাদের কেবল সেই স্থানেতেই 'ষোড়শি' গ্রহণাদির দোষ শোভা পাইয়া থাকে। পূর্ব্ব মীমাংশাতে (মীমাংশা দর্শনে) দশম অধ্যায়ের অষ্টমপাদে কিরূপে ষোড়শি গ্রহণ করিতে হয়, কিরূপে ষোড়শি গ্রহণ করিতে নাই, তাহার বিষয় বিশদরূপে নির্ণীত হইয়াছে। (কোন্ সময়ে কোন্ কর্ম্ম করিলে কিরূপ ফল হয়) এই সমুদয় সিদ্ধির জন্য প্রত্যেক যজ্ঞের যজ্ঞকার্য্য জন্য একটী অপূর্ব্ব (অদৃষ্ট) ঐ মীমাংসা দর্শনে দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে নির্ণীত হইয়াছে।

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত উত্তরমীমাংসাগ্রন্থে (বেদান্ত দর্শনে) প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থপাদে একটী (১) সূত্র আছে, সেই সূত্রে জগৎকারণ পরমাত্মা, আকাশাদি বস্তুরও কারণ বলিয়া উল্লিখিত হওয়াতে বেদের বিবাদ বিসম্বাদ নিরাকরণ হইয়াছে। সুতরাং তৈত্তিরীয় উপনিষদে "অসদেব ইদমেক

অস্মিন্ গোপতৌ স্যাত বহ্বীঃ। যজমানস্য পশূন্ পাহি। (যজুর্ব্বেদ। ১। ১। ১।)

(১) "ব্যপদিষ্টোক্তেঃ।"

একাগ্র আসীৎ” এই স্থানে যে অসৎশব্দ আছে, তাহার অর্থ শূন্য নহে, কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাত্মা পরমেশ্বরের যে কোনরূপ অবস্থাব্যক্ত ছিল না, তাহাই কেবল ঐ ব্রহ্মবিধি বাক্য দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। ভগবান্ বাদরায়ণ বেদান্তদর্শনে এই মতটীর পোষকতা করিবার জন্য একটী সূত্র করিয়াছেন (১) অতএব তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়ীগণ ঐ “অসৎ” শব্দের ছল করিয়া পরমেশ্বরের অস্তিত্ব যে নিরাকরণ করিবেন—তাহা করিতে পারিবেন না। কারণ, ঐ ‘অসৎ’ শব্দের অর্থ পরমেশ্বরের নামরূপশূন্য অবস্থা। সুতরাং কোন অবস্থা বা ধর্ম্ম দ্বারা বাক্যটীর শেষ হওয়াতে, শূন্য অর্থ না করিয়া নামরূপবিহীন অবস্থারূপে অবশ্য ব্যাখা করিতে হইবে।

যদি তৈত্তিরীয় উপনিষদে এবং পরিশেষে বেদব্যাস কৃত উত্তরমীমাংসা দর্শনে (বেদান্ত গ্রন্থে) “অসৎ” শব্দ দ্বারা শূন্য অর্থ না বুঝাইয়া পরমাত্মা পরমেশ্বরের নামরূপশূন্য অবস্থা প্রকাশিত হইতে পারে; তবে মহামুনি জৈমিনি পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনে (মীমাংসা গ্রন্থে) নোদনাসূত্রে (২) (ধর্ম্মবিষয়ে সমস্ত বিধিবাক্য প্রমাণ) এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ঔৎপত্তিক (উৎপত্তি সম্বন্ধীয়) সূত্র দ্বারা কেন তাহার প্রামাণ্য সংস্থাপন করিবেন না? ঐরূপ মহর্ষি বেদব্যাস বেদান্ত দর্শনে সমস্ত বেদান্ত বাক্যের একমাত্র পরব্রহ্মে তাৎপর্য্য ও প্রামাণ্য সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা করিয়া পরস্পরের সর্ব্বত্র সমন্বয় আছে বলিয়া দুইটী সূত্র করিয়াছেন। প্রথম সূত্র দ্বারা প্রতিজ্ঞা করেন এবং দ্বিতীয় সূত্র দ্বারা স্বমত সমর্থন করেন। বস্তুতঃ তুমি মীমাংসা দর্শন জান না, তোমার পক্ষে পূর্ব্বে যে স্থাণু আর অন্ধের বিষয় বলা হইয়াছিল, তাহা কিছুতেই পরিহার করা যায় না। মীমাংসা দর্শন না জানিলে বিধিভাগের উপর অপ্রামাণ্য দোষ অর্পণ করিতে হয়, আর যে ব্যক্তি মীমাংসা জানেন, তাঁহার পক্ষে কোন দোষের আশঙ্কাই নাই। অন্ধ, স্থাণু দেখিতে পায় না বলিয়া স্থাণুর দোষ হইতেই পারে না। অতএব এক্ষণে আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, “বেদের মধ্যে যে সকল বিধিভাগ আছে, তৎ—

(১) “অসদ্ব্যপদেশান্নেতিচেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ।

(২) “নোদনালক্ষণার্থো ধর্ম্মঃ।”

সমুদয় যে অত্যন্ত প্রামাণিক, তাহা একরূপ স্থিরীকৃত ও প্রমাণিত হইতে পারে কি না।

বেদমন্ত্রের বিধিভাগ যে অত্যন্ত প্রামাণিক, তাহা মহামুনি জৈমিনি মীমাংসা দর্শনে অনেক যত্নে সমর্থন করিয়াছেন। আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র, সুতরাং বিধিভাগের প্রামাণিকত্ব সমর্থন করিবার জন্য সূত্রাদি সকল উদ্ধৃত হইল না।

অতএব বেদ মধ্যে যে, মন্ত্র, বিধি, আর অর্থবাদ এই তিনটী ভাগ আছে; তাহাদের একণে অপ্রামাণ্য হইতে পারে না—অপ্রামাণ্য হইবার কারণ সকল থাকিতেও পারে না। প্রত্যুত ঐ তিনটী ভাগ একণে সমুদয় অর্থের বোধক হওয়াতে উহাদের স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ স্বীকার করিতে হয়, এবং এইরূপে সমুদয় বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়।

তথাপি বেদ পৌরুষেয় বলিয়া প্রতারক বাক্যের মতন পুনরায় উহার অপ্রামাণ্য উপস্থিত হয়। (১) বেদ যে পৌরুষেয়, মহানুভাব জৈমিনি, মীমাংসা দর্শনের প্রথমপাদে পূর্ব্বপক্ষ করিয়া তাহার সূত্র সকল রচনা করিয়াছেন। কঠোপনিষদাদি গ্রন্থে যেরূপ ভাবে বেদবাক্য কথিত হইয়াছে, তাহা সাধারণ বাক্যের মতন। সুতরাং যদি বেদবাক্য অন্য বাক্যের মতন হইল, তবে বেদবাক্য অবশ্যই পৌরুষেয়। তবে বেদের আর একটী নাম "প্রবচন"। যদিচ সাধার বাক্যের মতন আপাততঃ বেদবাক্যে অশ্রদ্ধা হয় সত্য, তথাপি সেই সকল বাক্য সর্ব্বাপেক্ষা গভীর ওজস্বী, মধুর এবং নূতনত্বে পরিপূর্ণ হইয়া "প্রবচন" এই নামে কথিত হইয়াছে। সুতরাং আর বেদবাক্যকে ইতর বাক্য বলিয়া ঘৃণা করিতে পারা যায় না। ফলতঃ ইতর বাক্যত্বের কথা আর মুখ দিয়া বলাও যাইতে পারে না। একেত এইরূপ গভীরবাক্য—দ্বিতীয়তঃ বেদকর্ত্তা অনাদি অনন্তকাল সর্ব্ব জীবের অবোধ্য। অতএব বেদবাক্য যে অপৌরুষেয়, তাহা কে না মানিবেন? কে না বিশ্বাস

(১) "পৌরুষেয়ং ন বা বেদবাক্যং স্যাৎ পৌরুষেয়তা।
কাঠকাদিসমাখ্যানাৎ বাক্যত্বাচ্চান্যবাক্যবৎ॥
সমাখ্যানং প্রবচনং বাক্যত্বং তু পরাহতম্।
তৎকর্ত্রনুপলম্ভেন স্যাৎ ততোঽপৌরুষেয়তা॥

করিবেন? বস্তুতঃ যেমন প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া অম্লান মুখে সকল সম্প্রদায়ের লোকে একজন জগতের কর্ত্তা আছেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; তদ্রূপ বেদবাক্য সকল—বেদের বিষয় সকল ক্ষণকাল সমাহিত মনে পর্য্যালোচিত হইলে বেদকে ঈশ্বর বাক্য এবং বেদকর্ত্তাকে ঈশ্বর না বলিয়া কেহই থাকিতে পারে না।

ক্রমশঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততং।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥১৭॥
অন্তবন্তইমে দেহানিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্‌যুদ্ধস্ব ভারত ॥১৮॥
যএনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতং।
উভৌ তৌ ন বিজানীতোনায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥১৯॥
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজোনিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণোন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২০॥
বেদাবিনাশিনং নিত্যং যএনমজমব্যয়ং।
কথং সপুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কং ॥২১॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে। ২৪।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ২৫।

যিনি এই সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন; তাঁহার বিনাশ নাই; কোন ব্যক্তি সেই অব্যয় পুরুষকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন, এই সকল শরীর অনিত্য, কিন্তু যিনি শরীরী তিনি নিত্য অবিনাশী ও অপ্রমেয় তাঁহার বিনাশ নাই; অতএব তুমি যুদ্ধ কর। যিনি মনে করেন, ইনি অন্যকে বিনাশ করে এবং যিনি মনে করেন, অন্যে ইহাঁকে বিনাশ করেন তাঁহারা উভয়েই অনভিজ্ঞ; কেন না, ইনি কাহারেও বিনাশ করেন না এবং ইহাঁকেও কেহ বিনাশ করিতে পারে না। ইহাঁর জন্ম নাই মৃত্যু নাই; ইনি পুনঃপুন উৎপন্ন বা বর্দ্ধিত হন না; ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ; শরীর বিনষ্ট হইলে ইনি বিনষ্ট হন না। যে পুরুষ ইহাঁরে অবিনাশী, নিত্য, অজ, ও অব্যয় বলিয়া জানেন, তিনি কি কাহারেও বধ করেন? না বধ করিতে আদেশ করেন? ইনি শস্ত্রে ছেদিত, অগ্নিতে দগ্ধ, জলে ক্লেদিত বা বায়ুতে শোষিত হন না; ইনি নিত্য, সর্ব্বগত, স্থিরস্বভাব, অচল ও অনাদি, অতএব অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, ও অশোষ্য। ইনি চক্ষুরাদির অগোচর, মনের অবিষয়, ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। অতএব তুমি ইহাঁকে এবম্প্রকার অবগত হইয়া অনুশোচনা পরিত্যাগ কর।

ইহার মর্ম্ম এই যে দেহ মানবের সর্ব্বস্ব নহে, অথবা কিছুই নহে। মানবের কেন, সমগ্র জীবেরই দেহ তদ্‌জ্ঞাপক পদার্থ নহে, উহা জীবের প্রকাশক অবস্থা মাত্র। যাহা প্রকৃত জীব পদবাচ্য অর্থাৎ যাহা 'আমি' বাচ্য তাহা স্বতন্ত্র পদার্থ বা শক্তি—সে শক্তির নাশ নাই; তাহার দেহান্তর প্রাপ্তি অর্থাৎ প্রকাশকরঅবস্থান্তরপ্রাপ্তি হয় বটে কিন্তু তাহার নাশ হয় না। তুমি আত্মীয়দিগের বিনাশের জন্য দুঃখ করিতেছ—অবস্থান্তরপ্রাপ্তির জন্য দুঃখ করিতেছ না, অতএব সেরূপ দুঃখ করিবার কো কারণই নাই

বলিতে হইবে। কেন না কোন জীবেরই নাশ নাই সুতরাং তোমার আত্মীয়-বর্গেরও নাশ হইবে না।

পরে বাসুদেব বলিলেন, যদি তুমি ইহা স্বীকার না কর।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতং।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি। ২৬।
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি। ২৭।

যদি ইনি সর্ব্বদা জন্ম গ্রহণ ও মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহারে জাত ও মৃত বোধ কর, তাহা হইলেও ইহাঁর নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্যই নয়; কেন না জাত ব্যক্তির মৃত্যু ও মৃত ব্যক্তির জন্ম অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য; অবশ্যম্ভাবী বিষয়ের জন্য শোকাকুল হওয়ায় ফল কি?

অর্থাৎ যদি জীবের নিত্যত্ব স্বীকার না কর, যদি বল জন্মই সকলের আদি ও মৃত্যুই সকলের শেষ তাহা হইলেও দুঃখের কোন কারণ নাই। কেন না যখন জন্ম হইলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী তখন মৃত্যুতে দুঃখ করিয়া ফল কি? যাহা নিশ্চয় ঘটিবে—যাহা নিবারণ করিবার উপায় হইবার যো নাই, তাহার জন্য দুঃখ করিলে কি হইবে? অতএব জীব নিত্যই হউক বা অনিত্যই হউক—মৃত্যু দেহান্তর প্রাপ্তি মাত্রই হউক বা অন্তই হউক, তাহার জন্য দুঃখ করার কোন ফল নাই সুতরাং অকর্ত্তব্য। কিন্তু বাস্তবিক মৃত্যুই জীবের অন্তিমঅবস্থা নহে।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা। ২৮।
আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।
দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি। ৩০।

ভূতসকল পূর্ব্বে অব্যক্ত ছিল, পরেও অব্যক্ত হইবে কেবল মধ্যকালে অর্থাৎ জন্মমরণের অন্তরাল সময়ে প্রকাশিত হয় মাত্র; অতএব তদ্বিষয়ে

পরিদেবনা কিন্তু কেহ ইঁহাকে বিস্ময়ের সহিত দর্শন করেন; কেহ ইঁহাকে বিস্ময়ের সহিত বর্ণনা করেন, কেহ বিস্ময়ের সহিত ইঁহার বিষয় শ্রবণ করেন; কেহ শ্রবণ করিয়াও বুঝিতে পারেন না। দেহী সর্ব্বদা সকলের দেহে অবধ্যরূপে অবস্থান করেন; অতএব কোন প্রাণীর নিমিত্ত শোক করা উচিত নয়।

যদি বল স্বীকার করিলাম কাহারও জন্ম ও মৃত্যু নাই। কিন্তু অবস্থান্তর-প্রাপ্তিই যখন মৃত্যুরূপে গণ্য, তখন অবস্থান্তরপ্রাপ্তিকেই দুঃখের কারণ বলিতে হইবে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি, ভ্রান্তি পরিহার করাই কর্ত্তব্য। বাস্তবিক অবস্থান্তরপ্রাপ্তিই যদি দুঃখজনক হয়, তাহাহইলে বাল্যাবস্থার পর যৌবনাবস্থা এবং যৌবনাবস্থার পর বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও দুঃখ করিতে হইবে। কেন না উহাও অবস্থান্তরপ্রাপ্তি বিশেষ। কিন্তু সেরূপ অবস্থান্তর যখন দুঃখের কারণ নয়, তখন দেহান্তর প্রাপ্তিরূপ অবস্থান্তর হইলে দুঃখ করিতে হইবে কেন? যদি বল যখন দেহই আমাদের আত্মীয়াদিসম্বন্ধজ্ঞাপক তখন যে দেহ আমাদের প্রিয় তাহার নাশে দুঃখ হইবে না কেন? আপনার সময় না হয় প্রকৃত নাশ হইল না মনে করিয়া মৃত্যুকে ভয় করিলাম না, কিন্তু যাহারা আমার আত্মীয় তাহাদের অভাবে আমার দুঃখ হইবে না কেন? তাহারা যে আমার আত্মীয় সে ত বর্ত্তমান দেহ বিশিষ্ট বলিয়া? মানিলাম দেহের নাশ হইলে সে দেহীর নাশ হইল না নূতন দেহ বিশিষ্ট হইল মাত্র। কিন্তু নূতন দেহ প্রাপ্ত হইয়া ত সে আমার কোন হিত করিবে না! আত্মীয়বর্গের কথা দূরে থাকুক সামান্য একটা বৃক্ষের দেহান্তর আমার কষ্টের কারণ। স্বীকার করিলাম যে, বৃক্ষটার নাশ হইল না, অন্য দেহ ধারণ করিল, কিন্তু আমি ত উহার ফলভোগে বঞ্চিত হইলাম। তাহা যদি হইল তবে তাহার ও আত্মীয়বর্গের দেহ বিনাশে দুঃখিত হইব না কেন? দেহই যখন জীবের পরিচয়ের একমাত্র কারণ ও দেহই যখন আত্মীয়নাআত্মীয় জ্ঞাপক তখন তাহার নাশই যে দুঃখের কারণ হইতেছে। অর্থাৎ যে জীব আমার আত্মীয় ছিল, তাহার দেহান্তর প্রাপ্তি হইলে সে বিনষ্ট না হইয়া অন্য দেহাশ্রিত হইলেও সে আমার আত্মীয় থাকিল না—সুতরাং দেহ নাশেই

আমার আত্মীয়ের নাশ হইল বলিতে হইবে। আত্মীয় ও হিতকারক পদার্থের অভাবই যখন আমাদের ক্ষতিকর তখন তাহাদের দেহান্তর প্রাপ্তি কেন দুঃখকর হইবে না ? তাই বলিতেছেন,—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥১৪॥
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥১৫॥

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের যে সম্বন্ধ, তাহাই শীত উষ্ণ ও সুখ দুঃখের কারণ ; সেই সম্বন্ধ কখন উৎপন্ন হয়, কখন বিনষ্ট হয় ; অতএব তুমি এই অনিত্য সম্বন্ধসকল সহ্য কর। এই সম্বন্ধসকল যাহারে ব্যথিত করিতে পারে না, সেই সমদুঃখসুখ ধীর পুরুষ মোক্ষ লাভের যোগ্য।

ইহার মর্ম্ম এই যে জগতে প্রিয়াপ্রিয়, আত্মীয় অনাত্মীয় জ্ঞান মাত্র। প্রিয়ই হউক বা অপ্রিয়ই হউক কিছুই চিরকাল থাকিবে না। যেমন শীত বা উষ্ণ প্রিয় হউক বা অপ্রিয় হউক চিরকাল থাকে না, শীতের পর উষ্ণ ও উষ্ণের পর শীত আসিবে, সেইরূপ আত্মীয় ও অনাত্মীয়গণও চিরকাল থাকিবে না। শীত ও উষ্ণাদি জ্ঞান যেরূপ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান মাত্র প্রিয়াপ্রিয় জ্ঞানও সেইরূপ ইন্দ্রিয়জ মাত্র। যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ হয় তাহারই ক্রিয়ার চেষ্টা করা কদাপি সম্ভব ও উচিত হইতে পারে না। কেন না তাহা হইলে ধৈর্য্য ও অভ্যাস প্রভৃতির সৃষ্টি হইত না। ইন্দ্রিয় যাহা চাহিবে তাহা প্রদান করা যদি সম্ভব হইত তাহা হইলে নিয়ত অবস্থার পরিবর্ত্তন হইত না এবং তাহা যদি আবশ্যক হইত তাহা হইলে ধৈর্য্য ও অভ্যাসের প্রয়োজন হইত না। অতএব চেষ্টা করিলে যাহা থাকিবে না, তাহা থাকিল না বলিয়া—ইন্দ্রিয় যাহা চাহে তাহা পাইলাম না বলিয়া দুঃখ করা কদাপি বিধেয় নহে। ধৈর্য্য দ্বারা ঐ ইন্দ্রিয় বিকার প্রশমিত করিতে হইবে। ঈশ্বর ইন্দ্রিয় ও রিপু দমন করিবার জন্যই মানবকে ধৈর্য্যাদি বিরুদ্ধ শক্তি দিয়াছেন। অতএব অর্জ্জুন ! অসম্ভব বিষয়ের জন্য শোক করিও না ধৈর্য্য অবলম্বন কর।

ক্রমশঃ

বেদরহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভগবান্ বেদব্যাস উত্তরমীমাংসাগ্রন্থে (বেদান্তদর্শনে) "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই সূত্রে বেদকে ব্রহ্মকার্য্য এবং ব্রহ্মকে সর্ব্বকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম ঋক্‌বেদাদি শাস্ত্রের কারণ,—ইহাই সূত্রের অর্থ। বেদ মনুষ্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় নাই, এরূপ স্বীকার করিলেই যে, বেদ পৌরুষেয় হইবে, তাহা হইতে পারে না। কারণ, মহামুনি বেদব্যাস বেদান্তদর্শনে দেবতাধিকরণে সূত্র করিয়াছেন যে, ব্যবহার (সাংসারিক) দশাতে আকাশাদি পদার্থ অনিত্য হইয়াও যেমন নিত্যবৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ বেদ (মনুষ্যকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় নাই বলিয়া) এই অভিপ্রায়ে পৌরুষেয়ত্ব থাকিলেও বাস্তবিক বেদ অপৌরুষেয়। অতএব বেদ নিত্য। বেদ যে নিত্য এ বিষয়ে শ্রুতি এবং স্মৃতি জাজ্বল্যমান প্রমাণ। শ্রুতি যথা—(১) অবিকৃত এবং নিত্য বাক্য দ্বারা বেদ রচিত হইয়াছে। স্মৃতি যথা—(২) "স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ প্রজাস্রষ্টা ব্রহ্মা, যাহার আদি নাই—যাহার বিনাশ নাই—যাহা নিত্য, এরূপ বাক্য প্রয়োগ করেন; তাহাতেই বেদ রচিত হয়। অতএব আপনারা এক্ষণে প্রণিধান করিয়া দেখুন, বেদের একজন কর্ত্তা থাকাতে পূর্ব্বে যে দোষ উদ্‌ঘোষিত হইয়াছিল, তাহা আর থাকিল না—প্রত্যুত মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক বেদ যে প্রামাণিক, নির্ব্বিঘ্নে তাহাই প্রমাণিত হইল।

---

(১) "বাচা বিরূপনিত্যয়া।"

(২) "অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।"

কেহ কেহ এ স্থলে আশঙ্কা করিয়া থাকেন, যে মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মককে বেদ বলিলে বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের স্বরূপ নির্ণয় করা কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু আমরা বলি, মন্ত্র ব্রাহ্মণের স্বরূপ নির্ণয় করা কঠিন নহে, বরং অতি সহজ ব্যাপার। মীমাংসাদর্শনে দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদে, সপ্তমও অষ্টম অধিকরণে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে। বেদকে মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। বেদের মধ্যে পূর্ব্বে মন্ত্র কথিত হইয়াছে, তাহা হইলে মন্ত্র ভিন্ন অবশিষ্ট যে বেদ ভাগ তাহার নাম ব্রাহ্মণ। ভগবান্ জৈমিনি মীমাংসাদর্শনে মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণের জন্য দুইটী সূত্র রচনা করিয়াছেন। (১) যথা—"তাহার প্রকাশক যে সকল বাক্য আছে, সাম্প্রদায়িকেরা তাহাকেই "মন্ত্র" সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।"

(২) "মন্ত্র ব্যতিরিক্ত যে অবশিষ্ট ভাগ থাকে, তাঁহারা তাহাকে ব্রাহ্মণ-ভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।"

কেহ কেহ এই স্থানে অন্য এক আপত্তি করিয়া থাকেন যে, মন্ত্র ব্রাহ্মণ-ভাগ ব্যতিরিক্ত ইতিহাসাদি ভাগের কথা বেদ মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। (৩) ব্রাহ্মণ, ইতিহাস, পুরাণ, কল্প, গাথা এবং নারাশংসী এই সকল ভাগের কথা বেদে পঠিত হইয়াছে। এক্ষণে কথা এই, যদিচ বেদমধ্যে ইতিহাসাদির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে সত্য, তথাপি উহা কিছুই নহে। কারণ, বিপ্রপরিব্রাজক বলিলে যেমন প্রভেদ না বুঝাইয়া বিপ্রের সহিত পরিব্রাজকের অভেদ, অর্থাৎ যে বিপ্র সেই পরি-ব্রাজক এবং যে পরিব্রাজক সেই বিপ্র এইরূপ বুঝাইয়া থাকে, সেইরূপ ইতিহাস পুরাণাদি বেদের ব্রাহ্মণভাগ হইতে অতিরিক্ত নহে, ঐ সকল ব্রাহ্মণেরই অবান্তর ভেদ মাত্র। বস্তুতঃ বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, ইতিহাসাদি ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত।

---

(১) "তচ্চোদকেষু মন্ত্রাখ্যা।"

(২) "শেষে ব্রাহ্মণ শব্দ ইতি।"

(৩) "যদ্ ব্রাহ্মণানীতিহাসান্ পুরাণানি কল্পান্ গাথা নারাশংসীরিতি।"

ইতিহাস যথা—(১) "দেবতারা এবং অসুর সকল সম্যক্‌রূপে যত্নবান্ হইয়াছিল্ল"। পুরাণ যথা—"এই যে সমস্ত বস্তু দেখা যাইতেছে, পূর্ব্বে ইহা কিছুই ছিল না (২)। এই সকল বেদবাক্য জগতের পূর্ব্বাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান বস্তু পর্য্যন্ত প্রতিপন্ন করিয়া থাকে। সুতরাং অত্যন্ত আদিম অবস্থার কথা বলিয়া উহাদের নাম পুরাণ।

আরুণকেতুর চয়নপ্রকরণে কল্প কথিত হইযাছে। যথা—"ইহার পর যদি বলি (পূজোপকরণ) আহরণ করে," (৩) এই একটী কল্প। অগ্নিচয়ন স্থলে গাথা (ছন্দ) দ্বারা যে সকল সামবেদের মন্ত্র গান করা হয়, তাহার নাম গাথা। "মনুষ্যের বৃত্তান্ত ঘটিত যে সকল ঋক্‌মন্ত্র তাহার নাম নারাশংসী।"

অতএব বেদমধ্যে মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণভাগ হইতে অতিরিক্ত অন্য আর কোন ভাগ নাই। বরং ইতিহাসাদি স্থলে কেবলমাত্র মন্ত্রভাগ এবং ব্রাহ্মণভাগের স্বরূপ প্রকটিত হইয়া থাকে। সুতরাং এক্ষণে বলা যাইতে পারে যে, মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ এই দুই ভাগই বেদ। বেদের মন্ত্র ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য ভাগ না থাকাতে বেদের লক্ষণ ও প্রমাণ সম্বন্ধে আর কাহারও আপত্তি থাকিল না—নির্ব্বিবাদে, সুন্দররূপে বেদ, বেদের লক্ষণ ও প্রমাণ সকল প্রাতপন্ন করা হইল। তবে যাঁহারা বুঝিয়াও বুঝিবেন না—মানিয়াও মানিবেন না—তাঁহাদের কাছে একটী মাত্র কথা এই যে, শুষ্ক তর্ক করিয়া সত্য বস্তুর অপহ্নব সাধনে কৃতসঙ্কল্প হওয়া ভদ্রতার বিরুদ্ধ। মহামুনি বেদব্যাস শারীরক সূত্রে "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" এই সূত্র দ্বারা তর্ক করিবার পথ রুদ্ধ করিয়াছেন। যিনি তর্ক করিবেন—তর্ক করিয়া মিথ্যা জয়ী হইবেন—তাহা অপেক্ষা আর একজন তার্কিক থাকিলে তাঁহাকেও পরাস্ত হইতে হইবে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মক বেদের প্রামাণ্য স্থিরীকৃত হইয়াছে। এক্ষণে তাপনীয়-উপনিষদে মন্ত্ররাজপদে ষড়ঙ্গ বেদের অধ্যয়ন করিবার প্রথা

(১) "দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্।"

(২) "ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ।"

(৩) "কল্পোঽত ঊর্দ্ধং যদি বলিং হ রেৎ।"

যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার জন্য বেদাঙ্গের উপযোগিতা সম্বন্ধে অদ্য সমালোচনা করা যাইতেছে। বেদ দ্বারা বেদের প্রামাণ্য স্থিরীকৃত হইলেও শিক্ষা কল্পাদি ছয়টী বেদাঙ্গের অধ্যয়ন করা অগ্রে আবশ্যক হইয়া থাকে। বেদাঙ্গে ব্যুৎপত্তি না হইলে কিছুতেই মূলবেদ অধ্যয়ন করিবার অধিকারী হওয়া যায় না। বস্তুতঃ বেদ বলিলেই যে বেদাঙ্গের সহিত বেদ বুঝায় তাহাও উপনিষদাদি বাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। এক্ষণে যথাক্রমে শিক্ষা কল্পাদির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

ক্রমশঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ।

পৌত্তলিকধর্ম্ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি সাকার উপাসনা সম্বন্ধে শাস্ত্রের লিখিত প্রমাণ দ্বিতীয় প্রবন্ধে প্রকাশ করিব। সুতরাং এই প্রবন্ধে কেবল শাস্ত্রীয় প্রমাণ লইয়া আলোচনা করিব। আমরা যে বিষয়ের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলাম তাহা যে অসামান্যরূপে গুরুতর, সুগভীর, ও দুস্তর তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগের অবলম্বিত পথ কোন ক্রমেই দুর্গম, তমসাচ্ছন্ন ও কণ্টকপূর্ণ নহে। যিনি ইচ্ছা করেন তিনি অনায়াসে তাহাতে বিচরণ করিতে সক্ষম হন। বিশেষতঃ আতপতাপিত ও ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিরা তৃপ্তীচ্ছু হইলে ঐ মহাপথ-প্রান্তবর্ত্তি জ্ঞানতরুর সুশীতল ছায়ায় স্নিগ্ধ ও সুস্বাদু অমৃত ফল সেবন করিয়া অমরত্ব লাভ করিতেও পারেন। সুতরাং যে স্বজাতীয় ব্যক্তিগণ জলবুদ্বুদবৎ ক্ষণোৎপন্ন স্বপ্নরাশির কুহকে পতিত হইয়া কুতর্ক রূপ কণ্টকদ্বারা সেই

এক মাত্র সনাতন সাধুসেবিত সত্য শাশ্বতপথ রুদ্ধ করতঃ উন্মার্গগামী হইয়াছেন, সেই অনুকম্পাই অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন ভ্রাতৃবর্গকে কিঞ্চিৎ শাস্ত্রালোক প্রদান করিতে অদ্য আমাদিগের এবম্বিধ দুরূহ দুরাশ বিষয়ের অবতারণা।

প্রথমতঃ আমাদিগের বুঝা কর্ত্তব্য 'প্রমাণ' কাহাকে বলি। তাহার আবশ্যকতাই বা কি? প্রমাণ সর্ব্বথা জ্ঞান সাপেক্ষ; জ্ঞান দ্বিবিধ—পরোক্ষ ও অপরোক্ষ। যে ঘটনা বা বিষয় আমাদিগের জ্ঞানের বিষয় হয়, যদি সেই ঘটনা বা বিষয় স্বয়ং ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি তৎসম্বন্ধে আমাদিগের অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ হইল। কিন্তু উক্ত ঘটনা বা বিষয় আমরা চক্ষে দেখিলাম না, কর্ণে শুনিলাম না, কোন ইন্দ্রিয় দ্বারায় তাহার বর্ত্তমানত্ব বোধ করিতে পারিলাম না, ইন্দ্রিয়ের সহিত অব্যবহিতরূপে তাহার সাক্ষাৎ হইল না, কেবল মাত্র অন্য প্রমুখাৎ শুনিলাম বা লিপিবদ্ধাকারে পাঠ করিলাম যে অমুক ঘটনা বা বিষয় অমুকস্থানে অমুক সময়ে ঘটিয়া ছিল। ঘটনাটির বিবরণ পাঠ করিলাম, ঘটনাটি স্বয়ং দেখিতে পাইলাম না, ঘটনাটির অব্যবহিত বিদ্যমান স্বরূপ দৃষ্টিগোচর হইল না। এরূপ স্থলে আমরা বলিতে পারি আমাদিগের তৎসম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান হইল। সমস্ত ভূতপূর্ব্ব ঐতিহাসিক ঘটনার জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান মাত্র। যে সমস্ত সমসাময়িক ঘটনাবলীর বিদ্যমানত্ব ইন্দ্রিয়সংযোগ না হয় তদ্বিষয়কে জ্ঞানও পরোক্ষ সংজ্ঞাধীন। সমস্ত শাস্ত্রীয় ঐশ্বরিক জ্ঞানও ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত।

(২) এইক্ষণে দেখা যাউক উভয়বিধ জ্ঞানের মধ্যে কোনটি প্রমাণসাপেক্ষ। অবশ্য অপরোক্ষ জ্ঞান সম্বন্ধে কোন প্রমাণ প্রয়োজন হয় না, কেন না আমরা স্বীয় ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা লাভ করিলাম, তাহার সত্য মিথ্যা বিচার আপনারা করিতে সক্ষম হই, অন্যের উপর নির্ভর বা অন্যের প্রতি বিশ্বাস করিতে হয় না। আমি ইংলণ্ডে স্বয়ং গিয়াছি, ইংলণ্ডের আকার ও অবস্থিতি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সুতরাং ইংলণ্ডের আকার ও অবস্থিতি কিরূপ এতদসম্বন্ধে অন্যের প্রমাণ আবশ্যক হয় না। এস্থলে 'প্রমাণ' শব্দের অর্থ এই যে, অন্যে যাহা বলিতেছে তাহা বিশ্বাস কর। অতএব প্রমাণের মৌলিক কারণ বিশ্বাস। এবং সেই বিশ্বাসাত্মক প্রমাণ কেবল অনুভব অর্থাৎ

পরোক্ষ জ্ঞান পক্ষে প্রযুজ্য। প্রমাণ অর্থাৎ বিশ্বাস ব্যতিরেকে পরোক্ষ জ্ঞান লব্ধ হয় না, এবং আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি মনুষ্যের প্রায় সমস্ত জ্ঞানই পরোক্ষ জ্ঞান। তাহা যদি হইল তবে প্রমাণ বা বিশ্বাস ব্যতিরেকে আমাদিগের গতি নাই। এমন কি জন্মাবধি পদে পদে অন্যের উপর বিশ্বাস করিয়া না চলিলে আমাদিগের প্রাণধারণ হইত কি না সন্দেহ, ধর্ম্মোপার্জ্জনের ত কথাই নাই। একথা সম্পাদক মহাশয়ের "আপ্তবাক্য" যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

(৩) প্রমাণের গুরু লঘু আছে বলিয়া বিশ্বাস সর্ব্বত্র সমান হয় না। কাহারও কথা অধিক বিশ্বাস্য, কাহারও কথা অপেক্ষাকৃত অল্প বিশ্বাসের যোগ্য। এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, কাহার কথা অধিক বিশ্বাস্য? ইহার উত্তর এত সহজ যে বাম দক্ষিণ-হস্তভেদ-জ্ঞান-শূন্য ব্যক্তিও বলিতে সক্ষম হইবে। কেননা জ্ঞানীলোকের কথা যে অধিক বিশ্বাস্য এ বিষয়ে কাহারও কিছুমাত্র সন্দেহ বা বিসম্বাদ নাই। এক্ষণে কথা এই যে,সেই জ্ঞানীপদবাচ্য কোন মহাপুরুষগণ? দর্শন, আগম, নিগমাদি মহা মহা জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ সকল কাঁহাদিগের প্রণীত। কোন মহোদয়গণের জ্ঞান পূর্ণ বাক্যের দ্বারা এই বিশাল, সনাতন, ভারতসমাজ চিরকাল শাসিত হইয়া আসিতেছে? ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালজ্ঞ কোন মহাত্মারা? অবশ্য সকল হিন্দু ভারত সন্তানগণ একস্বরে উত্তর করিবেন যে প্রাচীন আর্য্যমহর্ষিগণই তথাবিধ জ্ঞানী পদবাচ্য। যে জ্ঞানবৃত্তের ব্যাস প্রান্তদ্বয় এই অধিবাসিত ভূমণ্ডলের উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর সহিত সমপাতিত হইয়াছে, যাহার বিষুবরেখা প্রবৃদ্ধমান হইয়া সমস্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রাজ্য বেষ্টন করিয়াছে, সেই মহা জ্ঞান-বৃত্তের কেন্দ্র কোথায় স্থাপিত? সেই বৃহৎ ভুবনব্যাপী জ্ঞান মহিরুহের মূল ও বীজ কোন ক্ষেত্রে প্রোথিত? ইহাই তবে ভারতবাসীগণ সদর্পে ও সগর্ব্বে বলিতে পারেন এই প্রসিদ্ধ পুণ্যক্ষেত্র আর্য্যভূমিই,সকলের কেন্দ্র। ধন্য সেই ত্রিদশ বিহারালয় আর্য্যভূমি,যাঁহাকে অমরগণ ও গন্ধর্ব্ব কিন্নরাদি অন্যান্য স্বর্গবাসীগণ মর্ত্ত্যগামী হইয়া পবিত্র করিয়াছেন! ধন্য সেই ধর্ম্মক্ষেত্র যিনি মূর্ত্তিমান ধর্ম্মস্বরূপ দেবর্ষি,মহর্ষি, ও রাজর্ষি প্রভৃতি ত্রিকালদর্শী সর্ব্বহিতব্রত আর্য্যমহাত্মাদিগকে ধারণ

করিয়াছেন। যে আকর হইতে বেদাদি জ্ঞানকর্ম্ম-প্রয়োজক মূল শাস্ত্ররত্ন নিচয় উৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিক বিকীর্ণ করিয়া নিখিল মানবজাতির জ্ঞান ভাণ্ডারের পরিপোষণ করিয়াছে' ধন্য সেই জ্ঞানরত্নভূমি। অধিক আস্পর্দ্ধার বাক্য ইহার অপেক্ষা আর কি হইতে পারে, যে, যে ঈশ্বরোপাসনা ইদানীং সমস্ত পাশ্চাত্য সভ্যজগতের পরিত্রাণের উপায় বিধান করিয়াছে, সেই খৃষ্টধর্ম্ম এই প্রাচ্য আর্য্যভূমির অন্তঃসীমা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। আমরা জানি না উক্ত আধুনিকধর্ম্ম সনাতন মূল আর্য্যধর্ম্মের দূরবর্ত্তী শাখা কি না। আমরা জানিনা যে সেই প্রখ্যাতনামা খৃষ্টধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মা আর্য্য মহাত্মাদিগের সম্প্রদায় ভুক্ত কি না আমরা জানিনা। কপটবেশধারী খৃষ্টধর্ম্ম কৃষ্ণধর্ম্ম কি না। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যে জ্ঞানবীজ আর্য্য মহোদয়গণ পূর্ব্বকালে বপন করিয়াছেন, তাহাই এইক্ষণে পৃথিবীর সর্ব্বাংশে জ্ঞানারণ্যরূপে পরিণত হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। আমরা দেখিতেছি ভূতলে যত প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, সে সকল ধর্ম্মেরই জন্মস্থান পূর্ব্বমহাদেশ—যে মহাদেশে মহাত্মাগণ বাস করিতেন। অতএব কাহার মনে না সন্দেহ হইবে যে ধর্ম্মমাত্রই তপোবল ও ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন আর্য্যঋষি প্রভৃতি মূল ধর্ম্মের শাখা উপশাখাদি মাত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। অদ্য ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে সেই প্রাতঃস্মরণীয় উপাস্য ধার্ম্মিক ঋষিদিগের প্রবর্ত্তিত শাস্ত্রালোচনায় অগ্রসর হইয়াছি। ঈশ্বর কি এবং তাঁহার উপাসনা বা কিরূপে করিতে হয় আমরা তাহারকিছুই জানি না। এতদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রমাণ অপেক্ষা করে। এবম্বিধ ঋষি বাক্য সকল যদি আমরা প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ না করিব তবে কি প্রকারে আমরা ঈশ্বরজ্ঞ ও উপাসক হইব? কাহার বাক্য তাঁহাদের বাক্য অপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য হইবে! অবশ্য কাহারই নয়। সুতরাং আমাদিগকে তাঁহাদিগের বাক্য ঈশ্বরবাক্য ও অব্যর্থ বলিয়া মানিতে হইবে। “নহীশ্বরব্যহৃতয়ে কদাচিৎ পুষ্ণাতি লোকে বিপরীতমর্থম্”। • ঋষি বাক্য জগতে কখন বিপরীত অর্থ পোষণ করে না। অদ্য সেই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক আর্য্য মহাত্মা ঋষিগণের বাক্য নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া সাকার উপাসনা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিব। সকল ঋষি বাক্যেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে

দেহাভিমানী ব্যক্তিগণের পক্ষে ঈশ্বর উপাসনা এক প্রকার ভিন্ন দ্বিতীয় প্রকার নাই।

সাকার পরমেশ্বরস্য তদুপাসনায়াশ্চ প্রমাণং। যথা জমদগ্নি পুরাণং।

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কল স্যাশরীরিণঃ
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা॥

জ্ঞানময় দ্বিতীয়রহিত পরমেশ্বর নিরাকার হইয়াও নিরাকার স্বরূপের উপাসনা করা দেহাভিমানী ব্যক্তিগণের সম্ভব নহে ইহা বিবেচনায় সর্ব্বভূত সমদয়ত্বাদি গুণ হেতুক উপাসকগণের অভীষ্ট সাধান করিবার জন্য অচিন্ত্য ভাব পরিত্যাগ করিয়া চিন্তা সৌলভ্যার্থ সুচারু কর চরণাদি বিশিষ্ট স্বকীয় মনোহর মূর্ত্তি উৎপাদন করিয়াছেন অর্থাৎ সূর্য্যের ন্যায় ঘনীভূত তোজোময় মূর্ত্তিরূপে পরিণত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছেন।

যে যে সময়ে পরমেশ্বর ঘনীভূত তেজোময় মূর্ত্তিরূপে মহাত্মাগণের নয়ন গোচর হইয়া থাকেন, সেই সেই সময়ে তিনি উৎপন্ন বলিয়া কথিত হয়েন।

যথা মার্কণ্ডেয় পুরাণং।

লোকানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদালোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥

ঘনীভূত তেজোময় পরমেশ্বর শরীরে প্রমাণং যথা ভগবদগীতায়ং ভগবদুক্তিঃ।

ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্যচ॥

নিত্যানন্দময় যে পরমেশ্বর তাঁহার আমি প্রতিমা স্বরূপ অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় তেজোময় পরমেশ্বরের ঘনীভূত তেজ স্বরূপে আমি পরিণত হইয়াছি, এ কারণে পরমেশ্বর যে আমি আমাকে লোকেরা নয়নগোচর করিয়া নিজ নিজ অভীষ্ট সিদ্ধ করিতেছে।

পরমেশ্বর যে শরীর ধারণ করিয়াছেন এ বিষয়ে প্রমাণান্তর দৃষ্ট হইতেছে।

অগস্ত্য সংহিতায়াং যথা।

সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বময়ঃ সর্ব্বভূত হিতেরতঃ।
সর্ব্বেষামুপকারায় সাকারোহভূন্নিরা কৃতিঃ॥

পরমেশ্বরের শরীর ধারণ সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় প্রমাণান্তর দৃষ্ট হইতেছে। যথা।—

অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়যা॥

জন্মমরণ রহিত হইয়া এবং সকল ভূতের ঈশ্বর হইয়াও সত্ত্বরজস্তমো গুণপ্রভাবে নিজমায়া দ্বারা আমি বারম্বার উৎপন্ন হইয়া থাকি, অর্থাৎ আকৃতি ধারণ করিয়া অবতারাদি রূপে আবির্ভূত হইয়া থাকি।

যে সকল কার্য্যার্থ সময়ে সময়ে পরমেশ্বরের শরীর ধারণ হয় তাহার প্রমাণ।

যথা ভগবদ্গীতায়াং।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানি ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ্যায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

যে যে সময়ে বেদ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র বিলুপ্ত হয়, রাবণ প্রভৃতি নিশাচর ও কংসাসুরাদি দুরাত্মগণ হইতে যজ্ঞ ও তপস্যা প্রভৃতি সৎকার্য্যের বিঘ্ন হয়, সেই সেই সময়ে মীনাবতার কৃষ্ণাবতারাদি হইয়া বেদ রক্ষা করি এবং ঐ সকল দুরাত্মাদিগকে নিধন করিয়া মহর্ষি প্রভৃতি মহাত্মগণের যজ্ঞ তপঃ প্রভৃতি সৎকার্য্যের নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করাই।

এ বিষয়ে কেহ কেহ এই আপত্তি করেন যে ঐ সকল বচন দ্বারা পরমেশ্বর যে শরীর ধারণ করিয়াছেন ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে মাত্র কিন্তু সাকারের উপাসনা বিষয়ক শাস্ত্র নাই। এ আপত্তি অতি অগ্রাহ্য যে হেতু দেহাভিমানী ব্যক্তিরা সাকার পরমেশ্বরোপাসনার প্রধান অধিকারী। ঐ সকল

ব্যক্তিরা নিরাকারের উপাসনায় দুঃখমাত্র ভোগ করে, অভীষ্ট ফললাভ করিতে পারে না। ভগবদ্গীতাতে ভগবান স্বয়ং কহিয়াছেন। যথা :—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তাউপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতা স্তেমে যুক্ততমা মতাঃ ॥
যে ত্বক্ষর মনি র্দ্দেশ্য মব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থ মচলং ধ্রুবং।
সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্ব ভূতহিতে রতাঃ ॥
ক্লেশোধিকতরস্তেষা মব্যক্তাসক্ত চেতসাং।
অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভি রবাপ্যতে ॥

আমার প্রতি একাগ্রমনা হইয়া শাস্ত্রার্থে দৃঢ়তর বিশ্বাস করিয়া যে সকল ব্যক্তি সাকার ভাবে আমার পূজাকরে, ধ্রুব প্রহ্লাদাদির ন্যায় সেই সকল মহাত্মগণই আমার প্রধান ভক্ত। আর দেহাভিমান শূন্য হইয়া নিরাকার আমার উপাসনা যে ব্যক্তিরা করে তাহারা সামান্য ভক্ত। কিন্তু দেহাভিমান সত্ত্বে যাহারা নিরাকার ভাবে আমার উপাসনা করে তাহারা ক্লেশ মাত্র প্রাপ্ত হয় অভীষ্ট ফললাভ তাহাদিগের সম্পন্ন হয় না।

ক্রমশঃ

শ্রীযজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়, বি, এ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পাঠক! একাদশ হইতে ত্রিংশ পর্য্যন্ত শ্লোকের মর্ম্ম যেরূপ বুঝিলেন, তাহাতে আপনি কি তৃপ্ত হইয়াছেন? ভগবদ্গীতাকে কি এখন ধর্ম্মগ্রন্থ বলিতে আপনার প্রবৃত্তি হইয়াছে? আমাদের বোধ হয়, না—হয়ত আপনারা ভগবদ্গীতার প্রতি একবারে হতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। কেন না এ পর্য্যন্ত কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যাহা বুঝাইলেন তাহার মর্ম্ম এই যে, এই জগতে সমস্তই মরণ-শীল অথচ নিত্য—মৃত্যু সামান্য একটী দেশান্তর মাত্র, কাহারও মৃত্যু হইলে বিশ্বের কোনও অনিষ্ট হয় না—বিশ্ব হইতে কাহারও অস্তিত্ব লোপ হয় না। আত্মীয়ের মরণে আপনার অহিত হয় বটে, কিন্তু যখন চির কাল কিছুই থাকিবে না, তখন তাহার জন্য দুঃখ করা বৃথা। এই যুক্তি দেখাইয়া কহিতেছেন হে অর্জ্জুন! তুমি যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইও না—যাহা-দিগকে তুমি মারিবে মনে করিয়া ভাবিতেছ. তাহারা একদিন মরিবেই, চির কাল থাকিবে না—সুতরাং তাহাদের মরণে দুঃখের কোনও কারণ নাই। আপনি বলিবেন এই কি ধর্ম্মনীতি! মানুষ আপনা হইতে মরিবে বলিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিতে হইবে! নরঘাতী হওয়া কি তবে অধর্ম্ম নহে? ইহা যদি ধর্ম্ম হইল তবে আর জগতে অধর্ম্ম কি আছে? এই ধর্ম্মের উপদেষ্টা কি বাসুদেব ঈশ্বরাবতার? আর এই ধর্ম্ম প্রকাশক ভগবদ্গীতা কি হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ? তাহা যদি হয় তবে দূর হইতে হিন্দুধর্ম্মকে—ভগবদ্গীতাকে—আর্য্যধর্ম্মকে নমস্কার করি। এ ধর্ম্মের উপদেশ ত দস্যুপাথী কজ্জলাকে

দিয়াছিল। কজ্জলা বলিল রতন! তুই ডাকাতি করা মানুষ মারা কাব ছেড়ে দে, তখন রত্না কহিল আমি না মারলে, তারা যদি না মরত, মৃত্যু যন্ত্রণা না পেত, তা হলে আমি তাদের মার্‌তেম না। মানুষ মাত্রকে যখন মরতেই হবে, মৃত্যু যন্ত্রণা যখন পেতেই হবে, তখন আমি তাদের মারব না কেন? যাকে মারি সে সকল যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়, আর আমারও লাভ হয়, ইত্যাদি।

যে মতে দস্যু রত্নাপাথী ধার্ম্মিক হইতে পারে সে মত যদি উৎকৃষ্ট ও ধর্ম্মানুগত হইল, তবে জানি না অধর্ম্ম বস্তু কি? এইরূপ নানা কথা হয়ত পাঠক বলিবেন—বলিবেন কেন বলিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি অনেকে বলেন যে ভগবদ্গীতায় যাহা প্রকাশ তাহা যদি মানবের শিক্ষার বিষয় হয় তাহা হইলে জগতে আর মানবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য থাকে না। এ সকল আপত্তির প্রধান কারণ এই যে, বাসুদেব অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে, কাহারও বিনাশ নাই, অতএব বিনাশ জন্য দুঃখ করিও না—তুমি যুদ্ধ কর। এই কথাতেই তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছেন যে, ভগবদ্গীতা মানব প্রাণনাশে বিধি দিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা এরূপ বুঝিয়াছেন তাঁহারা যে ভগবদ্গীতার মর্ম্ম—ধর্ম্মের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারেন নাই তাহা বুঝেন নাই। তাঁহারা যদি বিশেষ বিবেচনা করিয়া বুঝেন তাহা হইলে ইহার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন।

বাস্তবিক বাসুদেব কোন স্থানেই বলেন নাই, যে, মানবের প্রাণ বধ করা পাপ নহে—পুণ্য। যে কএকটী শ্লোক পাঠ করা গেল তাহার কোন স্থানেই বৈধসূচক শব্দ নাই—ইহাই মাত্র আছে, যে, মৃত্যু অশোচ্য অর্থাৎ মানবের মৃত্যু শোকের বিষয় নহে। তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন অশোচ্য মৃত্যুর বিষয় ভাবনা করিয়া যুদ্ধরূপ কর্ত্তব্য কার্য্যে পরাঙ্মুখ হইও না। অর্থাৎ কাহারও মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে দুঃখিত হইও না। এই কথাতে যুদ্ধের ঔচিত্য বুঝাইতেছে বটে কিন্তু উহা যে সাধারণের কর্ত্তব্য নয় তাহাও বুঝা যাইতেছে। তিনি যেরূপ অবস্থায় যেরূপ ব্যক্তিকে উহা বলিতেছেন তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলেই উহার সত্যতা বুঝা যাইবে। কোন বিশেষ অবস্থা ও ব্যক্তি বিশেষে যে কার্য্য করা ব্যবস্থা হয় তাহা কি সকল

সময়ে সকলের প্রতি খাটে? অবশ্য বলিতে হইবে তাহা কখনই নয়। তাহা যদি না বল, যদি এরূপ বল যাহা কর্ত্তব্য তাহা সকল সময়ে সকলের পক্ষেই কর্ত্তব্য ও যাহা অকর্ত্তব্য তাহা সকল সময়ে সকল ব্যক্তির পক্ষে অকর্ত্তব্য তাহা হইলে তুমি ধর্ম্ম তত্ত্ব কিছুই বুঝ নাই। যদি ক্রোধ করা অধর্ম্ম ও ক্ষমা করা ধর্ম্ম হয় তাহা হইলে কি সকল সময়ে সকলের পক্ষে ক্রোধ অধর্ম্ম ও ক্ষমা ধর্ম্ম হইবে? কোন সময়েই কি কাহারও পক্ষে ক্রোধ ধর্ম্ম ও ক্ষমা অধর্ম্ম হইতে পারে না? যে সকল বৃত্তিকে তুমি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বল সে সকল কি সকল সময়েই নিকৃষ্ট? না যে সকল বৃত্তিকে তুমি উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি বল সে গুলি সকল সময়ে উৎকৃষ্ট? তাহা যদি হয় তবে নিকৃষ্ট বৃত্তির সৃষ্টি কেন? এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সহায়তা ব্যতীতই বা সংসার চলে না কেন? নিকৃষ্ট বলিয়া যদি ঐ সকল বৃত্তির এককালীন উচ্ছেদ সাধন করা যায় তাহা হইলে কি বিশ্বের অস্তিত্ব থাকে? কখনই না। তবে উহারা ত্যজ্য কি প্রকারে? কি প্রকারে উহাদের অধীন হইয়া কার্য্য করিলেই অধর্ম্ম হয় বলিবে? কি প্রকারে বলিবে ঐ সকল ঈশ্বরাভিপ্রেত নহে। যদি কাহারও অনিষ্ট বা প্রাণনাশ করা সকল সময়েই অবৈধ তবে হিংসা, ক্রোধ, সাবধানতা, প্রতিবিধিৎসা প্রভৃতি বৃত্তির সৃষ্টি হইয়াছে কেন? এবং রোগাদি স্বাভাবিক উপায়ে ভিন্ন অস্ত্রাদিতে মানবদেহ ছেদিত হয় কেন? যদি কোনও সময়েই মানবের অন্য দ্বারা নাশ প্রাপ্ত হওয়া ঈশ্বরের অনভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে কখনই মানব অস্ত্রাদি দ্বারা মানব নাশ করিতে পারিত না। এ ত গেল দূর যুক্তির কথা। নিত্য প্রত্যক্ষ বিষয় লইয়া বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি! যে ব্যক্তি তোমার প্রাণনাশে উদ্যত তাহার প্রাণনাশেও কি অধর্ম্ম হয়? যে দেশ বৈরী—যে দেশের স্বাধীনতা নাশে কৃতসঙ্কল্প তাহার প্রাণনাশেও কি অধর্ম্ম?

হে যুবক। তুমি কৃষ্ণকে নিন্দা করিতেছ—কিন্তু তবে তুমি যে লাক্ষ্মণ সেন দেশবৈরী যবনের সহিত যুদ্ধ না করিয়া প্রাণ ও আত্মীয় স্বজন লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার নিন্দা কর কেন? তাঁহাকে যে তুমি ভীত, দেশকলঙ্ক প্রভৃতি বলিয়া গালি দেও তাহার কারণ কি? তিনি মানব

ও আত্মীয়াদিনাশরূপ অধর্ম্ম করেন নাই বলিয়া তুমি তাঁহার প্রশংসা না করিয়া কি জন্য এত নিন্দা কর? আর তুমি যে চিতোরবীর প্রতাপসিংহকে এত উচ্চাসন প্রদান কর তাহারই বা কারণ কি? তিনি চির জীবন নিয়ত মানব প্রাণনাশ করিয়াছেন, তজ্জন্যই কি তাঁহার প্রশংসা কর না? কিন্তু মানবনাশ যখন অধর্ম্ম কর্ম্ম তখন তাঁহার প্রশংসা কর কি বলিয়া? এক্ষণে পাঠক বুঝিয়াছেন কি যে যুদ্ধ করা ও মানবের প্রাণনাশ করা সকল সময়ে অধর্ম্ম নহে, বরং সময় বিশেষ উহা পরম ধর্ম্ম। তাহা যদি হইল, তবে অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্তি দেওয়াতেই অধর্ম্ম করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে বল কি প্রকারে? এবং উহা দ্বারা সাধারণের পক্ষে ও সকল সময়ে যুদ্ধ ও মানব নাশ করার ঔচিত্য ব্যবস্থা দেওয়া হইল কি প্রকারে? প্রত্যুতঃ কৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি পদে পদে বলিতেছেন ধর্ম্মই মানবের সার—ধর্ম্মের জন্য মানব সমস্ত পরিত্যাগ করিবে, যদি আবশ্যক হয় তবে ধর্ম্মের জন্য নর-শোণিতপাত করিবে—আত্মীয়নাশ করিবে—আপনার প্রাণের প্রতিও দৃষ্টি করিবে না—মুখ্য লক্ষ যেন ধর্ম্মের দিকে থাকে। তাই তিনি অর্জ্জুনকে এই সকল কথা বলিয়াছিলেন; যুদ্ধই পরম ধর্ম্ম ও মানব প্রাণ নাশে কোন পাপ নাই তাহা বুঝাইবার জন্য বলেন নাই।

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য নবিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে। ৩১।

"তুমি স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আর এ প্রকার বিকম্পিত হইবে না; ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের আর শ্রেয়স্কর কর্ম্ম নাই।"

অর্জ্জুন প্রথমে কর্ত্তব্য বিবেচনায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষে বহুতর মানবের ও আত্মীয়বর্গের বিনাশ মহা পাপজনক ও এবম্বিধ আত্মীয়বর্গের অভাবে জীবিত থাকিয়া রাজ্যভোগ সুখাবহ নহে—প্রত্যুতঃ অনেক দুঃখেরই কারণ এই ভাবিয়া যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হয়েন। তাই কৃষ্ণ বলিলেন, যুদ্ধ যদি কর্ত্তব্য হয়, তবে ঈদৃশ কারণে কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে বিমুখ হওয়া উচিত নহে। তাহারই হেতু প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিতেছেন—

বিনাশ অত্যন্ত বিনাশ নহে এবং আত্মীয়াদির অভাবজনিত দুঃখ মোহজনিত ইন্দ্রিয়বিকার ও স্বার্থপরতা মাত্র। কেবল মাত্র ঐ সকল কারণে কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে বিমুখ হওয়া কদাপি উচিত নহে। তুমি ক্ষত্রিয়, ধর্ম্মযুদ্ধ করা তোমার কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য—সুতরাং আত্মীয়দিগের অভাবে সুখের ব্যাঘাত হইবে ভাবিয়া, অথবা ঈশ্বরসৃষ্ট মানব এককালে বধ্য নহে ভাবিয়া তোমার যুদ্ধরূপ কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে বিরত হওয়া কদাপি উচিত নহে।

বাস্তবিক সকল মনুষ্য কি সকল জীব চিরকাল বা কোন নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবে,ঈশ্বরের এরূপ অভিপ্রায় নহে। সেরূপ অভিপ্রায় হইলে নিত্য অগণিত মনুষ্য ও অপর প্রাণী অকালে কালকবলে নিপতিত হইত না। অতএব প্রাণীহত্যা বা প্রাণীকে কষ্ট দিলেই যে পাপ হইবে, এ কথা বলা যায় না; কেন না ঈশ্বর-কার্য্যরূপ ধর্ম্ম কার্য্য সাধন জন্য আবশ্যক হইলে পীড়া প্রভৃতি কারণে যেমন নিয়ত অকাল মৃত্যু হইতেছে যুদ্ধাদি দ্বারাও সেইরূপ হওয়া আবশ্যক। তাহাতে বিশ্বের অমঙ্গল নাই প্রত্যবায়ও নাই বরং উপকার ও পুণ্য আছে। কিন্তু সেরূপ কার্য্য স্বার্থসাধন মানসে করিলে প্রত্যবায় আছে। তাই বলিতেছেন—

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততোযুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি। ৩৮।

"সুখদুঃখ, লাভালাভ, জয়, পরাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলে পাপভাগী হইবে না।"

জয়লাভ বাসনায় বা সুখী হইব বাসনায় মানবনাশ করিলে পাপ হয় বটে, কিন্তু যদি সুখদুঃখ ও জয়াজয় তুল্যজ্ঞান করিয়া কেবল কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার জন্য প্রাণী বিনাশ কর তাহাতে কোন পাপ নাইপ্রত্যুতঃ পুণ্য আছে—

হতোবা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষসে মহীং।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ। ৩৭।

"সমরে বিনষ্ট হইলে স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে; জয়লাভ করিলে পৃথিবী ভোগ করিবে; অতএব যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থান কর।"

সত্য বটে তুমি যুদ্ধে জয়লাভ করিলে রাজ্যভোগ করিবে—কিন্তু সে আশার অধীন হইয়া তুমি যুদ্ধ করিবে না, মরিলেও স্বর্গ লাভ হইবে—ও জয়লাভ করিলে বিশ্বের হিতসাধনরূপ ঈশ্বরাভিপ্রেত রাজকার্য্য করিবে ইহা ভাবিয়াই যুদ্ধ কর। তোমার আপনার সুখ কামনায় যুদ্ধ করিও না। দস্যু রত্নাপাধীর ন্যায় নিজ সুখের জন্য যুদ্ধ বা নরহত্যা করিও না।

হিন্দুধর্ম্ম কি উৎকৃষ্ট উপাদানে নির্ম্মিত তাহা যাঁহারা জানেন না, তাঁহারা এই সকল কথার গভীর অর্থ বুঝেন না। যে ধর্ম্মশাস্ত্র বলে, "এক গালে চড় মারিলে আর এক গাল পাতিয়া দিতে হইবে" বা যে ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে চলিতে হইলে কীট বিনাশ ভয়ে সম্মার্জ্জনী দ্বারা পথ পরিষ্কার করিয়া চলিতে হয়, হিন্দুধর্ম্ম সে প্রকারের অসম্ভব ও ভ্রান্তিপূর্ণ ধর্ম্মশাস্ত্র নহে, ইহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানপূর্ণ; অবৈজ্ঞানিক বিষয়ে ইহা পূর্ণ নহে। মানব যেমন সহস্র সহস্র প্রকৃতির, কার্য্য যেমন লক্ষ লক্ষ্য প্রকার, প্রবৃত্তি যেমন অগণ্য—হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের মতও সেইরূপ অগণ্য। যেরূপ অবস্থায় যেরূপকালে যেরূপ মানবের পক্ষে যেরূপ কার্য্য হওয়া সম্ভব ও আবশ্যক, হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র সেইরূপ করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন, এই জন্যই হিন্দুধর্ম্ম এত শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে এরূপ বিধি নাই বলিয়াই সেগুলি নিকৃষ্ট। এক গালে চড় মারিলে আর এক গাল ফিরাইয়া দেওয়া যদি প্রকৃত ধর্ম্ম হয়, তবে সে ধর্ম্মপালকগণ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহার করেন কেন? কেন তাঁহারা যাহার নিকট হইতে কিছু লইতে পারিয়াছেন, তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিবার চেষ্টা করেন? বাস্তবিক কেবল ঐরূপ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলেই সংসার চলেন। তাহা হইলে ধর্ম্ম প্রচার দূরে থাকুক অধর্ম্মেরই প্রচার হয়, দুর্জ্জনের সংখ্যাই বৃদ্ধি হয়। হিন্দু এই জন্য অবস্থা, কাল ও পাত্রভেদে কার্য্যের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ক্ষমা করিবেন, ক্ষত্রিয় ক্রোধ করিবেন; কিন্তু যিনি যাহাই করিবেন, তিনি স্বার্থসাধন জন্য না করেন, ঈশ্বরাজ্ঞা পালন জন্য করেন ইহাই সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম। আর্য্য ঋষিগণ বুঝিয়াছিলেন, মানবের যত বৃত্তি আছে, বিশ্বকার্য্য সাধন জন্য তৎসমস্তেরই আবশ্যক, কোনওটীর অভাব হইলে মনুষ্যত্ব থাকিবে না, কিন্তু একাধারে সমস্তগুলির সুন্দর

স্ফূরণ ও সামঞ্জস্য সম্ভবে না, এই জন্য কার্য্য বিভাগের ন্যায় বৃত্তি বিভাগ করিয়া দিয়াছেন, ও পাছে সেই সকল বৃত্তি সীমা উল্লঙ্ঘন করে এই জন্য নিয়ত স্বার্থত্যাগ ও ঈশ্বর স্মরণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহারা এরূপ ভাবে ঐ সকলের ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, তাহাতে মানব বুঝিবে যে, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে সেই সকল কার্য্য সাধন করিবার জন্যই পাঠাইয়াছেন ও তাহাই তাঁহাদের কার্য্য ও ধর্ম্ম, তাহা না করিলে অধর্ম্ম হইবে। সুতরাং ব্রাহ্মণ জানেন যে জ্ঞান-সঞ্চয় ও জ্ঞান প্রচার করা তাঁহার কার্য্য, ক্ষত্রিয় জানেন যে পরস্বাপহারী, ধর্ম্মবৈরী, জাতিবৈরী, দেশবৈরী প্রভৃতি যাহারা ব্রাহ্মণের উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া সুপথগামী হইল না, তাহাদের যথাযোগ্য দণ্ডবিধান করা তাঁহাদের কার্য্য। অতএব এবম্বিধ যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য, তাহা না করা পাপ। অর্জ্জুন প্রাণীনাশ ভয়ে সেই কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে বিমুখ হইয়াছেন বলিয়াই বাসুদেব এই উপদেশ দিতেছেন।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতং।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশং। ৩২।
অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি। ৩৩।
অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াং।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে। ৩৪।
ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বাং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবং। ৩৫।
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততোদুঃখতরং নু কিং ? ৩৬।

"যে সকল ক্ষত্রীয় যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত, অনাবৃত স্বর্গদ্বারস্বরূপ ঈদৃশ যুদ্ধলাভ করে, তাহারই সুখী। যদি তুমি এই ধর্ম্মযুদ্ধ না কর, তাহা হইলে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি হইতে পরিভ্রষ্ট ও পাপভাগী হইবে; লোকে চির কাল তোমার অকীর্ত্তি কীর্ত্তন করিবে। সম্ভাবিত ব্যক্তির অকীর্ত্তি মরণ অপেক্ষাও অধিকতর দুঃসহ। যে সকল মহারথ তোমাকে বহু মান্য করিয়া

থাকেন, তাঁহাদিগের নিকট তোমার গৌরব থাকিবে না; তাঁহারা মনে করিবেন, তুমি ভয়প্রযুক্ত সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইয়াছ। তাঁহারা তোমারে কত অবক্তব্য কথা কহিবেন এবং তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবেন; ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ আর কি আছে।"

বাসুদেব যাহা বলিলেন, তাহার দ্বারা কি বুঝা যাইতেছে না, যে, কেবল কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিবার জন্যই যুদ্ধ করা আবশ্যক—স্বার্থসাধন করিবার জন্য যুদ্ধ অনুচিত? 'যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত' যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য। অর্থাৎ আপন কোনরূপ চেষ্টা দ্বারা যুদ্ধ ঘটাইবে না, যে যুদ্ধ ব্যাপার আপনা হইতে উপস্থিত অর্থাৎ যে যুদ্ধ না করিলে যুদ্ধ করা অপেক্ষা অধিক অনিষ্ট হয় ও যাহা নিবারণ করিতে হইলে অধিকতর অনিষ্ট সাধিত হয় সেইরূপ যুদ্ধই কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম্য। বাসুদেব সেইরূপ ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে বলিতেছেন। অন্যায় বা অধর্ম্ম-যুদ্ধ করিতে বলিতেছেন না—ডাকাইতি করিতে বলিতেছেন না—পরের ধন নাশ বা প্রাণ নাশ করিয়া সুখী হইতে বলিতেছেন না। তিনি বলিতেছেন—তুমি যদি ওরূপ যুদ্ধ না কর তাহা হইলে লোকে তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবে, গোঁমারতমি করিবার সামর্থ্য নাই বলিয়া নিন্দা হইবে বলিয়া বলিতেছেন না—এখন যেমন Moral courage নাই বলিয়া লোকে নিন্দা করিয়া থাকে সেইরূপ নিন্দা করিবে বলিতেছেন বলিলে বোধ হয় নব্য যুবক বুঝিতে পারিবেন। বাস্তবিক যাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবার সাহস নাই, সে কখনও প্রকৃত মানব পদবাচ্য নহে। মৃত্যু অপেক্ষা ওরূপ বিষয়ে নিন্দা অধিক কষ্টকর। তাই বলিতেছেন—ধর্ম্মের সহিত প্রাণ তুল্য নহে। ধর্ম্ম কার্য্য করিবার জন্য কি আপনার কি পরের কাহারও প্রাণের দিকে দৃষ্টি করিবে না।

পাঠক। তুমি হয়ত বলিবে যে, অর্জ্জুন এমন কি বিশেষ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যে তাহার জন্য তাঁহার যুদ্ধে বহুতর প্রাণীবধ ও এতাধিক আত্মীয় বধ করা আবশ্যক হইয়াছিল; কোনও বিদেশীয় শত্রুকর্ত্তৃক দেশ আক্রান্ত হয় নাই যে, দেশ রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ আবশ্যক হইয়াছিল, প্রত্যুত: ঐ যুদ্ধদ্বারা দেশের অনিষ্টই সাধিত হইয়াছে। কেন না উহা গৃহযুদ্ধ, ঐ যুদ্ধে

ভারতের এত বীর ও ধন নষ্ট হইয়াছিল, যে, তাহার ইয়ত্তা নাই, হয়ত ঐ যুদ্ধই আমাদের বর্ত্তমান হীনতার মূল কারণ; সুতরাং ইহা ধর্ম্ম যুদ্ধ নহে—ভয়ানক অধর্ম্মযুদ্ধ। বিশেষতঃ স্বার্থসাধনই এ যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য—রাজ্যলাভ করিবার জন্যই এ যুদ্ধের অবতারণা। এ বিষয়ের যথাবথ উত্তর আমরা দিতেছি। কিন্তু অগ্রে জিজ্ঞাসা করি তুমি এ কথা ত স্বীকার করিয়াছ, যে, অবস্থা বিশেষে নরশোণিতপাত একান্ত কর্ত্তব্য? তাহা যদি করিয়া থাক তবে নরশোণিত পাত মাত্র ব্যবস্থা দেওয়াতেই যে কৃষ্ণ অধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারিতেছ না। এখন তোমার কথা এই মাত্র থাকিতেছে যে, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য এরূপ কার্য্য কর্ত্তব্য বটে কিন্তু এরূপ অবস্থায় নহে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি এ কথার অর্থ কি? স্বদেশবৎসলতাই কি মানবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৃত্তি? উহার তুল্য বৃত্তি কি মানব হৃদয়ে আর নাই? কেবল ঐ বৃত্তির গুণেই কি মানব দেব পদবাচ্য হয়? ঈশ্বর কি কেবল স্বদেশ রক্ষা করিবার জন্যই আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন? আমরা বোধ করি, যাঁহারা এরূপ বলেন তাঁহারা ধর্ম্মতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব বুঝেন নাই। কেননা স্বদেশহিতৈষিতা স্বার্থপরতার নামান্তর মাত্র, অথবা উহা উচ্চদরের স্বার্থপরতা মাত্র। আপনার মাত্র সুখেচ্ছার নাম স্বার্থপরতা, যে ব্যক্তি কেবল আপন সুখের জন্য কার্য্য করে, তাহাকেই স্বার্থপর বলে। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বদেশের হিত কামনায় কার্য্য করে তাহারও মূল উদ্দেশ্য স্বার্থপরতা সাধন করা। তাহা যদি না বল তবে স্বার্থপরতা মানবজাতিতে নাই বলিতেই হয়। কেন না কোনও মনুষ্য কেবল আপনার সুখের জন্য ব্যস্ত নহে। প্রায় সকলেই স্ত্রীপুত্র, পিতামাতা প্রভৃতির সুখ সাধন ও দুঃখ নিবারণ করিবার জন্যই ব্যস্ত। তবে তাহাদের ঐ চেষ্টাকে স্বার্থ চেষ্টা কি প্রকারে বলিবে? ঐ যে কেরাণী বাবু মুনিবের গালিবর্ষণ সহ্য করিয়া দিবারাত্রি কলম টানিতেছেন, ঐ যে ডাক্তার বাবু বাড়ী বাড়ী ফিরিয়া ভিজিট আদায় করিতেছেন, ঐ যে বারিষ্টার বাবু (বিষ্ণু! সাহেব) মকদ্দমার নূতন ফন্দি বাহির করিয়া দিয়া মোহরে পকেট পূর্ণ করিতেছেন, সে কি কেবল আপনার সুখের জন্য? স্ত্রীপুত্র প্রভৃতিকে যদি ভরণ পোষণ না

করিতে হইত তাহা হইলে কি উপার্জ্জনের জন্য তাঁহাদের এত চেষ্টা করিতে হইত? কখনই না। যৎকিঞ্চিৎ আয় হইলেই সকলেরই আপনার চলে। তবে তাঁহাদিগকে তুমি স্বার্থপর বল কি প্রকারে? ঐ যে কৃষক ভয়ানক রৌদ্রবাত সহ্য করিয়া এতাদৃশ পরিশ্রম করিতেছে, ঐ যে ধাঙ্গড় মেথর নিতান্ত নির্ঘৃণ হইয়া দুর্গন্ধ বিষ্ঠাদি পরিষ্কার করিতেছে, সে কি কেবল নিজের জন্য—পরিবার প্রতিপালনের জন্য নহে? তবে উহাদিগকে ঘোর তপস্বী না বলিয়া স্বার্থপর জঘন্য ব্যবসায়ী বল কি প্রকারে? ঐ যে তস্কর সিঁদ কাটিয়া পরের দ্রব্য অপহরণ করিতেছে, ঐ যে দস্যু নরহত্যা করিয়া লুণ্ঠন করিতেছে, ঐ যে কূটকারী প্রতারণা করিয়া পরস্বাপহরণ করিতেছে—সে কি নিজের জন্য? পরিবার প্রভৃতির জন্য নহে? তবে উহারা স্বার্থপর কি প্রকারে? নিন্দনীয় কি প্রকারে? কিন্তু এ সকলকে যদি তুমি স্বার্থপরতা না বল তাহা হইলে স্বার্থপরতা পশু ভিন্ন মানবে থাকিতে পারে না! আর যদি ইহাকে তুমি স্বার্থপরতা বল তবে স্বদেশের বা স্বজাতির হিতচেষ্টাকে স্বার্থপরতা বলিবে না কেন? স্বপরিবারহিতৈষিতা যদি স্বার্থপতা হইল, তবে স্বজাতি হিতৈষিতা স্বার্থপরতা নহে কেন? বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আত্মহিতৈষিতা, স্বপরিবারহিতৈষিতা ও স্বজাতিহিতৈষিতা একই পদার্থ—একইভাব। সমস্তই স্বার্থপরতার নামান্তর বা প্রকারান্তর। কেন না তুমি যে স্ত্রীপুত্র প্রভৃতির মঙ্গল কামনা কর, সে কি তোমার নিজের জন্য নহে? স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি দ্বারা তোমার উপকার হয়, তাহারা সুখী না হইলে তোমার সুখ হয় না সেই জন্যই তুমি তাহাদের হিতচেষ্টা কর। তুমি যেমন গো, অশ্ব, পক্ষী প্রভৃতির আহার যোগাও, তুমি যেমন বৃক্ষে জল সেচন কর, সেইরূপ স্ত্রীপুত্রদিগকেও ভরণ পোষণ প্রদান করিয়া থাক। যদি স্ত্রীপুত্রদিগের পোষণ নিঃস্বার্থপরতা হয়, তবে তুমি যে তোমার ঘোড়াকে দানা দেও, গরুকে ঘাস দেও, ময়না পক্ষীকে ছাতু দেও ও বৃক্ষের গোড়ায় জল দেও তাহাও তোমার নিঃস্বার্থপরতা বলিতে হইবে, তুমি সকল কার্য্যই নিঃস্বার্থভাবে করিয়া থাক বলিতে হইবে। কিন্তু ঐ সকল ও পরিবার প্রতিপালনের মুখ্য উদ্দেশ্য স্বার্থপরতা থাকায় ঐ সকল যেমন নিঃস্বার্থ কার্য্য

বলিয়া গণ্য নহে, স্বদেশহিতৈষিতার মূলেও ঐরূপ স্বার্থপরতা থাকায় স্বদেশহিতৈষিতাও নিঃস্বার্থ কার্য্য রূপে গণ্য হইতে পারে না। আমরা কিজন্য স্বদেশহিতৈষী হই ও কি জন্যই বা পরদেশদ্রোহী হই? স্বদেশের মনুষ্য যেমন মনুষ্য বিদেশের মনুষ্যও ত সেইরূপ মনুষ্য! তবে কি জন্য আমরা স্বদেশবাসী মনুষ্যের হিত চেষ্টা করি ও বিদেশবাসী মনুষ্যের অহিত চেষ্টা করি? যখন উভয়েই মনুষ্য, অথচ ব্যবহার ভিন্ন প্রকার তখন অবশ্য বলিতে হইবে ইহার নিগূঢ় কারণ আছে। সে কারণ কি? যেমন আপনার স্ত্রীও স্ত্রী ও পরের স্ত্রীও স্ত্রী হইলেও সকলে আপন স্ত্রীর সুখ সম্পাদনে চেষ্টা করে সেইরূপ বিদেশী ও স্বদেশী উভয়েই মনুষ্য হইলেও স্বদেশবাসীরহিতকামনা করে। অর্থাৎ একমাত্র স্বার্থপরতাই এরূপ ইতর বিশেষ করিবার মূল কারণ। মানব সামাজিক জীব, সমাজবদ্ধ হইয়া না থাকিলে—পরস্পরে পরস্পরের উপকার না করিলে মানবের কার্য্য চলে না, এই জন্য তাহারা পরস্পর পরস্পরের উপকার করে। যে যাহার উপকার করে সে তাহার উপকার করে এবং যে যাহার অপকার করে সে তাহার অপকার করে। পিতা মাতা পুত্রের উপকার করে, এই জন্য পুত্র পিতা মাতার উপকার করে, স্ত্রী স্বামীর উপকার করে, তাই স্বামী স্ত্রীর উপকার করে, ভ্রাতা ভগ্নীর উপকার করে তাই ভগ্নী ভ্রাতার উপকার করে, প্রতিবেশী প্রতিবেশীর উপকার করে, আত্মীয় আত্মীয়ের উপকার করে। এই প্রকারে মানব প্রথমে পরিবার বদ্ধ হয় ও পরে ক্রমে ক্রমে সমাজ বদ্ধ হয়। আপনার হিত করিতে হইলে যেমন হস্তপদাদি অঙ্গ সকলের হিত করা আবশ্যক, পরিবারবর্গের হিত করা আবশ্যক, প্রতিবেশীগণের হিতকরা আবশ্যক স্বজাতির হিত করা আবশ্যক, স্বদেশের হিত করাও সেইরূপ আবশ্যক। যখন মানব ইহা বুঝিল অর্থাৎ যখন বুঝিল যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির পরিবারের মঙ্গল ব্যতীত আপনার মঙ্গল হয় না এবং সমাজের মঙ্গল ব্যতীত পরিবারের ও আপনার মঙ্গল হয় না তখন মানবের স্বদেশহিতৈষিতা কর্ত্তব্য বিবেচনা হইল। কিন্তু সে কিরূপ কর্ত্তব্য? আত্মহিতৈষিতা যেরূপ কর্ত্তব্য, পরিবারহিতৈষিতা যেরূপ কর্ত্তব্য, সেইরূপ কর্ত্তব্য। আত্মহিতৈষিতা অযথারূপে কৃত হইলে যেমন নিন্দনীয় ও স্বার্থপরতারূপে গণ্য হয় স্বদেশহিতৈ

স্বিতাও সেইরূপ অযথারূপে কৃত হইলে, স্বার্থপরতারূপে গণ্য হইবে। কেন না ঐ সকলেরই মূলে স্বার্থপরতা সমভাবে বিরাজিত; প্রভেদ কেবল জ্ঞানোন্নতি। অর্থাৎ মানব যখন পশ্বাদির ন্যায় মূর্খ ছিল, তখন আপন দেহ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাত্রকে আপনার মনে করিত, ক্রমে যত জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে থাকিল ততই ক্রমে পরিবার, প্রতিবেশী, জাতি ও দেশকে আপনার মনে করিয়া সকলেরই সহিত আপনার যোগ করিল—তাই সকলেরই মূলে স্ব শব্দ যোগিত। এরূপ উন্নতি ধর্ম্মের সোপান বটে, কিন্তু উহা চরম লক্ষ্য নহে। তবে ঐরূপে ক্রমে উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইলে লক্ষ্য স্থানে উপনীত হইতে পারা যাইবে—অর্থাৎ ঐরূপে ক্রমে যখন সমগ্র মানবমণ্ডলী—সমগ্র পৃথিবী—সমগ্র বিশ্ব আপনার বলিয়া জ্ঞান হইবে, যখন আপন ভিন্ন কিছুই পর থাকিবে না, সমস্তই ঈশ্বরময় হইবে তখনই মানব প্রকৃত ধর্ম্মপথের পথিক হইবে। আধুনিক স্বদেশহিতৈষিতা অনেক উন্নতি বটে কিন্তু এখনও উহা স্বার্থপরতাময়। কিন্তু বাস্তবিক কেবল স্বার্থসাধন মানবের কার্য্য নহে। ঈশ্বরকার্য্য—বিশ্বকার্য্যই তাঁহার কার্য্য। সময় বিশেষে আধুনিক মতানুযায়ী স্বদেশহিতৈষী হইতে হয় বটে, কিন্তু সে কোন সময়ে? যে সময়ে বিদেশী অন্যায়াচরণ করে। কিন্তু সেরূপ স্থলে মানবকে স্বার্থপর বা আত্মহিতৈষীও হইতে হয়। অর্থাৎ অন্যে যখন আপনার প্রতি অন্যায়াচরণ করে তখন মানবের আত্মহিত চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু তাই বলিয়া আপনাকে কুস্বভাবাপন্ন করিতে হইবে, কিম্বা স্বদেশ কুলোকে পরিপূর্ণ রাখিতে হইবে বিবেচনা করা অন্যায়। পাছে দস্যু প্রভৃতির দমন করিলে স্বদেশের বল হানি হয়, সময় পাইয়া বিদেশবাসী শত্রু হয় তাহা ভাবিয়া দেশের কণ্টক ছেদ করিব না ভাবা অন্যায়। বাস্তবিক তাহাতে দেশ সবল হয় না প্রত্যুতঃ দুর্ব্বল ও ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়।

অর্জ্জুন বিশ্বকার্য্য সাধন জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়, তাঁহার জ্যেষ্ঠ প্রকৃত রাজ্যাধিকারী; দুর্য্যোধন অন্যায় করিয়া তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইতেছেন, সে রাজ্য উদ্ধার করা তাঁহার কর্ত্তব্য। বাহুবল রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম—রাজ্য পালন করা অর্থাৎ

প্রজার মঙ্গল বিধান করা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য। সেই মঙ্গল কার্য্য করিতে দুর্য্যোধন বাধা দিতেছেন; ঐ দুর্য্যোধন আবার ক্রূরকর্ম্মা, তাঁহা দ্বারা রাজ্যের সমূহ অমঙ্গল হইবার সম্ভব, সুতরাং দুর্য্যোধন রাজা হইলে মহান্ অনিষ্ট সাধিত হইবে। ঈশ্বর রাজাকে প্রজার মঙ্গল জন্য সৃষ্টি করেন, সুতরাং রাজার রাজা হওয়া ও প্রজাবর্গের মঙ্গল সাধন করা একান্ত কর্ত্তব্য। যদি কোন ব্যক্তি অন্যায় করিয়া কাহারও অনিষ্ট করে তাহা নিবারণ করা তাঁহার কর্ত্তব্য। দুর্য্যোধন যখন দেশের অনিষ্ট সাধন করিতে লাগিল তখন দুর্য্যোধনকে দমন করা যুধিষ্ঠিরাদির একান্ত কর্ত্তব্য। ঐরূপ কার্য্য আধুনিক নীতিরও অনুমোদিত। ইংরাজরাজ কোন রাজ্যে রাজাদ্বারা প্রজার অমঙ্গল সাধিত হইলে তাহা জয় করিয়া থাকেন। যেখানে তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বার্থ সাধন মানসে রাজ্য জয় করেন, সেখানেও যদি উক্তরূপ অরাজকতা থাকার বিষয় প্রকাশ থাকে, তবে যে, ঐ জন্যই সেই রাজ্য জয় করা হইল এইরূপ ঘোষণা করেন। যদি অরাজকতা নিবারণ কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া অবধারিত না থাকিত, তাহা হইলে কখনও তাঁহারা এরূপ ছল বাক্য প্রকাশ করিতেন না। বাস্তবিক প্রজাপীড়ক রাজা ও দস্যু একই কথা; দস্যু দমন যেমন আবশ্যক প্রজাপীড়ক রাজার দমনও সেইরূপ আবশ্যক। সুতরাং অর্জ্জুনের পক্ষে দুর্য্যোধনের নিকট হইতে স্বীয় রাজ্য গ্রহন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তিনি যদি আত্মীয়াদির মরণে ব্যথিত হইয়া তাহা না করেন তাহা হইলে তাঁহার নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করা হয় ও ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করনে ব্যাঘাত করা হয়। হিন্দু স্বদেশ বিদেশ জানিতেন না, আপন ও পর জানিতেন না—যাহা কল্যাণকর তাহারই অনুষ্ঠান করিতেন। তিনি স্বদেশীকে যেরূপ ভাবিতেন বিদেশীকেও সেইরূপ ভাবিতেন। যিনি বিশ্বের হিতকারক, তিনি স্বদেশীই হউন, আর বিদেশীই হউন তিনিই পূজনীয়; আর যিনি অনিষ্ট-কারী হইবেন, তিনি স্বদেশীই হউন আর বিদেশীই হউন, তিনিই দণ্ডার্হ। স্বদেশী বিদেশী দেখা স্বার্থপরতার কথা—ভারতযুদ্ধে স্বদেশের বল ক্ষয় হইল ভাবা স্বার্থপরতার কথা। যিনি স্বার্থপর তিনি ভাবিবেন দুর্য্যোধনাদি দস্যু হয় হউক, তাহারা ত বিদেশীর সহিত বিবাদে পটু—সুতরাং তাহাদের

নাশ অনুচিত,তাহারা থাকিলে দেশের বল থাকিবে। কিন্তু প্রকৃত ধার্ম্মিক তাহা ভাবিবেন না। তিনি কায়মনোবাক্যে দস্যুতস্করাদি কুকর্ম্মজীবীদিগের দমন করিবেন, তাহাতে স্বদেশ বিদেশ বলিয়া প্রভেদ করিবেন না। তিনি পৃথিবীতে ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিবেন—মানব মাত্রের হিত কামনা করিবেন বিশ্বকার্য্য ও ঈশ্বরকার্য্য সম্পন্ন করিবেন। তাহাই তাঁহার মূলমন্ত্র।

যদি পাঠক! তুমি অত দূর দৃষ্টি না কর, তাহা হইলেও অপহৃত স্বরাজ্য উদ্ধার করা কর্ত্তব্য বিবেচনায়ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য বলিতে হইবে। তাহা যদি না বল, তবে তোমাকে বলিতে হইবে, যে, অন্যায়কারী, অপহরণ-কারী প্রভৃতির দণ্ড দেওয়া উচিত নয়—আপন অধিকার গ্রহণ চেষ্টা অন্যায়। অর্জ্জুন যদি আপন রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিতে না পারেন—তবে ঐ যে দস্যু আপনার ধন রত্নগুলি অপহরণ করিল, বলপূর্ব্বক আপনার গৃহ অধি-কার করিল, তাহার নিকট হইতে তাহা পুনর্গ্রহণের চেষ্টা করা আপনার অন্যায় হইবে। কি বল দ্বারা, কি রাজদ্বারে অভিযোগ দ্বারা, কিছুতেই আপনার সে উপকার পাইবার চেষ্টা করা উচিত হইবে না। আপনার যদি সেরূপ চেষ্টা করা উচিত হয়,তবে অর্জ্জুনের সেরূপ চেষ্টা করা উচিত নহে কেন? আপনি এক জন সামান্য প্রজা আপনি যুদ্ধ না করিয়া রাজার শরণাপন্ন হইলেন—তিনি তাহার দণ্ডবিধান করিলেন; কিন্তু যিনি রাজা তিনি কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন? তাঁহাকে ত স্বীয় বলেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

তুমি হয় ত বলিবে তবে আর ধর্ম্ম কর্ম্ম থাকিল কৈ? ত্যাগ, ক্ষমা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি আর ধর্ম্ম মধ্যে গণ্য হয় কিরূপে? তাহা হইলে যাহাকে বিষয় কর্ম্মবলে—ন্যায়ানুসারে বিষয়কর্ম্ম বলে, তাহারই নাম ধর্ম্ম হয়। তাহা যদি হয়, তবে ত্যাগ, ক্ষমা, দান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতিকে দূর করিয়া দিতে হয়। এ কথার উত্তর দিতে হইলে আমাদিগকে, 'পূবে রামায়ণ গাইতে হয়' পুনরায় ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইতে হয়—বহুভাষী দোষে দোষী হইতে হয়। কিন্তু সে দোষ স্বীকার আমাদের করিতে হইতেছে, কেন না ধর্ম্মের মর্ম্ম এখনও পরিস্কৃত হয় নাই। ক্রমশঃ

শরীরের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ।

শরীরের সহিত ধর্ম্মের অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। কাষ্ঠের সহিত অগ্নির যেরূপ সম্বন্ধ. অর্থাৎ অগ্নি সর্ব্বত্র থাকিলেও যেমন কাষ্ঠে অগ্নির অস্তিত্ব নিরূপিত হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মকার্য্য পৃথক্ হইলেও কেবল শরীরেই তাহার অস্তিত্ব অনুভূত হয়। যখন শরীর ধ্বংস হইয়া যায়, তখন ধর্ম্ম থাকিলেই কি, আর না থাকিলেই বা কি, তাহাকে কোন উপকার দর্শে না। ঐরূপ শরীর আছে, কিন্তু ধর্ম্ম নাই, তথায় শরীর থাকা আর না থাকা দুইই সমান। শরীরের সহিত ধর্ম্মের নিত্য সম্বন্ধ। জপ, তপ, হোম, অর্চ্চনা, তপস্যা, দান, ধ্যান ইত্যাদি সমুদয় ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান শরীর দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। শরীর থাকিলেই ধর্ম্ম থাকে, আর ধর্ম্ম থাকিলেই শরীরের অস্তিত্ব থাকে। শরীর ও ধর্ম্মের মণিকাঞ্চনের ন্যায় কিরূপ সংযোগ আছে, উভয়ের কিরূপ নিত্য সম্বন্ধ আছে, তাহা নির্ণয় করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহা নির্ণয় করিবার অগ্রে শরীর কি? শরীরের লক্ষণ কি? শরীর কাহাকে বলে? তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রকারদের মত কি তাহা দেখান নিতান্ত আবশ্যক। উপনিষদে আছে—

"তদশীর্য্যতাশায়ীতীং তচ্ছরীরম ভবত্তচ্ছরীরস্য শরীরত্বম।"

যাহা পতিত হয়, তাহার নাম শরীর। অবয়বের বিশ্লেষ হওয়া প্রযুক্ত স্থূলদেহ শীর্ণ অর্থাৎ বিনষ্ট হয়। এই কারণে প্রাণ রহিত শরীরকে অশারি" বলে। শীর্ণ শব্দ হইতে শরীর শব্দের উৎপত্তি। অথবা শৃধাতু হইতেই শরীর শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সকলেই জানেন যে, এই স্থূল দেহ কিছুতেই থাকে না। দুই দিন, দশ দিন, দুই মাস, ছয় মাস, দুই বৎসর, দশ বৎসর, বিশ-

বৎসর, পঞ্চাশ বৎসর পরে একদিন না একদিন অবশ্যই এই শরীরের ধ্বংস হইবে। তাহাতেই উপনিষদে শীর্ণত্বরূপ অর্থ লইয়া শরীর শব্দের প্রকৃত অর্থ ও ব্যুৎপত্তি স্পষ্টরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে আভিধানিকদের যেরূপ মত আছে, তাহাই অগ্রে দেখান যাইতেছে। যথা—

"ধর্ম্মঃ পুণ্যে যমেন্যায়ে স্বভাবাচারয়োঃ ক্রতৌ।
উপমায়ামহিংসায়াং চাপে চোপনিগদ্যতে॥" বিশ্ব।
"ধর্ম্মো যমোপমপুণ্য স্বভাবাচার ধন্বসু।
সৎসঙ্গে ঽর্হত্যহিংসাদৌ ন্যায়োপনিষদোরপি॥
ধর্ম্মং দানাদিকে," হেমচন্দ্র।

আভিধানিকদের মধ্যে প্রায়ই মতের পার্থক্য দেখা যায়। এই জন্য তাঁহাদের প্রত্যেকের উদাহরণ দেখাইলাম না। যে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল, তাহাতেও অনৈক্য আছে। বিশ্বপ্রকাশে 'ক্রতু' শব্দ আছে, উহা হেমচন্দ্রে নাই। হেমচন্দ্রে "সৎসঙ্গ, অর্হৎ, উপনিষদ ও দানাদি" এই কয়টি শব্দ আছে, উহা বিশ্বপ্রকাশে নাই। এইরূপ মেদিনী, ত্রিকাণ্ডশেষ প্রভৃতি অভিধানেও শব্দের অর্থ নিরূপণ স্থলে প্রায়ই মতান্তর দৃষ্ট হয়।

পাঠকগণ! এখন ধর্ম্মশব্দের যে কয়টি অর্থ উল্লিখিত হইল ঐ কয়টি শব্দের তাৎপর্য্য এক বিষয়ে পরিণত হইতে পারে কি না, তাহা আপনারা বিবেচনা করিয়া লইবেন। কিন্তু 'ধর্ম্ম' শব্দের ধাত্বর্থ দেখিলে বোধ হয়, কেবল শরীর রক্ষার উপযোগী পদার্থ বা কার্য্য ধর্ম্মশব্দে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে শরীর বলিতে আত্মাশূন্য শরীর বুঝিতে হইবে না; কারণ আত্মা বিরহিত শরীর পাষাণ ও মৃত্তিকাদির ন্যায় জড় মাত্র। জড়শরীরে অথবা অচেতন শরীরে কোন কার্য্য সম্ভবপর না হওয়াতে আত্মাবিরাজিত শরীরের সহিতই ধর্ম্মের সম্বন্ধ থাকে, ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে। আত্মার সহিত শরীরের যে কি সম্বন্ধ, তাহা পরে দেখান যাইবে। একণে কথা এই যে, যখন শরীর বলিতে আত্মা বিশিষ্ট শরীর বুঝিতে হইল ও যখন শরীর ধারণোপযোগী কার্য্যাদির নাম ধর্ম্ম হইল, তখন ধর্ম্মশব্দেরযে কয়টি অর্থ উদাহৃত

হইয়াছে, উহারা অবশ্যই আত্মার শরীর ধারণের উপযোগী বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কার্য্য গুলি সম্পন্ন করিলে অচিরাৎ শরীরের তেজ, শ্রী ও স্থায়িত্ব সমাধানের উপযোগী শুভ ফল সকল সাধিত হয় বলিতে হইবে।

যদি শরীর থাকে, তবেই যম, উপমা, পুণ্য, স্বভাব, আচার, ধনু, সৎ-সঙ্গ, অর্হৎ (বৌদ্ধ বিশেষ) অহিংসা, ন্যায়, উপনিষদ, দানাদিকার্য্যকলাপ সুসাধিত হইয়া থাকে। যম শব্দের অর্থ সংযম বা রোধ করা। শারীরিক বা মানসিক শুভাশুভ কার্য্য কেবল শরীরে উত্তেজিত হয় ও শরীরেই প্রশমিত হয়। এইজন্য ধর্ম্মরাজ শব্দে যমকে বুঝায়। যাহার শরীর আছে, তাহারই অন্য শরীরের সহিত সৌসাদৃশ্য বা উপমা দেওয়া হইয়া থাকে। যথা—অমুক সুশ্রী ও অমুক কদাকার ইত্যাদি। শরীর না থাকিলে উপমা হইতে পারে না। পুণ্য শব্দের অর্থ সুকৃত। যদি শরীর থাকে, তবে উত্তম কার্য্য করিবার ক্ষমতা হয়। স্বভাব বাক্য দ্বারা স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, শরীর থাকিলে অসৎ কার্য্য করাও অসম্ভব নহে। যত প্রকার ভালমন্দ, শুভাশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহার মূল একমাত্র শরীর। ধনুক-শব্দ দ্বারা ক্ষত্রিয় শরীরের বিষয় বলা হইয়াছে। ক্ষত্রিয় শরাসন চালনায় প্রসিদ্ধ, ক্ষত্রিয়-শরীরের ইহা একটী পরম উপকারক। সৎসঙ্গ যে শরীরের যথার্থ মিত্র, তাহা বলা বাহুল্য। শরীরধারী ব্যক্তি মাত্রেরই সৎ ব্যক্তির সহিত সঙ্গ করা কর্ত্তব্য। অথবা যে কোন পদার্থের সহিত মিলন হওয়া (তাহা সৎ হউক, অথবা অসৎ হউক) কেবল শরীর বিদ্যমান থাকিলেই সম্ভব। বৈয়াকরণদের মতে অর্হৎ শব্দের অর্থ পূজ্য। কিন্তু ধাতু অনুসারে উহার অর্থ যোগ্য। শরীর দ্বারা পূজ্যতা ও যোগ্যতার স্থিরীকরণ হইয়া থাকে। অহিংসা বা নীতি, ইহাও শরীর দ্বারা সংঘটিত হয়। উপনিষদ্ শব্দের অর্থ বেদান্ত শাস্ত্র। উপ শব্দের অর্থ সমীপ, নি শব্দের অর্থ অতিশয় ও সদ্ ধাতুর অর্থ জ্ঞান। যাহা দ্বারা সমীপে থাকিয়া বা আসিয়া অতিশয়রূপে সেই সকল উপনিষদ্ নামে অভিহিত হয়, পদার্থের জ্ঞান সম্পন্ন হয়, সেই সকল শাস্ত্র, একমাত্র শরীর দ্বারাই অনুশীলনীয়। দানাদি কার্য্য যে শরীর দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহা বুঝিবার আবশ্যক নাই। হয় হস্ত দ্বারা, না হয় মুখ দিয়া

আদেশ রূপ শারীরিক ক্রিয়াদ্বারা দানাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয় এবং শরীরে জন্যই দান ও প্রতিগ্রহ আবশ্যক।

এক্ষণে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, আভিধানিকদের মতানুযায়ী ধর্ম্মশব্দের যম, উপমা, পুণ্য প্রভৃতি যে, ধৃ ধাতুর অর্থানুসারে শরীর ধারণের উপযোগী, তাহা অবশ্য মানিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ যে সকল কার্য্য দ্বারা আত্মার শরীর ধারণকার্য্য সম্পন্ন হয় তাহারই নাম ধর্ম্ম। এই জন্য ধারণ অর্থবোধক ধৃ ধাতু হইতে ধর্ম্ম শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে এই কয়টী ভিন্ন, আরও এমন কত শরীর ধারণের উপযোগী পদার্থ আছে, তাহা ত বিশ্বপ্রকাশে বা হেমচন্দ্রে উল্লেখ করা হয় নাই। আমরাও স্বীকার করিতেছি যে, শুদ্ধ হেমচন্দ্র বা বিশ্বপ্রকাশ কেন, কোন শাস্ত্রে একেবারে শরীর ধারণোপযোগী সমুদয় পদার্থের বিষয় উল্লেখ হইতে পারে না। বিশ্বপ্রকাশকার মহেশ্বর কিম্বা হেমচন্দ্র, ঋষিদের শাস্ত্র দেখিয়া স্ব স্ব দূরদর্শীত্বের সাহায্যে ধর্ম্মশব্দের যতপ্রকার প্রয়োগ দেখিয়াছেন, তাহাই স্ব স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু এমন অনেক শাস্ত্র থাকিতে পারে, যাহা উভয়েরই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অথবা সে সকল শাস্ত্রের মত তাঁহাদের সত্য বলিয়া বোধ হয় নাই, এই জন্য তাঁহারা আপন আপন পুস্তকে সে সকলের উল্লেখ করেন নাই ও সেই সকল শাস্ত্রের পরিচয় দিতে পারেন নাই। তথাপি হেমচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় পণ্ডিত লোকে অনেক শাস্ত্র দেখিয়া শুনিয়া বলিয়াছেন। সুতরাং অন্যান্য শাস্ত্রে ধর্ম্মের আরও অধিক অর্থ থাকিতে পারিলেও আসল কথার কোন দোষ হইতেছে না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যখন ধর্ম্মশব্দের অর্থ মধ্যে 'স্বভাবকে' ধরা হইয়াছে, তখন 'মায়া' বা 'যোগ' ইত্যাদিকে উহারমধ্যে ধরা হয় নাই কেন? তাহাদের সহিত কি শরীরের কোন সম্বন্ধ নাই? অথবা তাহারা শরীর ধারণের উপযোগী নয়?। আমরা এরূপ আপত্তি অতি সামান্য মনে করিব। কারণ ইতিপূর্ব্বেই ত বলা হইয়াছে যে, ধর্ম্মশব্দের এমন অনেক অর্থ থাকিতে পারে, যাহা অদ্যাপি অপরিজ্ঞাত বা সাধারণের অচর্চ্চিত রহিয়াছে। কিন্তু মায়া বা যোগ, শরীর ধারণের উপযোগী কি না? ইহা

প্রমাণ করিতে হইলে, ক্রমশঃ প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হয়। অথবা ইহার একটী সংক্ষেপে উত্তর আছে—আচার,নীতি,স্বভাব ইত্যাদিকে যখন ধর্ম্মের অর্থ মধ্যে ধরা হইয়াছে, তখন উহাদ্বারাই অন্যান্য সমুদয় অর্থ বলা হইয়াছে। মায়া কি স্বভাবের অন্তর্নিবিষ্ট নহে? না যোগ কোন রূপ নীতিকার্য্যের বহির্ভূত?। তবে—

"নৈব শব্দাম্বুধেঃ পারং কিমন্যে জড়বুদ্ধয়ঃ।"

যখন দূরদর্শী ব্যক্তিগণও শব্দশাস্ত্রের পরপারে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই, তখন মাদৃশ জড়বুদ্ধি বা অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে, কিছুতেই সমর্থ হইবে না, তাহা একরূপ অসংশয়ে অবধারিত বলিতে হইবে। পদপদার্থের শক্তি নির্ব্বাচন করিয়া তৎসমুদয়ের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অল্প তপস্যার ফল নহে। কারণ, যাঁহারা অতিসূক্ষ্মদর্শী, তাঁহারাও পরমাণুমাত্র পর্য্যন্ত দেখিতে পাইয়া থাকেন। এই ত যোগীদের সূক্ষ্মদর্শিতা বা দূরদর্শিত্ব। কিন্তু তাহাতেও কিছু হয় না, তখনও যোগীদের জানিবার যথেষ্ট আছে। বিশেষতঃ অধিকপরিমাণে জ্ঞানী হইলে, অধিকপরিমাণে দুঃখ পাইতে হয়। পাতঞ্জলে আছে—

"পরিণাম তাপ সংস্কার দুঃখৈর্গুণবৃত্তি বিরোধাচ্চ।
সর্ব্বমেব দুঃখং বিবেকিনঃ।"। সাধনপাদ। ১৫।

কোন্ বস্তুর কিরূপ পরিণাম, দৈব, ভৌতিক ও অধ্যাত্ম তাপ এবং জন্মান্তরীয় সংস্কার দ্বারা যোগীগণেরও দুঃখ উৎপন্ন হয়। তিনি যোগী সত্য, যোগাসনে বসিয়াছেন সত্য, কিন্তু সত্ব রজ তম এই ত্রিগুণের আনন্দ, উপকার, রক্ষা, দুঃখানুভব প্রভৃতি গুণবৃত্তিদ্বারা উদ্বিগ্ন হওয়াতে বিবেকী যোগী পুরুষের আমাদের অপেক্ষা অধিক দুঃখ। আমার অল্পজ্ঞান, কোন বিষয়ে নৈরাশ্য আসিলে ক্ষোভ নাই। কিন্তু যিনি অনেক জানেন, তিনি সামান্য কার্য্যে ত্রুটি দেখিলে বহুতর দুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন।

"হেয়ং দুঃখ মনাগতম্।" পাতঞ্জল সাধনপাদ। ১৬।

এই কারণে যোগীরা ভবিষ্যৎ দুঃখ পরিত্যাগ করিবেন। তাহার যুক্তি এই—যে দুঃখ অতীত হইয়াছে, তাহা ভোগকরা হইয়াছে, যে দুঃখ বর্ত্তমান, তাহাও ভোগকরা হইতেছে। তবে যেদুঃখ আইসেনাই, কিন্তু অবশ্যই অধি-

ঘটিতে আসিবে, তাহার জন্য—সেই ভবিষ্যৎ দুঃখ পরিহারের জন্য যোগীগণ সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন। নতুবা যোগসিদ্ধির সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

"যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরং গতঃ।
তাবুভৌ সুখ মেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতেন যেনঃ॥"

যাহার ন্যায় মূর্খ জগতে নাই, আর যে ব্যক্তি জ্ঞানের সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন, এই দুইজনেই পরম সুখী। কিন্তু যিনি অধিক মূর্খও নহেন কিম্বা অধিক জ্ঞানীও নহেন, এরূপ মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তিই সংসারে দুঃখ পাইয়া থাকেন।

সুতরাং ভাবিয়া দেখুন—মনুষ্য যখন কদাচ ঈশ্বরশক্তি লাভ করিতে পারিবে না, কি যোগীর মতন সর্ব্বজ্ঞ হইতেও পারিবে না, তখন ধর্ম্মশব্দের অন্য অর্থ থাকিতে পারে ভাবিয়া প্রকৃত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নষ্ট করা অযুক্তি হয় কি-না?। পূর্ব্বে যে শরীর শব্দে আত্মাশ্রিত শরীর বলা হইয়াছে, তাহা মানবের পক্ষে। সাধারণতঃ শরীর বলিলে আমাদের জ্ঞাত, বা ব্যবহৃত নরশরীর পশুশরীর, জড়শরীর প্রভৃতি যে কোন বস্তু শরীরই বুঝান, যে শাস্ত্রকারদের অভিপ্রেত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হরিদ্রা একটী পদার্থ, উহা চূর্ণের সহিত সংযুক্ত হইলে লোহিত হইয়া যায়। সুতরাং হরিদ্রা ও চূর্ণের ধর্ম্ম অর্থাৎ স্বভাব লৌহিত্য গুণ ধারণ করা। হরিদ্রায় শরীর নাই, কিন্তু হরিদ্রা একটা পদার্থ হইয়াতে উহার শরীর বলিয়া নির্দেশ করা কখনই অনুচিত হইতে পারে না।

শীর্ণত্বনিবন্ধন যখন শরীরের নির্ব্বাচন করা হইয়াছে, তখন পৃথীবীস্থ সমুদয় পদার্থকে শরীরী বলিতে হইবে। বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বত, মৃত্তিকা ইত্যাদি কালে অবশ্যই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং অবশ্যই সকলের শরীর আছে, স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য, মানবশরীরের সমালোচনা করা, সুতরাং তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ বা যেরূপ যুক্তি আছে, তাহাই এক্ষণে সমালোচিত হইবেক। আভিধানিকদের মতে ধর্ম্মশব্দের যে কয় প্রকার অর্থ করা হইয়াছে, তাহাদের সকলের সহিত শরীরের নৈকট্য সম্বন্ধ থাকি-

লেও ও শরীর ধারণের জন্য তাহাদের সকলের উপযোগীতা থাকিলেও, তাহাদের মধ্যে কোন্‌টী অধিক উপযোগী স্থির হইয়াছে, তাহা দেখা আবশ্যক। আভিধানিকেরা, ধর্ম্ম শব্দের ব্যাখ্যাস্থলে আচার, স্বভাব, ন্যায়, সৎসঙ্গ, উপনিষদ্‌ ও দানাদির উল্লেখ বলিয়াছেন কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা অন্যান্য গুলি অপেক্ষা আচার, পুণ্য ও দানাদির অধিক প্রশংসা করিয়াছেন; অথচ অবশিষ্ট গুলি যে ধর্ম্মের অন্তর্গত তাহাও তাঁহাদের অভিপ্রেত। সুতারং বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারা কতকগুলিকে শরীর ধারণের প্রধান উপযোগী ও অন্য গুলিকে শরীর ধারণের গৌণ উপযোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুণ্য, দান ও সদাচার যেরূপ প্রত্যক্ষ শরীরের উপকারক, অপরগুলি তদ্রূপ নহে।

ক্রমশঃ

শ্রীরামকৃষ্ণবিদ্যাভূষণ।

ধর্ম্মশাস্ত্রের আশ্যকতা।

ধর্ম্মশাস্ত্র ভিন্ন অন্য প্রকারে মানবকে কর্ত্তব্য-পরায়ণ করিতে হইলে যে কি ভয়ানক কষ্ট, বিপ্লব ও শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হয় তাহাই প্রতিপন্ন করা অদ্যকার উদ্দেশ্য। প্রথমে রাজশাসন দ্বারা মানবকে কর্ত্তব্য-পরায়ণ করিতে হইলে যে অনিষ্ট হয় তাহাই প্রদর্শন করিতেছি। আমরা পরাধীন জাতি। এই জন্য হয়ত অনেকে বলিবেন আমরা যে রাজশাসন দ্বারা অত্যাচারিত হইয়া থাকি তাহা রাজশাসনের দোষে নহে—

পরাধীনতার দোষে। কিন্তু তাহা তাঁহাদের ভ্রম। কেন না ধর্ম্মভয় প্রবল থাকিলে স্বদেশী বিদেশী ও স্বাধীন পরাধীন ভেদ থাকে না। কাহারও প্রতি অত্যাচার করা উচিত নয়, উহা যদি ধর্ম্মব্যবস্থা হয় ও তদনুসারে চলিতে মানব যদি বাধ্য হয়, তাহা হইলে স্বদেশী বিদেশী বলিয়া প্রভেদ হওয়া দূরে থাকুক পরদেশ জয় করিতেই মানবের প্রবৃত্তি হয় না। ধর্ম্মভাবের শিথিলতা প্রযুক্তই মানবমধ্যে এরূপ যুদ্ধবিগ্রহ, পরদেশ ও পরস্বত্ব আক্রমণ চেষ্টা হইয়া থাকে ও পরের প্রতি অত্যাচার সংঘটিত হয়। সুতরাং আমরা যদি পরাধীন বলিয়া রাজশাসনের যোগ্য ফল না পাই তাহা হইলেই বলিতে হইল রাজশাসন আমাদের পর্য্যাপ্ত নহে; উহাদ্বারা মানবকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করিতে পারা যায় না।

বাস্তবিক যাহারা ধর্ম্মব্যবস্থা মানে না বা তদনুসারে চলিতে পারে না, তাহাদের জন্যই সমাজশাসন ও রাজশাসন। ধর্ম্মশস্ত ব্যক্তির জন্য ঐ সকল ব্যবস্থা নহে। এই জন্য ধর্ম্মভীত ইংরাজ আমাদিগকে সুখে রাখিতে চেষ্টা করেন ও যাঁহারা ধর্ম্মশূন্য তাঁহারা আমাদিগের প্রতি অত্যাচার করেন। এই জন্য ধার্ম্মিক ইংরেজগণ ইলবার্ট বিল পাশ করিয়া সকলকে সমান বিচারাধিকার দিবার চেষ্টা করেন এবং যাঁহাদের ধর্ম্মভয় অল্প তাঁহারা আমাদিগকে অধার্ম্মিক ভাবিয়াই হউক, বা আপনাদের স্বার্থপরতা সাধন মানসেই হউক ঐ আইন যাহাতে বিধিবদ্ধ না হয় তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। যদি ধর্ম্মই মানবের একমাত্র কর্ত্তব্যপথের প্রদর্শক হইত, তাহা হইলে কখনই ইংরাজগণ আমাদিগকে উচ্চ পদ সকল হইতে বঞ্চিত করিতেন না—ভিন্ন চক্ষে দেখিতেন না, প্রত্যুত আমাদিগকে ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে অবলোকন করিতেন ও সর্ব্ব বিষয়ে সমান অধিকার প্রদান করিতেন—অথবা আমাদিগের প্রতি রাজশাসনের ভার দিয়া তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেন। ধর্ম্মমার্গই মানবের প্রধান অবলম্বনীয়, ইহা যদি প্রকৃত না হইত তাহা হইলে তাঁহাদের অন্যায় কার্য্যের জন্য আমরাও তাঁহাদিগকে ভৎর্সনা করিতে পারিতাম না। কেন না তাঁহারা যে অন্যায় কার্য্য করিতেছেন তাহা প্রমাণই করিতে পারিতাম না—কারণ তাঁহারা

রাজবিধির অন্যথা করিতেছেন না এবং তাঁহাদের ও আমাদের সমাজ যখন এক নহে, তখন সমাজ বিশেষের দণ্ডার্হও হইতেছেন না, সুতরাং তাঁহারা যে কোনমতে অন্যায়কারী তাহা আমাদের দেখাইবার কোন উপায়ই থাকিতে না। সুতরাং আমরা তাঁহাদিগকে অন্যায়কারী বলিলে আমরাই দণ্ডার্হ হইতাম—আমরাই রাজবিধির অন্যথাকারী অথবা রাজবিদ্রোহী বলিয়া গণ্য হইয়া দণ্ডনীয় হইতাম। যদি ধর্ম্মের দোহাই না দিতে পারিতাম তাহা হইলে আমরা কোনও প্রকারেই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত নীতির প্রতি দোষারোপ করিতে পারিতাম না। ধর্ম্মশাস্ত্র না থাকিলে অনেক সময়ে মানব এইরূপে অনন্যগতি হইয়া কষ্ট পায়। আমরা এক্ষণে রাজশাসনের কএকটী গুরুতর দোষের উল্লেখ করিতেছি।

রাজশাসন সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে আমাদিগকে ইংরাজ রাজ-নিয়ম অবলম্বন করিয়াই বলিয়া হইবে, কেন না তাহা না হইলে সকলে ভাল-রূপ বুঝিতে পারিবেন না। ইহাতে সাধারণের আপত্তিও অধিক হইবার সম্ভব নাই। কেন না ইংরাজ জাতি আজি সভ্যতার উচ্চসোপানে আরূঢ়। তাঁহাদের পদবী লাভে আজি সকলেই লালায়িত; সুতরাং তাঁহাদের নিয়ম যে জঘন্য একথা কেহই বলিতে পারিবেন না। আমরা দেখিতেছি ইংরাজরাজের যে সকল রাজবিধি আছে তাহার মধ্যে মানবকে দুষ্কর্ম্ম করিতে নিবৃত্ত করিবার বিধিই অধিক, সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তিদায়ক বিধি অতি অল্প। অধিক কি উপাধি দিবার নিয়ম ভিন্ন সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তিদায়ক অন্য কোনরূপ বিধি নাই বলিলেই হয়। ঐ বিধিও সুফলপ্রদ নহে। কারণ প্রথমতঃ ঐ সমস্ত সৎকর্ম্ম ধনসাপেক্ষ—ধনী ব্যক্তি ভিন্ন সে সুযোগ অন্যের হইবার সম্ভব নাই, দ্বিতীয়তঃ উপাধি পাইতে হইলে সকল সময়ে বাস্তবিক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয় না, অন্যায় কার্য্য করিয়াও অনেক সময়ে অনেকের উপাধি লাভ হয়। সুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ উপন্যাস।

রাজবিধির প্রধান দোষ এই যে, কি দুষ্কর্ম্ম নিবৃত্তির ব্যবস্থা কি সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তিদায়ক ব্যবস্থা কিছুই সুনিয়মে কার্য্যসাধক হয় না। অর্থবলে সমস্তই বিপর্য্যস্ত করিতে পারা যায়। বিশেষতঃ রাজনিয়মাবলীর মধ্যে এমন কতক-

গুলি বাধক নিয়ম আছে, যে, কেবল তাহারই দোষে অনেক সময়ে সত্য সকল গোপিত ও মিথ্যার প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মিথ্যাপথ অবলম্বন না করিলে লোকে ঐ সকল বাধক নিয়ম অতিক্রম করিয়া আপনার ধন প্রাণ রক্ষা করিতে পারে না। তজ্জন্য কি আত্মরক্ষাকারী কি পরানিষ্টকারী সকলেই নিয়ত মিথ্যাপথে চলিয়া থাকে। সচরাচর উহার এত আবশ্যক হয় যে ঐ মিথ্যা-ব্যবহারে লোকাপবাদও হয় না। আমি বিশ্বাস করিয়া তোমার উপকারার্থে টাকা ধার দিলাম, সাক্ষী রাখিলাম না, কিন্তু সাক্ষী ভিন্ন আইনানুসারে টাকা পাওয়া যায় না দেখিয়া মিথ্যা সাক্ষী প্রস্তুত করিলাম। আবার প্রমাণ দিতে পারিলেই ডিক্রি পাওয়া যায় দেখিয়া, তুমি টাকা না দিয়াও মিথ্যা সাক্ষীর সাহায্যে একজনের নামে নালিশ করিয়া ডিক্রি করিলে। রাজা এই গোলমাল দেখিয়া লিখিত দলিল, মুদ্রাযুক্ত আলেখ্য ও রেজেষ্টরি করিবার নিয়ম করিলেন। কিন্তু তাহাতে অধিকতর মিথ্যাচরণ ও অধিকতর জুয়াচুরি করিবার সুযোগ হইল। আইন যত কঠিন হইতে লাগিল প্রতারণা করিবার বুদ্ধি ও পথও তত বাড়িতে লাগিল। রাজা নিয়ম করিলেন কোন নির্দ্দিষ্টকালের মধ্যে অভিযোগ না করিলে কেহ আপন ক্ষতির পূরণ পাইবেন না—উদ্দেশ্য এই যে, বহুকাল পরে একজন আর একজনের নামে অভিযোগ করিয়া তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত না করিতে পারে। এই সুযোগ পাইয়া মিথ্যা প্রমাণের বলে লোকে যে অভিযোগ যথেষ্ট সময় থাকিতে হইয়াছিল তাহাও বিধি নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে হইয়াছে বলিয়া দোষ যুক্ত করিল। নিয়ম হইল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর অভিযোগ ভিন্ন ভিন্ন বিচারালয়ে করিতে হইবে এবং সম্পত্তির মূল্যানুসারে বিচারকর দিতে হইবে। এই সুযোগ পাইয়া দুষ্ট লোকেরা এমন সকল মিথ্যা প্রমাণ প্রদান করিতে লাগিল, যাহাতে প্রকৃত উপযুক্ত বিচারালয়ে উপস্থিত হয় নাই বলিয়া অথবা উপযুক্ত বিচারকর দেওয়া হয় নাই বলিয়া অভিযোক্তা তাড়িত হইল। বিচার প্রণালীর এইরূপ অসংখ্য প্রণালীগত নিয়ম আছে—অনেক সময়েই এই সকলের দায় হইতে উদ্ধার হইতে না পারিয়াই প্রকৃত সত্ববান সর্ব্বস্বান্ত হয় এবং দোষী নির্দ্দোষী ও নির্দ্দোষী দোষীরূপে

গণ্য হয়। ঐ সকল বিধির পরিমাণ এত অধিক যে, তাহা সাধারণে দূরে থাকুক, ব্যবহারজীবগণও তৎসমস্ত অবগত নহেন। আবার মনোমত না হওয়ায় বিধি সকল নিয়ত পরিবর্ত্তিত হওয়াতে বিধিজ্ঞ হইবার পক্ষে আরও বিঘ্নকর হয়। বিশেষতঃ কূটতার্কিক পণ্ডিতগণ বিধিবাক্যের ভাষার এমত নূতন অর্থ ব্যাখ্যা করেন যে, তাহাতেই অনেকের সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। ঐ অর্থ করার ভিন্নতা হেতু একই বিষয়ের কত ভিন্ন ভিন্ন নজির হইয়াছে ও তৎ সমস্ত লইয়া দারুণ গোলযোগ হইয়া থাকে। এই প্রকারে বিচার-কার্য্য-প্রণালী এরূপ জটিল হইয়াছে যে, তাহাকে সত্য রক্ষার উপায় না বলিয়া মিথ্যা সৃষ্টির এক মাত্র হেতু বলাই সঙ্গত। যাঁহার অর্থ অধিক আছে, যাঁহার উত্তম ফন্দিওয়ালা কর্ম্মকারক আছে, যিনি বিচক্ষণ উকীল পাইলেন তিনি সহস্র কুকর্ম্ম করিয়া অব্যাহতি পান ও পরের যথেষ্ট ক্ষতি করেন এবং যাঁহার ঐ সকল নাই তিনি বিনা দোষে দণ্ডিত ও সর্ব্বস্বান্ত হয়েন।

আবার বিচারকের প্রকৃতি, চরিত্র, সংস্কার ও বুদ্ধির উপর বিচারকার্য্যের মঙ্গলামঙ্গল অনেক নির্ভর করে। কোন বিচারকের সংস্কার আছে, জমীদার মাত্রই অত্যাচারী, তিনি সেই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া জমীদারের সমস্ত কথা—সমস্ত কাগজ অবিশ্বাস করিয়া অনেক সময়ে নিতান্ত নিরীহ জমীদারের সর্ব্বনাশ সাধন করেন। কোন বিচারকের সংস্কার আধুনিক প্রজাগণ অত্যন্ত দুষ্ট হইয়াছে, তিনি সেই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সাধু প্রজাগণের সর্ব্বস্বান্ত করেন। কোন বিচারক স্বজাতি বা আত্মীয়ের অনুরোধে নির্দ্দোষীর প্রতি অত্যাচার করেন। ও কোনও বিচারক বুঝিতে না পারিয়া বা অকারণ রাগান্ধ বা সংস্কার বিশিষ্ট হইয়া অন্যায় বিচার করেন। এইরূপ নানা প্রকারে রাজশাসন মানবের সমূহ অনিষ্টের কারণ হইয়াছে।

রাজবিধির প্রশ্রয়ে বা অত্যাচারে আজি দেশের এমন দুরবস্থা হইয়াছে যে, তাহা ভাবিলে শরীর লোমাঞ্চিত হয়। আজি প্রজাতে ভূম্যধিকারীতে উত্তমর্ণে ও অধমর্ণে, প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে এবং স্বজাতিও আত্মীয়-বর্গের মধ্যে পরস্পর ভয়ানক বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়াছে,—শত্রুতা বর্দ্ধিত

হইয়াছে। পরস্পর সকলেই সকলের অনিষ্ট সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে ভূম্যাধিকারী প্রজার পিতৃ তুল্য ছিল, এক্ষণে ভয়ানক প্রতিদ্বন্দী শত্রু হইয়াছে, রাজা তাহার রক্ষক হইয়াছেন। রাজা যত জমীদারদিগের অত্যাচার হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বিধি প্রণয়ণ করিতেছেন ততই পরস্পরের অসদ্ভাব বৃদ্ধি ও ক্ষতি হইতেছে। যত অধমর্ণদিগকে উত্তমর্ণদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে ততই তাহাদের মধ্যে বিবাদ বৃদ্ধি পাইতেছে। আজি প্রজা ভূম্যাধিকারীকে ও ভূম্যাধিকারী প্রজাকে বিশ্বাস করে না—উত্তমর্ণ অধমর্ণকে ও অধমর্ণ উত্তমর্ণকে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস বৃত্তি এককালে মানবহৃদয় হইতে চলিয়া গিয়াছে ও তাহার স্থানে রাজবিধি অধিষ্ঠিত হইয়াছে। যে বিশ্বাস করে সেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তজ্জন্য সে সাধারণের নিকট নিন্দনীয় হয়, অধিক কি যে বিশ্বাস করে সে আজি মহা মূর্খ বা অমানব নামে অভিহিত হইয়া সাধারণের ঘৃণার পাত্র হয়। সুতরাং সন্দেহজনিত মনোকষ্ট নিয়তই মানবকে ব্যথিত ও লজ্জিত করিতেছে।

এই ত গেল রাজবিধি, বিচারপ্রণালী ও বিচারকের দশা। তাহার উপর ব্যাবহার জীবিদিগের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি প্রায়ই সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য করিতে নিযুক্ত। তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য যে পক্ষে তাঁহারা বৃত হয়েন সে পক্ষের জয় কামনা। তাহা সহস্র মিথ্যা দোষে দুষ্ট হউক, মানবজাতির সমূহ অমঙ্গলের কারণ হউক তাহা তাঁহারা দেখিবেন না—যে পক্ষে বৃত হইয়াছেন তাহার মঙ্গল হইলেই হইল ও আপনার পসার বাড়িলেই হইল। এই জন্য কোন মকদ্দমার উত্তর দিতে হইলে আইনের সাহায্যে যত প্রকার উত্তর হইতে পারে উকীলগণ উত্তরপত্রমধ্যে তৎসমস্ত গুলিরই উল্লেখ করেন। যিনি কোনও একটীর উল্লেখ না করেন তিনি মূর্খ উকীল নামে অভিহিত হয়েন। উক্ত মকদ্দমায় বাস্তবিক সে দোষ হইয়াছে কি না তাহা তাঁহাদের দেখার আবশ্যক নাই। কেন না যে কোন উপায়ে হউক মকদ্দমায় জয়লাভ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য—অর্থীপ্রত্যর্থীগণের ন্যায় উকীলগণেরও সেই উদ্দেশ্য। ব্যাবহার জীবগণ ঐ জন্য বিধির অনুমোদিত

সমাজ প্রচলিত অসদুপায় সকল অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু সে সকল সাধারণের আবশ্যক, বিদ্যাসম্ভূত ও প্রচলিত বলিয়া অসৎ নামে অভিহিত হয় না। অনেক মকদ্দমা সেই সকল বাজে কথার দোষেই নষ্ট হইয়া যায় সত্য অনুসন্ধান অনেক মকদ্দমাতেই হয় না। অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রায় সকল উত্তরপত্রেই যথা সময়ে অভিযোগ উপস্থিত হয় নাই, উপযুক্ত বিচারালয়ে উপস্থিত হয় নাই, সম্পত্তির ন্যায্য মূল্য ধরা নাই, অভিযোগের প্রকৃত কারণ হয় নাই সকল প্রত্যর্থীর নাম উল্লেখ হয় নাই,সকল অর্থীর নাম প্রকাশ নাই প্রভৃতি বৃথা হেতুবাদে পরিপূর্ণ। ঐ সকল বাজে কথার প্রমাণ করিতে বা প্রমাণ খণ্ডন করিতে অর্থী ও প্রত্যর্থীর এত অর্থ ও কাল ব্যয় হয় যে তাহাতেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া মূল বিষয়ের নিকটেও হয়ত যাইতে পারেন না। আমরা দেখিয়াছি কেবল মাত্র ব্যবহারজীবদিগের বিদ্যাবুদ্ধি প্রভাবে ভয়ানক দোষী নির্দ্দোষী হইয়াছে ও নিতান্ত অনধিকারী অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে; এবং ব্যবহার জীবের অনুপযুক্ততা হেতু সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী দোষী হইয়াছে ও স্বত্ববান স্বত্বশূন্য হইয়াছে।

বিচার প্রণালীর আর একটি মহৎ দোষ আছে। সে দোষেও সমূহ অনিষ্ট সাধিত হয়। এমন কি সে দোষে অনেক মানব ধনে প্রাণে নষ্ট হইয়া যায়। সে দোষ এই যে, উচ্চ কর্ম্মচারীগণ নিয়ত নিম্ন কর্ম্মচারীদিগকে তাড়না করেন। কেন মকদ্দমা এত অল্প হয়,কেন মকদ্দমা আপীলে বিপরীত হয়,কেন আসামী-গণ দণ্ড না পায় কেন অপরাধকারী ধৃত না হয়, কেন এত অল্প কর আদায় হয়, কেন এত অল্প মদ্য বিক্রয় হয় ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চ কর্ম্মচারীগণ সর্ব্বদা নিম্ন কর্ম্মচারীগণকে ধমক দিয়া থাকেন। তাঁহারা ইহার উপযুক্ত উত্তর দিতে না পারিলে তাঁহাদের কর্ম্ম থাকে না। এজন্য বিচারকগণ ও নিম্ন-কর্ম্মচারীগণ জানিয়াও অন্যায় কার্য্য করিতে বাধ্য হয়েন। কোনও বিচারক একটী বিষয়ের সত্যতা স্পষ্ট বুঝিলেন, কিন্তু সত্য নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ এত ষড়যন্ত্র করিয়াছে, যে তাহার পক্ষে আইন অধিক সহ-কারী হইয়া পড়িয়াছে সুতরাং সত্য নিষ্পত্তি করিলে আপীলে থাকিবে না—এই জন্য বিচারক সত্য নির্ণয়ে অক্ষম হইলেন। এই জন্য অনেক সময়ে

যাহার ১০০ টাকা আয় নাই তাহার পক্ষে ১০০০ টাকার টেক্স ধার্য্য হয়। এই জন্য বাস্তবিক যে অপরাধী নহে তাঁহাকে অপরাধী বলিয়া ধরিতে পুলিস বাধ্য হয়েন ও মিথ্যা প্রমাণের সৃষ্টি করিয়া নিতান্ত নিরপরাধীকে নরহত্যা অপরাধে অপরাধী করিয়া তাহার প্রাণদণ্ড বা চিরনির্ব্বাসনদণ্ড ব্যবস্থা করেন। কি ভয়ানক অমানবকাণ্ড! এই সকলই কি মানবের মানবত্ব, দেবত্ব ও উন্নতি!!!

এতদ্ভিন্ন রাজশাসনের আরও অনেক অপকার আছে। সে সকল দ্বারা প্রায়ই নিরপরাধী অত্যাচারিত ও দোষী প্রশ্রয় পাইয়া সমাজের সমূহ অমঙ্গল সাধন করে। সে সকল দোষের সংখ্যা এত অধিক যে, সে সকলের আলোচনা করিতে হইলে বৃহৎ এক খানি গ্রন্থ হইয়া পড়ে। আমরা তাহার দুই একটী মাত্র দেখাইব। কোন ব্যক্তি অপরাধী বলিয়া অভিযুক্ত হইলেই অপরাধ বিশেষে তাহাকে প্রতিভূ দ্বারা মুক্ত হইতে হইবে ও অপরাধ বিশেষে যে পর্য্যন্ত নির্দ্দোষীরূপে প্রতিপন্ন না হইবে যে পর্য্যন্ত লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া তাহাকে কারা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। প্রতিভূ দেওয়ার নিয়মে অর্থ দণ্ড হয় মাত্র বটে কিন্তু তাহাও অন্যায় ক্ষতি। কিন্তু শেষোক্ত প্রকারের অভিযুক্তেরা যে কি ভয়ানক কষ্ট প্রাপ্ত ও অপমানিত হয় তাহা প্রকাশ করিয়া বুঝান যায় না। অপরাধী বলিয়া বিচারালয়ে আনীত হইলেই, সে প্রকৃত অপরাধী কি না তাহা না দেখিয়া তাহাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হয়। পুলিসের কুমন্ত্রণায় ঐরূপে কত ভদ্রলোক বৃথা কষ্ট পাইয়াছে। বিচার করিবার পূর্ব্বেই যে একজন নির্দ্দোষী নিরীহ ভদ্রলোককে এত কষ্ট দেওয়া ও অপমান করা হয়, সে কি রাজবিধির দোষ নহে? নিরীহ ব্যক্তি যে এক মাস, দেড় মাস ও কখনও কখনও ততোধিক কাল এইরূপে অপমানিত ও কষ্ট প্রাপ্ত হয়, সে কি রাজশাসনের দোষ নহে। ইহা অপেক্ষা অত্যাচার ও বিড়ম্বনা আর কি আছে? ইহা অপেক্ষা কি পশুজীবন ভাল নয়?

এত গেল অপরাধী দলভুক্ত লোকের কথা। যাহারা অপরাধীরূপে আনীত নহে এবং যাহারা অপরাধীর অপরাধ ও নিরপরাধীর নিরপরাধ প্রমাণরূপ অত্যাবশ্যক বৈধকার্য্য সম্পন্ন করিতে আইসে—সেই সাক্ষীদিগের

প্রতি যে অত্যাচার হয় তাহাও নিতান্ত সামান্য নহে? যিনি সাক্ষীরূপে বিচারালয়ে উপস্থিত হয়েন, তিনি অনেক সময়ে অপরাধী অপেক্ষাও অধিক অত্যাচরিত হয়েন। প্রথমে তিনি (প্রায়ই) বৃক্ষতলে প্রহরীর জিম্মায় রক্ষিত হয়েন। পরে সাক্ষীর আসন নামক অপমানসূচক স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া নিয়ত বিপক্ষের উকীলের বক্রোক্তি ও শ্লেষ বাক্য দ্বারা মর্ম্মাহত হয়েন ও নানা প্রকারে হাস্যাস্পদ ও অপমানিত হয়েন। কেন লোকে সাক্ষী দিতে আসিয়া এরূপে লাঞ্ছিত হয়েন? যিনি যথার্থ সাক্ষী দিতে আইসেন তাঁহার অপরাধ কি? সত্য কথা বলিয়া অত্যাচারীকে মুক্ত ও অত্যাচারকারীকে দণ্ডিত করিতে আসিয়া সমাজের স্থিতি সম্পাদনের চেষ্টা করিতে আসিয়া তিনি এমত কি অপরাধ করেন যে, তজ্জন্য এরূপে নিগৃহীত হয়েন? ইহা কি রাজশাসনের ভয়ানক কলঙ্কের কথা নহে? ইহা কি মানবের ভয়ানক বিড়ম্বনা নহে? রাজশাসনদ্বারা এইরূপ শত শত প্রকারে নির্দ্দোষীগণ তাড়িত, দুঃখ প্রাপ্ত ও অপমানিত হয়েন।

এই সকল নিয়ম যখন মানবের সুখের কারণ না হইয়া দুঃখেরই কারণ হইতেছে তখন রাজনিয়ম কি প্রকারে মানবকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট? তাহা যদি না হইল মানবকে কি প্রকারে কর্ত্তব্যপরায়ণ করিবে? পাঠক! তুমি হয় ত বলিবে ঐ সকল দোষযুক্ত নিয়ম সংশোধিত হইলেই রাজনিয়মের কোন দোষ থাকিতে পারে না। ঐ সকলের পরিবর্ত্তে ভালরূপ নিয়ম করিতে পারিলেই রাজনিয়ম দোষশূন্য হইতে পারে। আমরা বলি সে কথা নিতান্ত ভ্রান্তি মূলক। কারণ যে সকল নিয়মের দোষোল্লেখ হইল সে সকল নিয়ম যদি না থাকে তাহা হইলে আরও অধিক অত্যাচার সংঘটিত হয়। সে সকল বিস্তারিতরূপে বুঝাইতে গেলে প্রবন্ধ অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সংক্ষেপে দুই এক কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইব।

যদি অভিযোগ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় নির্দ্ধারিত না করা যায়, তাহা হইলে মানবের অভিযোগ আশঙ্কা কোন কালেই যায় না ও অনেক কাল বিলম্বে ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হইতে পারে না। যদি অবস্থা বিশেষে নির্দ্দিষ্ট বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত করিবার নিয়ম না করা যায়, তাহা

হইলে যেখানে অভিযোগ উপস্থিত করিলে অর্থী অন্যায় করিবার সুবিধা পাইতে পারে ও প্রত্যর্থীকে নানা প্রকার অসুবিধা ও কষ্টে ফেলিতে পারে তথায় অর্থী অভিযোগ উপস্থিত করিবে, এবং সামান্য বিষয়ের বিচারের জন্য সমধিক বেতনভোগী বিচারকের সময় অযথা নষ্ট করিয়া সাধারণের ক্ষতি হইতে পারে। যদি ব্যবসায়ী ব্যবহারজীবীনিয়োগের নিয়ম না থাকে তাহা হইলে অনেক অজ্ঞ ব্যক্তি প্রকৃত বিষয় বুঝাইয়া দিতে না পারিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাক্ষীকে যদি বক্রোক্তি প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষা করা না যায়, সাক্ষী যাহা বলিবে তাহাই যদি বিশ্বাস করা যায় তাহা হইলে আদৌ বিচার কার্য্য সম্পন্ন হয় না। উচ্চ কর্ম্মচারীগণ যদি নিম্ন কর্ম্মচারীদিগকে ধমক না দেন, তাহা হইলে অনেক কর্ম্মচারী অর্থ লোভে ও আত্মীয়াদির অনুরোধে ভয়ানক অত্যাচার ও অবিচার করিতে পারেন। এইরূপে দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যে সকল নিয়ম মানবের অত্যাচারের কারণ হইয়াছে, সেই সকল নিয়মই অত্যাচার নিবারণ জন্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সে সকল না থাকিলে মানবের আরও কষ্ট হয় ও রাজশাসনের ভয়ানক ব্যাঘাত হইত। সুতরাং স্পষ্ট বুঝা গেল যে, রাজশাসন দ্বারা মানবকে নিয়মিত করিতে হইলে ঐরূপ নিয়মের নিতান্ত আবশ্যক। আবার ইহাও বুঝা গেল যে ঐ সকল নিয়মের অস্তিত্ব ও মানবের কষ্টকর। ইহা দ্বারা কি বুঝা যাইতেছে না, যে রাজশাসন অমঙ্গল বিধান করিবেই করিবে? উহা দ্বারা যে বল পূর্ব্বক মানবের স্বাধীনতা হরণ করা হয় তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। অতএব রাজশাসনকে মানবের নিয়ামক, পথদর্শক ও সুখের উপায় কি প্রকারে বলিব? প্রত্যুত: উহাকে দুঃখেরই কারণ বলিতে হইবে।

যখন দেখা গেল রাজশসন দ্বারা মানবকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করিতে হইলে নিশ্চয়ই সমূহ অমঙ্গল ঘটিবে, তখন মানবের উপায় কি? সমাজ-শাসন যে প্রকৃত উপায় নহে তাহা বোধ হয় বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই। কেন না প্রথমতঃ সভ্য সমাজের সমাজশাসন ও রাজশাসন একই কথা। দ্বিতীয়তঃ উপরোক্তরূপ বা তথাবিধ নিয়মাবলীর দ্বারাই সমাজস্থ লোকের

শাসন করিতে হয়। সুতরাং তাহাতে উপরোক্ত রূপ দোষের সম্ভাবনা। তবে মানবকে কি প্রকারে কর্ত্তব্যপরায়ণ করিতে হইবে? কি প্রকারে মানব আপনার ও সমাজের মঙ্গল সাধন করিবে? কি প্রকারে মানব দুঃখরাশি হইতে বিমুক্ত হইবে? তাহার কি কোনও উপায় নাই? মানব কি এমত দুর্ভাগ্য জীব?

আমাদের বোধ হয় এ কথা কেহ স্বীকার করিবেন না—এ কথা কেহই বলিবেন না যে, মানব সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও শক্তিশূন্য দুর্ভাগ্য জীব। কেন না আমরা দেখিতেছি যে সময়ে মানব ভালরূপ উন্নতিলাভ করিতে পারেন নাই সে সময়েও মানব আপনার কার্য্যের সুব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। ধর্ম্ম বলে বলীয়ান হইয়া মানব সর্ব্ব প্রকার দুঃখকে পরাভব করিয়া সুখসম্পত্তি লাভ করিয়াছে। সুতরাং ধর্ম্মই মানবের পরম বা একমাত্র সহায়। ধর্ম্ম বল না থাকিলে মানব এক মুহূর্ত্তও বর্ত্তমান থাকিতে পারিত না। ধর্ম্ম বল থাকিলে মানবের আর কোন বলেরই আবশ্যক নাই। যাহাদের ধর্ম্ম বল নাই তাহাদের জন্যই অন্য বলের প্রয়োজন। তাহারাই দুর্দ্দান্ত রাজশাসনে নিপীড়িত হইয়া দুঃখ পায় ও সমাজ মধ্যে সমূহ দুঃখ প্রচার করে। যদি সকল মনুষ্য ধর্ম্ম বলে বলীয়ান হইত তাহা হইলে কি মানব মণ্ডলীর সুখের সীমা থাকিত?

ক্রমশঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বে আমারা বলিয়াছি, কেবল ক্ষমাদয়াদি ধর্ম্ম নহে—এক গালে চড় মারিলে আর এক গাল ফিরাইয়া দেওয়া মাত্র ধর্ম্ম নহে। ঐ সকল ও কাম, ক্রোধ, লোভাদি সমস্তই ধর্ম্মের অন্তর্গত—সকলের সামঞ্জস্যই ধর্ম্ম। যেরূপ কার্য্য করিলে বৃত্তিবিশেষের লোপ হয় তাহা ধর্ম্ম নহে। এই জন্য সামান্য একটী প্রচলিত শ্লোক আছে—

"অতিদর্পে হতালঙ্কা অতিমানেচ কৌরব।
অতিদানে বলীবদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্তংগর্হিতং॥

কোনও কার্য্য বা কোনও রিপুরই অত্যন্ত আধিক্য উচিত নহে। এরূপভাবে কার্য্য করিতে হইবে, যাহাতে সকল দিক্ বজায় থাকে। ক্ষমাদয়া ইতর প্রাণীতে নাই, ঐ সকল মানবীয় গুণ—কিন্তু কাম ক্রোধাদি মানবেও আছে, পশুতেও আছে! সুতরাং ঐ সকলকে পাশব বা মানবীয় গুণ বলা যাইতে পারে না—ঐ সকল জীব সাধারণের গুণ। মানব যদি জীবসাধারণ গুণ মাত্রের অধীন হইয়া কার্য্য করে, মানবীয় গুণানুসারে না চলে, তাহা হইলে মানবকে আর মানব বলা যাইতে পারে না—পশুই বলিতে হয়। কেন না যে কারণে মানব পশু হইতে ভিন্ন তাহা মানবে থাকিতেছে না। ঐরূপ যদি মানব কেবল মানবীয় গুণমাত্রেরই অধীন হইয়া কার্য্য করে, জীবসাধারণ গুণ সকল ত্যাগ করে, তাহা হইলে মানব জীবমধ্যে গণ্য হইতে পারে না—কেন না জড়াদি পদার্থ হইতে যে কারণে জীব ভিন্ন তাহা মানবে থাকিতেছে না, সুতরাং জীবসাধারণ গুণহীন হইলে মানবের জীবত্বই থাকে না—মানবত্ব, শ্রেষ্ঠজীবত্ব ত দূরের কথা। অতএব মানবত্ব বা মানবের ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে মানবকে জীবসাধারণ গুণ ও মানবীয়

গুণ উভয়েরই অধীন হইতে হইবে। কিন্তু ঐ উভয় প্রকার গুণ পরস্পর বিপরীত। বিপরীত গুণের কখনও সামঞ্জস্য হইতে পারে না। মনে কর লোভ বলিতেছে গ্রহণ কর, ত্যাগ বলিতেছে ত্যাগ কর অর্থাৎ গ্রহণের আবশ্যক নাই, ইহার মধ্যে একের কথা শুনিতে হইলে অপরের কথা অগ্রাহ্য করিতে হয়, ইহার সামঞ্জস্যও হইতে পারে না, কেন না 'হাঁ' 'ও' 'না' ইহার মধ্য স্থল কোথায়? যদি এক জন বলিত লক্ষ লও ও আর এক জন বলিত শত লও তাহা হইলে গড় করিয়া সামঞ্জস্য করা যাইত। কিন্তু 'হাঁ' 'ও' 'না' ইহার গড় কি হইবে? তবে মানব কিরূপে জীবসাধারণ গুণের সহিত মানবীয় গুণের সামঞ্জস্য করিবে? তাহার উপায় আছে—সেই উপায়ই প্রকৃত ধর্ম্মমার্গ। লোভ বলিল, গ্রহণ কর, মানব দেখিল লোভের কথা না শুনিলে তাহার জীবধর্ম্ম থাকে না—জীবন রক্ষা হয় না; অথচ ত্যাগের কথা না শুনিলেও মানবত্ব রক্ষা হয় না। তখন মানব জীবন রক্ষার জন্য জীবন ধারণোপযোগী লোভের কথা শুনিবে এবং ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য মানবীয় বৃত্তি ত্যাগ ও দয়াদির কথা শুনিবে, অর্থাৎ পরপীড়নাদি না করিয়া পরিমিতরূপ গ্রহণ করিবে। ঐরূপ কাহারও দুঃখে দুঃখিত হইয়া দান করিবার সময়ে আপনার জীব-ধর্ম্ম নষ্ট না হয় এরূপ বিবেচনা করিয়া ত্যাগ বা দয়াদির কথা মত দান করিবে। ইহারই নাম মানবীয় ও জৈব গুণ সকলের সামঞ্জস্য। আপন স্বত্ব হইতেও বঞ্চিত হইব না। পরস্বত্বেরও হানি করিব না, ইহাই মনুষ্যের কার্য্য সুতরাং মানবত্ব বা মানবের ধর্ম্ম। কেবল মানবীয় গুণে ভূষিত হইলেই ধর্ম্ম হয় না। হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন আর যত ভাল ধর্ম্ম আছে সে সকলের মতে মানব কেবল মানবীয় গুণেই ভূষিত হইবে। কিন্তু তাহা অসম্ভব সুতরাং প্রকৃত ধর্ম্ম নহে বলিয়া সে সকল ধর্ম্মের স্থায়িত্ব হয় না। হিন্দুধর্ম্ম মানবকে উভয় প্রকার গুণের সামঞ্জস্য করিতে বলিয়াছে বলিয়াই উহা এত উৎকৃষ্ট। বৌদ্ধ বলেন "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" খৃষ্টান বলেন "এক গালে চড় মারিলে আর এক গাল ফিরাইয়া দেও" কিন্তু হিন্দু ঐ সকল হইতেও উচ্চতর মানবীয় গুণে ভূষিত হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন—যাবার আবশ্যক মত অর্থাৎ জীবন নাশাদির আশঙ্কা

হইলে ছলে, বলে, কৌশলে শত্রু অর্থাৎ বিশ্বের অহিতকারীর দমন করিতেও বলিয়াছেন—অবস্থা, কাল, পাত্র ও উদ্দেশ্য বিবেচনায় কার্য্য করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাহাই সম্ভব, সুতরাং ন্যায্য। প্রথমোক্ত প্রণালী অসম্ভব সুতরাং অন্যায্য। ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের অধীন হইয়া কার্য্য করিলে উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক মানবের অস্তিত্বই থাকে না। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে কার্য্য করিলে উন্নতিও হইবে ধর্ম্ম রক্ষাও হইবে। এই জন্য হিন্দু, ধর্ম্ম ছাড়া আর কর্ত্তব্য জানে না এবং খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্য উন্নতির প্রতিরোধক দেখিয়া অন্যরূপ নীতির অনুসন্ধান করেন। আমরা হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করিবার জন্য যে প্রবন্ধ লিখিব তাহাতে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিব।

পাঠক! এখন ধর্ম্ম কাহাকে বলে বুঝিলেন কি? ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কাহাকে বলে তাহা বুঝিয়াছেন কি? ইন্দ্রিয়ের নাশের নাম ইন্দ্রিয়নিগ্রহ নহে—ইন্দ্রিয়ের প্রাধান্য খর্ব্ব করার নাম ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। ইন্দ্রিয়গণকে—পশুবৃত্তি সকলকে মানবীয় বৃত্তির অধীন করাকে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কহে। কামের এককালীন উচ্ছেদ করিতে হইবে না—সৃষ্টি লোপ করিতে হইবে না, উহাকে মানবীয় গুণের অধীন করিতে হইবে—ইচ্ছামত স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া আমোদ করিতে হইবে না, যেমন প্রাপ্ত তাহারই সহিত ঈশ্বরকার্য্য সাধন মানসে কাম রিপুর সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র পিণ্ডঃ প্রয়োজনঃ'। পাঠক! পিণ্ড শব্দের অর্থ বুঝিয়াছ কি? বোধ হয় তুমি পিণ্ডের কথা শুনিয়া ইংরাজদিগের হইতেও অধিক হাসিতেছ! কেন না তুমি পিণ্ডের আবশ্যক বুঝ নাই—তুমি এ গূঢ় মর্ম্ম বুঝ নাই যে, পিণ্ডের জন্যই পুত্রের আবশ্যক উহার অন্য কোন আবশ্যক নাই। তাহা তুমি যদি না স্বীকার কর তবে পুত্রের প্রয়োজন কি তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও। তোমাকে অবশ্যই বলিতে হইবে পুত্র না হইলে সৃষ্টি থাকে না। তুমি হয়ত বলিবে সৃষ্টি না থাকিলে তোমার কি? বরং সকল লোকে কমিয়া গেলে বাদাম সস্তা হইবে, তুমি সুখে দিন কাটাইবে—নির্ব্বিবাদে বসিয়া খাইবে। সৃষ্টিরক্ষার ভাবনায় তোমার প্রয়োজন কি? পাঠক এ উত্তর সঙ্গত হইল না—সৃষ্টিরক্ষা

করা যাঁহার কার্য্য তিনি সে ভাবনা আমাদিগকে দিয়াছেন—সেই ভাবনার নামই পিণ্ড। আর্য্যঋষি বলিয়াছেন, পিণ্ডের জন্য পুত্রের আবশ্যক—পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার হইবার জন্য পুত্র আবশ্যক; বড় হইয়া রোজগার করিয়া খাওয়াইবে বলিয়া নহে,এবং এবম্বিধ পুত্রলাভের জন্য স্ত্রী আবশ্যক—ইন্দ্রিয় চরিতার্থ ও ঘর করার সুখের জন্য নহে। যদিও পুত্র পিতাকে বৃদ্ধকালে প্রতিপালন করিবে ও স্ত্রীপুত্র ও পিতা পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিবে কিন্তু সে উদ্দেশে বিবাহ করিবে না—পিণ্ডই মূল উদ্দেশ্য থাকিবে—গূঢ় ঈশ্বরকার্য্য সাধনই মূল উদ্দেশ্য থাকিবে। এইরূপে আমাদের যত বৃত্তি আছে সমস্তই ঈশ্বরকার্য্য সাধন জন্য ব্যবহার করিতে হইবে। ঈশ্বরকার্য্যে ব্যবহৃত হইতে না পারিলে কোনও বৃত্তিরই ব্যবহার করিবে না। তজ্জন্য বৃত্তি বিশেষের উচ্ছেদ আবশ্যক হইলেও করিতে হইবে। সেই জন্যই ঋষিরা যোগক্রিয়ার আবশ্যকতা স্বীকার করেন। ঐ ঐ স্থলে বৃত্তি বিশেষের এককালীন উচ্ছেদ ও বৃত্তি বিশেষের সম্পূর্ণ স্ফূরণ করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট মত বৃত্তিসকলের ব্যবহার করার নামই যোগ অর্থাৎ আবশ্যক মত বৃত্তিবিশেষের দমন ও উত্তেজন এবং উচ্ছেদসাধন ও সম্পূর্ণ স্ফূরণের নাম যোগ। ঐরূপ যোগের আবশ্যকতা স্পষ্টই অনুভূত হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে শক্তিবিশেষ, বৃত্তিবিশেষ, পদার্থবিশেষ কোন কার্য্যেই আইসে না—সকল বীজ অঙ্কুরিত হয় না, সকল অঙ্কুর পরিবর্দ্ধিত হয় না, সকল বৃক্ষ ফলপ্রসূ হয় না; সকল শুক্রে জীব জন্মে না, সকল জীব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় হয় না ও সকল জীবের সন্তান জন্মে না। ঐরূপ সকলের পক্ষে সকল বৃত্তির কর্য্যের আবশ্যক হয় না। তাই বিধবার ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি করিতে না পারা অন্যায় নহে। তাই যোগীর বৃত্তিবিশেষ উচ্ছেদ করায় দোষ নাই। বৃত্তিবিশেষের এককালীন উচ্ছেদ সাধন করাকেই যে যোগ বলে তাহা নহে। বৃত্তিবিশেষের দমন ও বৃত্তিবিশেষের উত্তেজন প্রক্রিয়াকেও যোগ বলে। যোগীগণের যোগ প্রথম প্রকারের এবং ভারতীয় জাতি ভেদ প্রথা শেষোক্ত প্রকারের যোগের দৃষ্টান্ত স্থল। যে জাতির প্রতি যে কার্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছে, সে জাতিকে তদনুরূপ বৃত্তির উত্তেজন ও অন্য বৃত্তির দমন করিতে

হয়। ব্রাহ্মণ ক্ষমা দয়াদি মানবীয় বৃত্তির উত্তেজন ও কামক্রোধাদি জৈববৃত্তির দমন করিবেন—ক্ষত্রিয়ের ঐ সকলের সহিত পাশব বলের অনুশীলন ও আবশ্যক—যে ব্রাহ্মণীয় গুণ থাকিলে ঐ বলের খর্ব্বতা হয় তাহা তিনি করিবেন না আবশ্যক মত বল প্রয়োগ না। করিলে ক্ষত্রীয়ের ক্ষত্রীয়ত্ব ও ধর্ম্ম থাকে না; তাই কৃষ্ণ বলিতেছেন, অর্জ্জুন! যদি ক্ষত্রিয়ত্ব বা স্বভাব বজায় রাখিতে চাও যদি তোমার ধর্ম্ম রক্ষা করিতে চাও তবে আপনার বা পরের মৃত্যু ভয় করিওনা। মৃত্যু অতি অকিঞ্চিৎকর—ধর্ম্মই মানবের সার।

পাঠক! যদি বলেন কৃষ্ণ এরূপ সদভিপ্রায়ে যে অর্জ্জুনকে হিতোপদেশ দিয়াছেন—দুষ্কর্ম্মের উত্তেজনার জন্য দেন নাই তাহার প্রমাণ কি? আমরা বলি তাহার প্রমাণ স্বয়ং ভগবদ্গীতা। ভগবদ্গীতার আদ্যোপান্ত পাঠ করুন, বুঝিতে পারিবেন। আমরা ক্রমে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। ইহার পরেই কৃষ্ণ কহিলেন—

এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তোযযা পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥
নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়োন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ ॥ ৪০ ॥
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখাহ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাং। ৪১।
যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাজন্মকর্ম্মফলপ্রদাং।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥
ত্রৈগুণ্যবিষয়াবেদানিস্ত্রৈগুণ্যোভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বোনিত্যসত্ত্বস্থোনির্যোগক্ষেমআত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥
কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭ ॥
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যাসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগউচ্যতে ॥ ৪৮ ॥
দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥
বুদ্ধিযুক্তোজহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং ॥ ৫০ ॥
কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তাহি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ং ॥ ৫১ ॥
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২ ॥
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

"হে পার্থ! যে জ্ঞান দ্বারা আত্মতত্ত্ব সম্যক্ প্রকাশিত হয়, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে কর্ম্মযোগবিষয়িণী বুদ্ধি অবগত হও; এই বুদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তুমি কর্ম্মরূপ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে। কর্ম্ম যোগের অনুষ্ঠান বিফল হয় না; তাহাতে প্রত্যবায়ও নাই; ধর্ম্মের অত্যল্প অংশও মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করে। কর্ম্মযোগ বিষয়ে সংশয়রহিত বুদ্ধি এক-মাত্র হইয়া থাকে; কিন্তু প্রমাণজনিত বিবেকরহিত ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি অনন্ত ও বহু শাখাবিশিষ্ট। যাহারা আপাতমনোহর শ্রবণরমণীয় বাক্যে অনুরক্ত; বহুবিধ ফলপ্রকাশক বেদ বাক্যই যাহাদিগের প্রীতিকর; যাহারা স্বর্গাদি ফলসাধন কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছুই স্বীকার করে না; যাহারা কামনাপরায়ণ; স্বর্গই যাহাদিগের পরম পুরুষার্থ; জন্ম, কর্ম্ম ও ফলপ্রদ. ভোগ ও ঐশ্বর্য্য লাভের সাধনভূত, নানাবিধ ক্রিয়াপ্রকাশক বাক্যে যাহাদিগের চিত্ত অপহৃত

হইয়াছে এবং যাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে একান্ত সংসক্ত; সেই বিবেকবিহীন মূঢ় ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি সমাধি বিষয়ে সংশয়শূন্য হয় না। বেদ সকল সকাম ব্যক্তিদিগের কর্ম্মফলপ্রতিপাদক; অতএব তুমি শীতোষ্ণ ও সুখ দুঃখাদি দ্বন্দসহিষ্ণু ধৈর্য্যশালী, যোগক্ষেমরহিত ও অপ্রমাদী হইয়া নিষ্কাম হও। যেমন কূপ, বাপী, তড়াগ প্রভৃতি জলাশয়ে যে সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়; একমাত্র মহাহ্রদে সেই সকল প্রয়োজন সম্পন্ন হইয়া থাকে; সেইরূপ সমুদায় বেদে যে সকল কর্ম্মফল বর্ণিত আছে, সংশয়রহিত বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ একমাত্র ব্রহ্মে তৎসমুদায়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কর্ম্মেই তোমার অধিকার হউক, কর্ম্মফলে যেন কামনা না হয়; কর্ম্মফল যেন তোমার প্রবৃত্তির হেতু না হয় এবং কর্ম্ম পরিত্যাগে তোমার আসক্তি না হউক। তুমি আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়ই তুল্য জ্ঞান করতঃ কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান কর; পণ্ডিতেরা সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়ের তুল্য জ্ঞানই যোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংশয়রহিত বুদ্ধি দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ; কাম্য কর্ম্মসমুদায় সাতিশয় অপকৃষ্ট; অতএব তুমি কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান কর; সকাম ব্যক্তিরা অতি দীন। যাঁহার কর্ম্মযোগবিষয়িণী বুদ্ধি উপস্থিত হয়; তিনি ইহ জন্মেই পরমেশ্বরপ্রসাদে সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয় পরিত্যাগ করেন; অতএব কর্ম্মযোগের নিমিত্ত যত্ন কর; ঈশ্বরারাধন দ্বারা বন্ধনহেতু কর্ম্মসকলের মোক্ষসাধনতাসম্পাদক চাতুর্য্যই যোগ। কর্ম্মযোগবিশিষ্ট মনীষিগণ কর্ম্মজনিত ফল পরিত্যাগ করেন; সুতরাং জন্মবন্ধন হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া অনাময় পদ প্রাপ্ত হন। যখন তোমার বুদ্ধি অতি দুর্গম মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইবে; তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়ে বৈরাগ্য লাভ করিবে; তাহার আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিবে না। তোমার বুদ্ধি নানাবিধ বৈদিক ও লৌকিক বিষয় শ্রবণে উদ্ভ্রান্ত হইয়া আছে; যখন উহা বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট না হইয়া স্থিরভাবে পরমেশ্বরে অবস্থান করিবে; তখনই তুমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে।”

ক্রমশঃ

শরীরের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এক্ষণে দেখিতে হইবে, মৃতশরীর যখন কোন কার্য্যকারক নহে, মৃত-শরীর যখন মৃত্তিকা কি কাষ্ঠাদির মত জড় ও অকর্ম্মণ্য, তখন আত্মাশ্রিত শরীরের আত্মগুণ দেখিয়া শরীর রক্ষার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হওয়াই শাস্ত্রকারদের উদ্দেশ্য। শরীর মধ্যে যে আত্মা আছে, প্রায় সকল শাস্ত্রে তৎপক্ষে মত বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের ঋষিগণও আপন আপন শাস্ত্রে প্রকৃতি, পরমাণু, স্বভাব ইত্যাদি নানাপ্রকারে আত্মপদার্থ নির্ব্বাচন করিয়াছেন। কেহ আত্মা স্বীকার করেন, কেহ বা একেবারে স্বীকার করিতে অসমর্থ, কেহবা প্রকারান্তরে স্বীকার করেন, অপরে শক্তিবিশেষ দ্বারা তাহার প্রমাণ করেন, কেহ বা কতকগুলিন গুণসমষ্টির আধার স্বরূপ বলিয়া থাকেন, অন্যে জ্ঞানস্বরূপ স্বীকার করেন। নাস্তিকেরা রক্ত মাংস, অস্থি ও শুক্র-সংযোগে নূতন শক্তিবিশেষ বা, স্বভাব বলিয়া স্বীকার করেন। যিনি যাহা স্বীকার করুন, শুষ্ক বা নীরস আত্মা যাঁহারা স্বীকার করেন, আমরা তাঁহাদের মতে অগ্রসর হইতে পারিলাম না। তবে সুখদুঃখ, ইচ্ছা, যত্ন, দ্বেষ, হিংসা উপকার ও জ্ঞান প্রভৃতি গুণ সমুদায়, যাঁহার লীলামাত্রে ঘটিতেছে, সুকার্য্য করিয়া পরিণামে যে আনন্দানুভব করিতেছে, পাপকার্য্য করিয়া মনো মধ্যে যে দুঃখ জালে জড়িত হইতেছে, এক বস্তু অভেদ দেখিয়া বিশ-বৎসর পরে যে তাহাকে স্মরণ করিতে পারিয়াছে, সেই দেহের শীরভূত,

জ্ঞানাশ্রয় আত্মার স্বাভাবিক কতকগুলিন কার্য্য দেখিয়া সূক্ষ্ম ও চৈতন্য স্বরূপ আত্মা স্বীকার করিয়া থাকি। যিনি আমাদিগকে ঘৃণা করিবেন, করুন আমরা নিরস্ত থাকিব। কারণ, আমাদের হৃদয় আছে, সুতরাং হৃদয়ের মধ্যে যে কি এক অনির্ব্বাচ্য পদার্থ আছে তাহা আমারা অনুভব করিয়া থাকি। একটা অসৎ কার্য্য বা পাপকর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে সেই সূক্ষ্ম পদার্থ অলক্ষিত ভাবে আমাদের হৃদয়ে যে কি অমৃতধারা ঢালিয়া দেয় তাহা প্রকাশ করা বড়ই কঠিন। বস্তুতঃ সেই চৈতন্য শক্তির সাহায্যে সদসৎ প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। যিনি ঐহিক দেহের সুখভোগ পর্য্যন্ত সীমা ভাবিয়াছেন, পশুপক্ষীর মতন আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন এই কয়টি নিকৃষ্ট কার্য্যকে জীবনের সার ভাবিয়াছেন ও স্থূল শরীরের সুখ সম্পাদন করা উচ্চ কার্য্য ভাবিয়া থাকেন, পরের রমণীকে পশুর চক্ষে দর্শন করিয়া পশুসাদৃশ্য লাভ করিয়াছেন সেই অসার, অপদার্থ, ধর্ম্মবঞ্চক হৃদয়শূন্য ও মিথ্যাবাদী নিকৃষ্ট মানবদের সহিত আমাদের কোন সংস্রব নাই। শরীর মধ্যে এমন একটা পদার্থ আছে যাহাদ্বারা ক্ষুধা তৃষ্ণা, শোক দুঃখ প্রভৃতি অনুভূত হয় এরূপ কথা তাঁহারা স্বীকার করেন—প্রত্যক্ষের অপলাপ করিতে পারেন না বলিয়া স্বীকার করেন। এরূপ করিয়াও লোকের কাছে আত্মা নাই বলা অবশ্যই হৃদয়-শূন্য ব্যক্তির কার্য্য। যাহার হৃদয় আছে তাহারই আত্মা আছে।

"আত্মা সর্ব্বগতোহপ্যেব বিশেষাদ্ হৃদি তিষ্ঠতি।

যতঃ সমগ্রজন্তূনাং বিজ্ঞানং হৃদি লভ্যতে।,। ২। ৩৯৭।

আত্মা সর্ব্বব্যাপী সত্য কিন্তু একমাত্র হৃদয় (আত্মপুরাণ) আত্মার আবাসগৃহ। কারণ, সকলজন্তুর জ্ঞান কেবল হৃদয়েই উপলব্ধি হইয়া থাকে।

এই কারণে যাহার হৃদয় নাই, তাহার আত্মাও নাই বলিতে হইল। কিন্তু অনুভব করিয়া কি প্রত্যক্ষবৎ প্রত্যয় করিয়া যাঁহারা লোকের কাছে বলিবেন আত্মা নাই, আত্মার সুখ দুঃখাদি গুণ সকলও নাই তাঁহাদের কথা আমাদের আগ্রহাতিশয় হইবেনা। ফলতঃ অতি অল্প লোকই

আত্মার অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়া থাকেন। তবে বুদ্ধিশক্তির ন্যূনাধিক বশতঃ নানান্তরে, কি প্রকারান্তরে আত্মা স্বীকার করা অসম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের হিন্দুশাস্ত্রকারেরা আত্মার সহিত শরীরের সম্বন্ধ, কেবল যে এক জন্মে স্বীকার করেন, তাহা নহে কিন্তু স্বস্বকর্ম্মফলের অনুসারে যতবার জীব হইয়া এই জগতে জন্মগ্রহণ করেন ততবারই অনন্ত ও অখণ্ড আত্মার অংশস্বরূপ জীবের নব নব শরীরের সহিত সম্বন্ধ থাকিবে। অধুনা পরজন্ম, পূর্ব্ব জন্ম কি পরকালের কথা লইয়া কালহরণ করিলে আমাদের উদ্দেশ্য হানি হইবে, এইজন্য এসম্বন্ধে অধিক লেখা হইল না। এ সকলের সবিশেষ বিবরণ, আমার প্রণীত কর্ম্মফল নামক ক্ষুদ্রপুস্তক পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন।

আত্মা চৈতন্যস্বরূপ নিত্য ও জ্ঞানময়। জড়দেহে আত্মসম্বন্ধ থাকাতেই দেহের ক্রিয়া দেখা যায়। গমন, ভোজন, শয়ন, সমুদয়ই শারীরিক ক্রিয়া। কিন্তু গমন করিয়া ক্লান্ত হইলে যে ক্লেশ হয়, তাহার অনুভবকর্ত্তা শরীর নয়, তাহার অনুভব কর্ত্তা জীবাত্মা। ভোজন ও পানাদি কার্য্যে শরীরের পুষ্টি সাধন হয়। যে কয় উপাদানে শরীর গঠিত, সেই ভৌতিক শরীরের রক্ষা করিতে হইলে ভোজন পান ইত্যাদি আবশ্যক। তাহা না করিলে দেহ জীর্ণ হইয়া যায়, অবিলম্বে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হয়।

আমরা যে খাদ্য খাইয়া থাকি, আমরা যে জলপান করিয়া থাকি সেই অন্নপানাদির সহিত আমাদের শরীরে যে তৈজস ভাগ প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তৎসমুদায় শরীর রক্ষার উপযুক্ত বস্তু। তন্নিমিত্ত ছান্দোগ্য উপনিষদের চারিটি কবিতা উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা—

"অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠোধাতুস্তৎ
পুরীষং ভবতি যো মধ্যম স্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠ স্তন্মনঃ॥" ৬। ৫। ৪। ১।

আমরা যে অন্ন অর্থাৎ খাদ্যসামগ্রী ভোজন করিয়া থাকি, তাহা উদরস্থ হইয়া তিন ভাগে বিভক্ত হয়। ঐ অন্নে যে স্থূলতর ধাতু আছে, তাহা-বিষ্ঠারূপে পরিণত হয়, যে মধ্যম ধাতু, তাহা মাংস হয় ও যাহা অণুতর ধাতু আছে, তাহা মন হয়, অর্থাৎ মনে মিশাইয়া যায়।

"আপঃ পীতাস্ত্রেধা বিধীয়ন্তে তাসাং যঃ স্থবিষ্ঠোধাতুস্তন্
মূত্রং ভবতি যো মধ্যমস্তল্লোহিতং যোঽণিষ্ঠঃ স প্রাণঃ।" ৬।৫।৪।২

আমরা যে জল পান করিয়া থাকি তাহা উদরস্থ হইলে তিন ভাগে বিভক্ত হয়। তাহার স্থূল ধাতু অর্থাৎ স্থূলভাগ মূত্র হয়, মধ্যম ভাগ রক্ত হয় ও তাহার সূক্ষ্ম ভাগ প্রাণরূপে পরিণত হয়।

"তেজোঽশিতং ত্রেধাবিধীয়ন্তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠোধাতুস্তদস্থি
ভবতি যো মধ্যমঃ স মজ্জা যোঽণিষ্ঠঃ সবাক্।" ৬।৫।৪।৩।

তেজ বা তেজস্কর বস্তু ভক্ষিত হইলে তাহা তিন ভাগে বিভক্ত হয়। তাহার স্থূল ভাগ অস্থি, মধ্যম ভাগ মজ্জা ও সূক্ষ্ম ভাগ বাক্য হইয়া থাকে।

" অন্নময়ং হি সৌম্য! মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজময়ী বাগিতি
ভূয় এব মা ভগবন্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথাসৌম্যেতি হোবাচ।" ৬।৫।৪।

গুরু শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। হে প্রিয়দর্শন! মন অন্নময় প্রাণ জলময় ও বাক্য তেজময়। শিষ্য তাহা শুনিয়া বলিল, আপনি পুনরায় আমাকে এই বিষয়ের উপদেশ দিন। গুরু শিষ্য বাক্যে সম্মত হইয়া ঐ সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ।

ধর্ম্মশাস্ত্রের আবশ্যকতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যতদূর আলোচনা করা গেল, তাহাতে বুঝা গেল যে, মানবকে নিয়মিত রাখিবার জন্য নিয়মবিশেষের, শাসনবিশেষের নিতান্ত প্রয়োজন অথচ রাজ-শাসন ও সমাজ-শাসন মানবের নিতান্ত কষ্টকর। তাহা যদি হইল তবে

মানবকে নিয়মিত করিবার উপায় কি? পশ্বাদির ন্যায় যখন কেবল মাত্র স্বাভাবিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া মানব চলিতে পারে না, তখন চালাইবার উপায় কি? যখন উন্নতি করা মানবের পক্ষে একান্ত আবশ্যক, তখন মানব কোন পথে চলিলে উন্নত হইবে? চেষ্টাই যখন মানবের উন্নতির প্রধান হেতু তখন কি নিয়মে মানব চেষ্টা করিবে? যখন ভাল মন্দ করিবার জন্য মানব নিজেই দায়ী তখন মানব কি প্রকারে ভালমন্দ নির্ব্বাচন করিবে? যখন মানব কর্ত্তব্যকার্য্য করিতে ও অকর্ত্তব্য কার্য্য না করিতে বাধ্য তখন কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য কি প্রকারে স্থির করিবে? যখন স্বাভাবিক ও সামাজিক নিয়মানুসারে চলা কঠিন ও চলিলেও পদে পদে বিপদাশঙ্কা তখন মানব কিরূপে নিয়মিত হইবে, কিরূপে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবে?

পাঠক! তুমি হয়ত বলিবে মানব স্বাধীন, শক্তিমান্, বুদ্ধিমান্, অন্তঃসংজ্ঞা (Conscience) শালী, সেই সকল শক্তিবলে মানব আপনা আপনি কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া লইবে। কোন প্রকার শাসনের অধীন তাহাকে হইতে হইবে না। আমরা বলি সেটা তোমার ভুল। কেন না আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়া আসিয়াছি—যে যদি কোন জীব স্বাধীন পদবাচ্য হয় তবে সে ইতর প্রাণী; মানব স্বাধীন নহে, প্রত্যুত সম্পূর্ণ পরাধীন। মানব উন্নতিশীল ও শিক্ষার অধীন। এমন কোন শক্তি মানবে নাই, যে, তদ্দ্বারা মানব চালিত হইতে পারে। যদি সেরূপ শক্তি মানবে থাকিত তাহা হইলে কখনই সহস্র সহস্র ভিন্ন প্রকৃতির মানব হইতে পারিত না। প্রচলিত কথাই আছে—"ভিন্ন-রুচির্হি লোকঃ"। বাস্তবিক ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের বুদ্ধি ভিন্ন, প্রকৃতি ভিন্ন, রুচি ভিন্ন, শক্তি ভিন্ন, ও অবস্থা ভিন্ন। আবার ঐ সকল কারণে সকল মনুষ্য সমানরূপ উপকরণ প্রাপ্ত হয় না; সকলে সমানরূপ বিদ্যা শিখিতে পারে না, বা সমানরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে না। যদি অন্তঃসংজ্ঞার সাহায্যেই মানব কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে বিদ্যা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতির প্রয়োজন মানবের হয় না—সুতরাং মানবকে উন্নতিশীল জীব বলা আবশ্যক নাই এবং উন্নতি মানবের প্রয়োজনীয় নহে বলিতে হয়। "কেন না যে বিদ্যা শিখিয়াছে ও যে না শিখিয়াছে, উভয়ই

যদি অন্তঃসংজ্ঞার সাহায্যে কর্ত্তব্যনিরূপণ করিতে পারে তবে বিদ্যা শিখিবার প্রয়োজন কি? তাহা হইলে স্বাভাবিক অন্তঃসংজ্ঞাই মানবের মানবত্বের কারণ হইল। পশুর যেমন স্বাভাবিক সংস্কার (Instinct) তাহার কার্য্যের একমাত্র প্রবর্ত্তক মানবের অন্তঃসংজ্ঞাও (Conscience) সেইরূপ মানবের একমাত্র কার্য্য প্রবর্ত্তক। সুতরাং পশ্বাদির যেরূপ বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন এবং নাই মানবেরও সেইরূপ বিদ্যাশিখিবার বা উন্নত হইবার প্রয়োজন হয় না। তাহা হইলে বলিতে হয় যে, কীট হইতে পতঙ্গ যেরূপ উন্নত, পতঙ্গ হইতে পশ্বাদি যেরূপ উন্নত, পশ্বাদি হইতে মানবও সেইরূপ উন্নত। সংস্কার (Instinct) যেমন পশ্বাদির একমাত্র পরিচালক, অন্তঃসংজ্ঞাও সেইরূপ মানবের একমাত্র পরিচালক। পশ্বাদির যেরূপ বিদ্যাশিক্ষা ও উন্নতির আবশ্যক নাই মানবেরও সেইরূপ বিদ্যাশিক্ষা ও উন্নতির আবশ্যক নাই।

পাঠক! এ কথা কি তোমার বলিতে ইচ্ছা হয়? তাহা যদি না হয় তবে প্রত্যেক মানব আপন বিবেচনায় চলিবে কি প্রকারে বল? কি প্রকারে বল Conscience মানবের একমাত্র পথপ্রদর্শক? তবে তুমি যদি বল, মানবের অন্তঃসংজ্ঞাকে (Conscience) বিদ্যাদিদ্বারা পরিশুদ্ধ করিতে হইবে, তাহা হইলে Conscience আছে বলা আর নাই বলা তুল্য কথা। কেন না শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অনুসারে যখন Consciecne এর শক্তি ভিন্ন হইল ও তজ্জন্য মানবকে শিক্ষিত হইতে হইল তখন মানব আপন Conscience মাত্রের অধীন কি প্রকারে বলিব? কি প্রকারে বলিব যে, মানব আপন বিবেচনা মাত্রের উপর নির্ভর করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে চলিতে পারে। মানবকে শিক্ষার অধীন হইতে হইলেই পরাধীন হইতে হইল। কেন না অন্যের মতানুবর্ত্তী হইতে বলার নাম শিক্ষা। সুতরাং মানবকে শিক্ষা করিতে বলিলেই পরানুবর্ত্তন করিতে বলা হইল, Conscinceকে ও পরানুবর্ত্তন করিতে হইল। তাহা যদি হইল তবে মানব আপন মতে চলিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ হইবে বলা কিরূপে সঙ্গত হয়?

পাঠক! তুমি বলিতেছ শিক্ষা মানবের নিতান্ত আবশ্যক ও শিক্ষত

ধর্ম্মশাস্ত্রের আবশ্যকতা।

মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃত মানব পদবাচ্য। আবার ইহাও বলিতে
অন্তঃসংজ্ঞাই মানবের শ্রেষ্ঠতার একমাত্র কারণ। এই বাক্য দুইটী
বিপরীত নহে? তাহা যদি না বল, তবে তুমি শিক্ষা কাহাকে বলে বল
করি পড়িতে শেখার নাম শিক্ষা? না লিখিতে শেখার নাম শি
অবশ্যই বুঝিয়াছ উহার কিছুই শিক্ষা নহে। উহা যে শিক্ষা করি
মাত্র তাহা বোধ হয় তোমার বুঝিতে বাকী নাই। কোন মনোগ
প্রকাশ করিবার জন্য যেমন তুমি কথিত ভাষা ব্যবহার কর, সেইর
ভাব দূরস্থ ব্যক্তিকে ও ভবিষ্যৎকালে বুঝাইবার জন্য লিখিত ভা
কর। পণ্ডিতেরা ঐরূপে যাহা লিখিত ভাষায় রাখিয়াছেন তাহা বু
নাম পড়া ও ঐরূপে রাখিতে পারার নাম লেখা। সুতরাং লেখা
উহাই বুঝিতে হইবে যে অন্য ব্যক্তি সঙ্কেতে যে মনোগত ভাব
করিয়া গিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা ও অন্যে বুঝিতে পারে
সঙ্কেতে সেই সকল ও আপন মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে পা
লেখাপড়া আর কিছুই নহে। শিক্ষা করিতে হইলে অন্যের জ্ঞাত ব
জানা আবশ্যক ও শিক্ষিত হইলে অন্যকেও আপন জ্ঞাত বিষয় স
আবশ্যক, এই জন্যই শিক্ষার নাম লেখাপড়া। অর্থাৎ লেখাপড়া
ভালরূপ শিক্ষা হয় না। কেননা যাহারা লেখাপড়া জানে না
কেবল সম্মুখস্থ ব্যক্তির নিকট মাত্র হইতে শিখিতে হয়, তাহারা
ব্যক্তির নিকট হইতে শিখিতে পারে না। এবং সম্মুখস্থ ব্যক্তিরা
তাহাও সমস্ত স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে না। সুতরাং তাহা
নিতান্ত অল্প হয়। কিন্তু যাহারা লেখাপড়া জানে তাহারা বহুসহস্র ব
যে সকল পণ্ডিত যাহা বলিয়াছেন তাহা শিখিতে পারে এবং
যাহা বলেন তাহা লিখিয়া রাখিয়া পরে অভ্যাস করিতে পারে।
লেখাপড়া জানা লোকেরাই শিক্ষিত মধ্যে গণ্য, নচেৎ লেখাপড়া
যাহারা লেখাপড়া করিয়াছে কিন্তু শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা করে নাই ত
কখনও শিক্ষিত বলা যাইতে পারে না বরং যাহারা লেখাপড়া না
শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা করিয়াছে তাহাদিগকে শিক্ষিত বলা যাইতে

অতএব লেখাপড়া শিক্ষা অর্থাৎ কি বাঙ্গালা কি ইংরাজি কি সংস্কৃত অথবা সমস্ত ভাষা শিক্ষাকে শিক্ষা বলা যায় না। কার্য্যপ্রণালী, পদার্থ-শক্তি, বিশ্বতত্ত্ব ও ঈশ্বরনিয়ম শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। কিন্তু ঐ শিক্ষা কি আপনা হইতে হয়? অন্তঃসংজ্ঞা (Conscience) কি ঐ সকল আমাদিগকে শিক্ষা দিতে পারে? সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত চিন্তা, পরীক্ষা ও নানাবিধ চেষ্টা দ্বারা যে সকল বিষয় শিক্ষা হইয়াছে তাহা কি কেবল আত্মসংজ্ঞার উক্তিমাত্র শিখিতে পারা যায়? তাহা যদি হয় তবে মানব এত চেষ্টা করে কেন? শিক্ষার এত আদর কেন? তাড়িত বার্ত্তাবহ, বাষ্পীয় রথ, আলোক চিত্র এবং অনুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ ও ঘটীযন্ত্র প্রভৃতি প্রচুর জ্ঞানসঙ্কুল বিষয় দূরে থাকুক কিরূপে ও কোন সময়ে ক্ষেত্রে বীজবপন করিলে ভাল ফল লাভ হয় এই সামান্য কৃষিবিষয়ক বিষয়ও উত্তমরূপে শিক্ষা না পাইলে জানা যায় না। অন্য শিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক সর্পবিষ মানবের প্রাণ ঘাতক এই সর্বজনাবগত বিষয়ও অন্তঃসংজ্ঞা আমাদিকে শিখাইয়া দিতে পারে না। তাহা যদি পারিত তাহা হইলে শিশুগণ সর্প ধরিতে বা অগ্নি লইয়া ক্রীড়া করিতে যাইত না। শিশু যাবৎ শিক্ষা প্রাপ্ত না হয় তাবৎ কোনও অহিতকর কার্য্য করিতেই বিরত হয় না—কোনও কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেই প্রবৃত্ত হয় না। যত শিক্ষা পাইতে থাকে ততই অপকর্ম্ম করিতে নিবৃত্ত ও সৎকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়।

পাঠক! এই সকল হইতে কি বুঝিতে পারিতেছ না যে, অন্তঃসংজ্ঞা আমাদের চালক নহে—শিক্ষাই আমাদের একমাত্র চালক। অর্থাৎ আমরা যেমন শিখি সেইরূপ কার্য্য করি—মদ্যপান করিতে শিখিলে মদ্যপান করি—উপবাস করিতে শিখিলে উপবাস করি—যে কার্য্য হিতকর বলিয়া জানিতে পারি তাহাই করিতে যত্নবান হই ও যাহা অহিতকর বলিয়া জানি তাহাই করিতে নিবৃত্ত হই। তুমি বলিতেছ শিক্ষাদ্বারা অন্তঃসংজ্ঞা পরিবর্দ্ধিত হয়—শিক্ষারূপ শাণদ্বারা শাণিত হয়। যদি শিক্ষিত সকল ব্যক্তি বাস্তবিক হিতকর ও অহিতকর বিষয় সকল অবগত হইয়া প্রকৃত হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত ও অহিতকরকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইত, তাহা হইলেও তুমি

একদিনও কথা বলিতে পারিতে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, যে, মানব শিক্ষার পরতন্ত্র হইয়া অত্যন্ত অহিতকর অন্যায় কার্য্যকে হিতকর কর্ত্তব্য এবং অত্যন্ত হিতকর সৎকর্ম্মকে অহিতকর অকর্ত্তব্য বলিতেছে। যদি Conscience পরিবর্দ্ধনই শিক্ষার কার্য্য হইত,—তাহা হইলে কখনও এরূপ বিপরীত ফল হইত না। ইহাতে বরং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে Conscience কিছুই নহে, শিক্ষাই আমাদের একমাত্র পথদর্শক।

যখন শিক্ষা আমাদের চালক হইল, তখন সে শিক্ষা লাভ না করিলে আমাদের চলিবে কেন? কিন্তু সকলে কি প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে পারে? না সকলে সকল রকম শিক্ষা করিতে পারে? সকলে দূরে থাকুক শতকরা একজনও প্রকৃত শিক্ষা করিতে পারে না। প্রকৃত শিক্ষা না হইলে যদি মানব নিয়মিত ও কর্ত্তব্যসাধনে সক্ষম না হইল অথচ যদি শতকে একজনও প্রকৃত শিক্ষিত হইতে পারিল না তবে মানবকে হতভাগ্য ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে? আমাদের বোধ হয় প্রকৃত শিক্ষা সকলের পক্ষে আবশ্যক নহে। শিক্ষার ফলমাত্র শিক্ষা করিলেই অনেকের চলে। কি জন্য এরণ্ডতৈল বিরেচক তাহা জানা সকলের আবশ্যক নাই, এরণ্ড তৈল যে বিরেচক ইহা জানা থাকিলেই অধিকাংশ লোকের পক্ষে যথেষ্ট। কেন না তাহা হইলেই মানবের কার্য্য চলিল। কর্ত্তব্য জ্ঞান সম্বন্ধেও ঐরূপ অর্থাৎ কেন চুরি করিতে নাই, কেন মদ্যপান অন্যায়, কেন পরোপকার কর্ত্তব্য, কেন ঈশ্বরারাধনা নিত্য কর্ত্তব্য সে সকল জানার তত আবশ্যক নাই, ঐ সকলের স্থূলতাৎপর্য্য বুঝিতে পারাই অনেকের পক্ষে যথেষ্ট। কেন না শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কি? কি প্রণালীতে কার্য্য করিলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তাহা জানার নামই ত শিক্ষা? তাহা যদি হইল তবে সেই টুকু জানিলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। তবে ঐ সকল আপনা হইতে জানা যায় না বলিয়াই যাঁহারা নিয়মপ্রবর্ত্তক তাঁহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত জানা আবশ্যক। কেন না তাহা হইলে তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত নিয়ম উৎকৃষ্ট হইল কি না এবং তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিয়ম হইতে পারে কি না তাহা জানা যায় না। কিন্তু সকলের শিক্ষা কিছু

নিয়ম করিবার জন্য নহে, সকলের শিক্ষা কিছু গ্রন্থকার হইবার জন্য নহে। অধিকাংশ লোকেরই সুপ্রণালীতে কার্য্য করিবার জন্যই শিক্ষা। সুতরাং সকল লোকের কারণ প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানার আবশ্যক কি? যদি আমাদের এমত কোন স্বাভাবিক শক্তি থাকিত, যে, তাহারই বলে আমরা সমস্ত হিতাহিত অবগত হইতে পারিতাম, তাহা হইলে কাহাকেই কারণানুসন্ধান ও করিতে হইত না ও কাহাকেই নিয়ম প্রবর্ত্তক হইতে হইত না। তাহা হইলে সকলেরই ফলমাত্র জানিলে যথেষ্ট হইত। কিন্তু Conscience বা তথাবিধ কোন বৃত্তি আমাদের নাই বলিয়াই আমাদের কারণানুসন্ধান প্রভৃতি করিতে হয়। পশুরা স্বাভাবিক শক্তিবলে আপনাদের হিতাহিত বুঝিতে পারে এই জন্য তাহাদের কারণানুসন্ধানরূপ শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং শিক্ষার ফল জানাই কার্য্যকরণ পক্ষে যথেষ্ট। যদিও ঈশ্বর মানব জাতিকে প্রকৃত শিক্ষাদ্বারা সত্যজ্ঞান লাভ করিতে বলিয়াছেন কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, সকলের সেরূপ শক্তি ও অবসর নাই তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে প্রকৃত শিক্ষা সকলের আবশ্যক নহে প্রত্যুতঃ সমূহ অনিষ্টকর। প্রথমতঃ অসম্ভব বিষয়ের চেষ্টা করিতে গিয়া সমূহ অনিষ্ট সাধিত হয়, দ্বিতীয়তঃ সকলেই শিক্ষক ও গ্রন্থকার হইতে চেষ্টা করে শিখিতে ও পড়িতে কেহই চাহে না। আজিকালিকার বঙ্গীয় গ্রন্থকারদলের দিকে দৃষ্টি করিলে এ বিষয়ের সত্যতা প্রকাশিত হইবে।

আমাদের ক্ষুদ্র প্রবন্ধ অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু একটু বিস্তৃত করিয়া বুঝাইয়া না দিলেও অনেকে বুঝিতে পারেন না—যদি আমাদের স্থান থাকিত তাহা হইলে আমরা এই সকল কথা উদাহরণ দ্বারা পরিস্কৃত করিয়া দিতাম। কিন্তু এরূপ সঙ্কীর্ণ স্থানে তাহা অসম্ভব। যে হউক বোধ হয় পাঠকগণ বুঝিয়াছেন—যে, যদি কারণাদি না জানিয়াও প্রকৃত বিষয় জানা যায় তাহা হইলে কার্য্য করিবার সময় তাহা কারণজ্ঞ ব্যক্তি অপেক্ষা অল্প কার্য্যকর হয় না। এক্ষণে কথা এই যে লোকে পরের কাছে শিখিয়া তাঁহার উপদেশ মত কার্য্য করিবে কেন? কেন স্বাধীন মানব পরবাক্য পালনরূপ অধীনতা স্বীকার করিবে? যখন আমিও মানব তুমিও মানব তখন আমি কেহই

নহি তুমিই সর্ব্বেসর্ব্বা এ স্থানে আমি তোমার অনুবর্ত্তন করিব কেন ? আমি ত বর্ষীয়ান পুরুষ, ঐ যে বালকটী বিষ্ঠা হস্তে করিয়া মুখমধ্যে প্রবেশ করাইতেছে, আর তুমি সংস্রবার নিষেধ করিতেছ—ঐ বালক কি তোমার বারণ শুনিতেছে ? ঐ বালকটী যখন তোমার কথা শুনিতেছে না তখন আমি তোমার কথা শুনিব কেন ? যদি বল আমার হিতের জন্য বলিতেছ বলিয়া আমি শুনিব। কিন্তু তুমি ত ঐ শিশুরও হিতের জন্য বলিতেছ, তবে ঐ শিশু তোমার কথা শুনে না কেন ? যদি বল শিশুর আত্মহিতাহিতজ্ঞান নাই, তাই শুনিতেছে না। কিন্তু আমার যে আত্মহিতাহিত জ্ঞান আছে তাহার প্রমাণ কি ? যে সকল লোক শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহারা যদি পূর্ব্বেই আপনাদের হিতাহিত বুঝিতে পারিয়া থাকে, তবে তাহাদের শিখিবার প্রয়োজন কি ? বালকের জ্বর হইয়াছে তাহাকে খাইতে নিষেধ করা গেল সে না খাইলে কষ্ট হয় বলি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইল। তোমাকে বলা গেল চুরি করিও না, কিন্তু তুমি দেখিলে চুরি করিতে পারিলে বিশেষ লাভবান হইবে, সুতরাং আমার কথা তোমার ভাল লাগিল না। কেনই বা ভাল লাগিবে ? আমি কেবল ইহাই শিখাইয়াছি যে চুরি করিতে নাই—কেন চুরি করিতে নাই, চুরি করিলে কি ক্ষতি হয় তাহা শিখাই নাই। সুতরাং কেবল আমার কথার অনুরোধে অথবা কেবলমাত্র ক্ষতি হইবে এই বাক্যমাত্র শুনিয়া প্রত্যক্ষ লাভের আশা তুমি পরিত্যাগ করিতে পারি না। এই জন্য হয় প্রত্যেকেরই প্রকৃত শিক্ষা পাওয়া আবশ্যক অথবা যাহাতে চুরি না করিতে মানব বাধ্য হয় এমত শাসন বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু সকলের প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব নহে বলিয়া রাজশাসন, সামাজিকশাসন ও ধর্ম্মশাসনের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনরূপ ব্যবস্থাপক চুরির তিন রূপ ফল দেখাইলেন—কেহ বলিলেন চুরি করিলে কারারুদ্ধ হইতে হইবে, কেহ কহিলেন চুরি করিলে নিন্দিত ও সমাজচ্যুত হইতে হইবে ও কেহ কহিলেন চুরি করিলে পরকালে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। এই শিক্ষা পাইয়া মানব চুরি না করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। সুতরাং শিক্ষা বলিলে যেমন প্রকৃত শিক্ষা বুঝায় সেইরূপ ফলমাত্র শিক্ষা অর্থাৎ ব্যবস্থার, সমাজ ও ধর্ম্ম-

শাস্ত্র শিক্ষাকেও শিক্ষা বলে। অন্ততঃ কার্য্যকরন সম্বন্ধে উভয় প্রকার শিক্ষাই সমান ফলপ্রদ। প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব নহে বলিয়া অধিকাংশ লোকের পক্ষে শেষোক্ত প্রকার শিক্ষাই অধিক ইষ্টকর।

আমাদের আলোচ্য বিষয় শিক্ষা নহে। ধর্ম্মশাস্ত্রই আমাদের আলোচ্য। সুতরাং শিক্ষা সম্বন্ধে অধিক বলার আবশ্যক নাই। শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করার মূল তাৎপর্য্য এই যে, মানব শিক্ষার অধীন—শিক্ষার অধীন হইতে হইলেই মানব আপন বিবেচনায় চলিতে পারে না এবং শিক্ষিত বলিলে ব্যবহারজ্ঞ,সমাজজ্ঞ ও ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞকে বুঝায় ইহা জানান উদ্দেশ্য। প্রকৃত তত্ত্ব-শিক্ষা জগতে দুর্লভ। তাহা যদি হইল তবে মানবকে পরানুবর্ত্তন করিতেই হইবে। এক্ষণে দেখা আবশ্যক কি প্রকারে পরানুবর্ত্তন করিবে। রাজ দণ্ডের ভয়ে, না লোক দণ্ডের ভয়ে না ঐশিকদণ্ড ভয়ে মানব পরানুবর্ত্তন করিবে? আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, রাজদণ্ড ও সমাজদণ্ড আমাদের সমূহ অনিষ্টকারী। সুতরাং সেরূপ পরানুবর্ত্তন কখন ন্যায় সঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্মই আমাদের প্রধান অবলম্বন ও উপায় হইতেছে—ধর্ম্মভয়ের অনুরোধে পরানুবর্ত্তন করাই আমাদের আবশ্যক। তাহাতে অনিষ্টের কোন আশঙ্কা নাই। কেন না উহার শাসনদণ্ড ঈশ্বরের হাতে, তিনি কখনও অন্যায় দণ্ড প্রদান করে না। তাঁহার বিচারে প্রমাণের আবশ্যক নাই, অপক্ষপাতিতা নাই, ধনের শক্তি নাই, কর্ম্মচারীর অত্যাচার নাই, কোনও প্রকার অন্যায়াচরণ নাই। যে যেরূপ কার্য্য করিবে সে তদনুরূপ ফল ভোগ করিবে, অথচ যে দণ্ড পাইবে সেও দণ্ডের তীব্রতা ভোগ করিবে না। তাঁহার এমনই চমৎকার শাসন যে, সে শাসনে দণ্ডের ও কঠোরতা নাই।

তুমি বলিবে ধর্ম্মশাসন শাসনই নহে, উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। পরকাল মিথ্যা, স্বর্গ নরক মিথ্যা এবং পরজন্ম ও পরজন্মে ফলভোগ মিথ্যা। ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা-গণ স্বর্গনরকের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহার আমরা প্রমাণ পাই না বটে, কিন্তু পরকাল যে মিথ্যা নহে, পরজন্ম ও পরজন্মে ইহকালের ফলভোগ হওয়া যে মিথ্যা নহে তাহা আমরা প্রমাণ করিয়াছি। তথাপি আমরা তর্কের অনু-রোধে স্বীকার করিতেছি পরকাল ও স্বর্গনরকাদি সমস্তই মিথ্যা। কিন্তু তাহাতে

আসল কথার কিছু ক্ষতি হইতেছে না। কেন না তুমি যত কেন মহা নাস্তিক হও না, তোমাকে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, মানবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আছে, অর্থাৎ এমত কতকগুলি কার্য্য আছে তাহা মানবের পক্ষে নিতান্ত অনিষ্টকর ও এমত কতকগুলি কার্য্য আছে তাহা মানবের ইষ্টকর। সুতরাং ইষ্টকর কার্য্য করিলে মানবের মঙ্গল ও অনিষ্টকর কার্য্য করিলে অমঙ্গল হয়। সেই মঙ্গলামঙ্গলকেই স্বর্গনরক বলিতে পারা যায় অর্থাৎ সেই ফল প্রদান দ্বারা ঈশ্বর মানবকে পুরস্কৃত ও দণ্ডিত করেন। সুতরাং ধর্ম্ম-শাস্ত্র বর্ণিত প্রকারের স্বর্গনরক যদি মিথ্যা হইলেও মিথ্যা নহে। যে কার্য্য করিলে যে ফল হইবার বিধান ঈশ্বর করিয়াছেন তাহা ফলিবেই ফলিবে। কেহ মিথ্যা প্রমাণ সৃষ্টি করিয়া, কি অর্থব্যয় করিয়া যে দণ্ড হইতে অব্যাহতি পায় না বা নিরপরাধীকে দণ্ডিত করিতে পারে না। অতএব ধর্ম্ম শাসন মিথ্যা একথা বলা নিতান্ত ভ্রান্তি মূলক। নরকে বিষ্ঠার হ্রদে ডুবা বা স্বর্গে অপ্সরী-বেষ্টিত থাকা মিথ্যা হইলেও ধর্ম্মশাসন— ঈশ্বরকৃত শাসন মিথ্যা নহে।

এই কথা শুনিয়া নাস্তিক মহাশয় উচ্চহাসি হাসিবেন—আমাদিগকেও নাস্তিক বলিবেন। কেন না আমরা ঈশ্বরকৃত কার্য্যফলকে স্বর্গনরক বলিয়াছি এবং সেই ফল ব্যবস্থাকে ধর্ম্ম ব্যবস্থা বলিয়াছি। নাস্তিকেরা উহাকে বৈজ্ঞানিক ও ঐহিক ফল বলেন। অগ্নিতে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়, অধিক ভোজন করিলে পীড়া হয়, মদ্যপান করিলে জ্ঞান থাকে না, ইন্দ্রিয়-সেবা করিলে ধন প্রাণাদি নষ্ট হয়, এই জন্য যদি বলিতে হয়, অগ্নিতে হাত দেওয়া, অধিক ভোজন করা ও ইন্দ্রিয় সেবা করা অধর্ম্মজনক তবে আর নাস্তিকেরা অধার্ম্মিক কি প্রকারে? ওরূপ ধর্ম্ম ত নাস্তিকেরা স্বীকার করিয়া থাকেন। আমাদের বোধ হয় নাস্তিক মহাশয়দের এ কথা বলিবার অধিকার নাই। কেন না তাঁহারা যে সকল কার্য্য কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বলেন, সে সকল আশুফল দর্শন দ্বারা, গূঢ়—অন্তর্নিহিত ফলের দিকে তাঁহারা দৃষ্টি করেন না। বাস্তবিক কেবল হাত পুড়ে বলিয়া অগ্নিতে হাত দেওয়া অন্যায়, পীড়া হয় বলিয়া অপরিমিত ভোজন করা অন্যায় ও জ্ঞানশূন্য হয় বলিয়া মদ্যপান করা অন্যায় তাহা নহে, উহার গূঢ় অন্য ফল আছে। আশুফল দ্বারা

কেবল এইমাত্র বুঝা যায় যে কোন্ কার্য্যের গূঢ় ফল ভাল ও কোন্ কার্য্যের গূঢ় ফল মন্দ। সকল সময়ে আশুফল প্রকাশ হয় না—কিন্তু গূঢ় ফল সকল সময়েই ফলিবে। মদ্যপানে সকলের সকল সময়ে জ্ঞান নষ্ট হয় না বটে, অপরিমিত ভোজনে সকল সময়ে সকলের পীড়া হয় না বটে, কিন্তু উহার গূঢ় অন্তর্নিহিত ফল সকল সময়েই ফলে। সেই ফলই স্বর্গনরক এবং সেই সকল উৎকৃষ্ট কামনাই ধর্ম্ম উপাসনা। সে উপাসনা নাস্তিকদিগের নাই; নাস্তিকেরা মনে করেন এমত করিয়া মদ্যপান করিব যাহাতে জ্ঞানের লোপ হইবে না, এমত করিয়া চুরি করিব যাহাতে ধরা পড়িতে হইবে না এমত কৌশলে অতিভোজন করিব যাহাতে পীড়া হইবে না। তাঁহাদের মুখ্য দৃষ্টি আশু ফলের দিকে, তাঁহারা জানেন না যে, "চোরের দশ দিন সাধুর একদিন।" তাঁহারা জানেন না যে, আশুফল সকল সময়ে না ফলুক কিন্তু গূঢ়ফল ফলিবেই ফলিবে। এই জন্য সাধু লোকেরা আশুফলের দিকে দৃষ্টি করেন না—তাঁহাদের মুখ্য দৃষ্টি গূঢ় ফলের দিকে—যাহার জন্য আশুফলের প্রকাশ সেই মুখ্য লক্ষের দিকেই তাঁহাদের দৃষ্টি। তাঁহারা ধরা পড়ুন আর নাই পড়ুন চুরি করিবেন না, মত্ত হউন বা না হউন মদ্য স্পর্শমাত্র করিবেন না, ক্ষতিগ্রস্ত হউন আর নাই হউন রিপুর উত্তেজনা হইতে দিবেন না— প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাউন আর নাই পাউন যাহা তাঁহারা ঈশ্বরানাভিপ্রেত বলিয়া জানিবেন তাহা না করিতে ও যাহা ঈশ্বরাভিপ্রেত বলিয়া জানিবেন তাহা করিতে চেষ্টা করিবেন। যাহার আশু ও প্রত্যক্ষ ফল দৃষ্ট হয় না তাহার গৌণ ও ভবিষ্যৎ ফল আছে বিবেচনা করিবেন। যাবৎ তাঁহারা নিঃসন্দেহ বিপরীত প্রমাণ না পাইবেন তাবৎ প্রচলিত মহাত্মাবাক্য সকলকে ভ্রান্তিসঙ্কুল ভাবিয়া তদন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হইবেন না। তাঁহারা আপনাকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ভাবিয়া থাকেন। ঈশ্বর ও বিশ্ব ব্যাপার সকল যে, সহজে বুঝা যায় না, আপন মতে চলা যে সুসাধ্য নহে, সদুপদেশ লাভ যে, পদে পদে প্রয়োজন এবং আপনাপন সুখই যে, মানবের কার্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন। এই জন্য কেহ অধর্ম্ম কার্য্য করিয়া সুখী ও কেহ ধর্ম্ম কার্য্য করিয়া অসুখী হই-

য়াছে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও তদনুসরণে প্রবৃত্ত হয়েন না বরং তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়া থাকেন, যে, উহার ভাবীফল বিপরীত হইবে, যে ফল প্রকাশিত হইয়াছে উহা গূঢ় চরম ফল নহে। সুতরাং আমরা যেরূপ ধর্ম্মমতের কথা বলিলাম তাহা নাস্তিকদিগের মতের সহিত কিছুতেই তুল্য নহে। নাস্তিকগণ সম্মুখে মাত্র দৃষ্টি করেন ও আত্মাকেই সর্ব্বস্ব দেখেন, দূরে কি আছে তাহা তাঁহারা দেখেন না এবং ঈশ্বর বা বিশ্বের দিকে দৃষ্টি করেন না।

এক্ষণে কথা এই যে, দূরে কিছু আছে কি না—গূঢ়ফল কিছু আছে কি না তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ আছে। কিন্তু এ প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করা বড় সহজ নহে। কিন্তু আমরা যদি স্বীকার করি যে, গূঢ় ফল কিছু নাই তাহা হইলেও ধর্ম্মশাস্ত্রের আবশ্যকতার কিছু কম হইতেছে না। কেন না যখন এ বিষয় স্থির হইয়াছে, যে, কতকগুলি কার্য্য কর্ত্তব্য ও কতকগুলি কার্য্য অকর্ত্তব্য ও যখন মানবকে কর্ত্তব্য করাইবার জন্য ও অকর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে ক্ষান্ত রাখিবার জন্য শাসন বিশেষ প্রয়োজন, তখন ধর্ম্ম শাসন যে সে কার্য্য সাধনে বিশেষ পটু তাহাতে আর সন্দেহ কি? মনে কর পরদারগমন অকর্ত্তব্য, উহা নিবারণ করিবার জন্য রাজা নিয়ম করিলেন যে ঐরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী কারাদণ্ড ভোগ করিবে, আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে এই শাসনের অধীন হইয়া অনেক সময়ে অনেক নির্দ্দোষী পরদারহরণ অপরাধে অপরাধী হইয়া দণ্ডিত হয়। কিন্তু ধর্ম্ম শাসনে সে ভয় নাই, তাহাতে নিরপরাধী দণ্ড পাইবে না। ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থায় পরদারগামীর দণ্ড নরক ভোগ—নিরপরাধী কিন্তু নরকভোগ করিবে না। তবে তোমার কথা এই যে অপরাধীও নরকভোগ করিবে না। না করুক, তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই; কেন না দণ্ড দেওয়াই কিছু মুখ্য উদ্দেশ্য নহে—অকর্ত্তব্য করণ নিবারণ করণই মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং অপরাধী নরক ভোগ না করিলে কিছু ক্ষতি নাই। ঐ ভয়ে লোকে অপরাধ করিতে নিরস্ত থাকিলেই উদ্দেশ্য সফল হইল। রাজা যে দণ্ডব্যবস্থা করিয়াছেন, দণ্ড দেওয়াই কি তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য? অবশ্য কখনই নহে। দণ্ড ভয়ে মানব অকর্ত্তব্য কার্য্য করিতে নিরস্ত হইবে, ইহাই উহার মূল উদ্দেশ্য। তবে রাজদণ্ড প্রত্যক্ষ

বিষয়, সেই জন্য অপরাধী দণ্ড না পাইলে,মানবের দণ্ড ভয় থাকে না সুতরাং কুকর্ম্ম করিতেও মানব নিরস্ত হয় না। কিন্তু পরকালের দণ্ড যখন প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, তখন পরকালে অপরাধী দণ্ড না পাইলে মানবের দণ্ড ভয় যায় না—কুকর্ম্ম নিবারণের উপায়ও নষ্ট হয় না। বরং ঐরূপ দণ্ড ব্যবস্থাই অতি উৎকৃষ্ট। কারণ ইহাতে দণ্ড প্রদান না করিয়া কেবলমাত্র ভয় প্রদর্শন দ্বারা মানবকে নিয়মিত করিতে পারা যায়। যদি রাজনিয়মাদিতে অন্যায় দণ্ড না হইত তাহা হইলেও সে সকল অপেক্ষা ধর্ম্ম শাসন উৎকৃষ্ট হইতেছে—কেন না ঐ শাসনে মানবের আদৌ কষ্ট নাই। কি ইহকাল, কি পরকাল কোন সময়েই মানবের কষ্ট নাই, ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা উভয় কালেই সুখী হয়েন ও অধার্ম্মিকগণ যে কষ্ট পায় সেও অতি সামান্য অথচ এই শাসনে শাসিত ব্যক্তিরা প্রায়ই অধার্ম্মিক হইতে পারে না। বিশেষতঃ মানব অবস্থার দাস। অনেক সময়ে মানব অবস্থাদির পরতন্ত্র হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতেই পারে না অথবা বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে না। ঐশ্বরিক নিয়মের অধীন হইয়াই মানবকে সমস্ত কার্য্যই করিতে হয়। সুতরাং মানবকে অকর্ত্তব্য কার্য্য কারণ জন্য কঠিন দণ্ড দিলে মানবের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করা হয়— মানব চেষ্টা করিলে সে অত্যাচারের দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। সুতরাং যে শাসনদ্বারা মানবকে দণ্ডিত না করিয়া সৎপথের পথিক করিতে পারা যায় তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

ইহাতে পাঠক একটী ভয়ানক আপত্তি করিবেন—তিনি বলিবেন, তবে কি মিথ্যা ব্যবহারই ধর্ম্মানুগত ? জানা হইল নরকভোগ মিথ্যা অথচ নরক-ভোগ হইবে বলিয়া ভয় দেখান হইল; ইহা কি প্রতারণা নহে ? ইহাই কি ধর্ম্ম ও ন্যায়ানুগত কার্য্য ? ইহাতে কি মিথ্যাব্যবহারের উৎসাহ দেওয়া হইল না ? ইহাই কি ধর্ম্মব্যবস্থা ও ধর্ম্মপ্রণালী ? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাদের হাসি পায়। কেন না যাঁহারা আদৌ ধর্ম্ম মানেন না, ধর্ম্ম বুঝেন না তাঁহারা কোন কার্য্য ধর্ম্মানুমোদিত তাহা কি প্রকারে বুঝিবেন ? অনেকের আস্তিক ও ধার্ম্মিক যেন জগতে জন্মে নাই, নাস্তিকই

যেন জগতের সর্ব্বস্ব এবং তাঁহাদের মতই সম্পূর্ণ সত্য! তাহা হইলে তাঁহাদের মতে মিথ্যা মাত্রই অন্যায় কেন? মিথ্যা যদি অহিতকর না হয় বরং উপকারী হয়, তবে মিথ্যা ব্যবহার অন্যায় কেন? তাঁহাদের আপন যুক্তিতে যাহা অন্যায় নহে, তাহাকে ধর্ম্ম শব্দের অদ্ভুত মনঃ কল্পিত অর্থের দোহাই দিয়া অন্যায় বলিবার চেষ্টা করা কি হাস্যাস্পদ নহে? বাস্তবিক হিতকর মিথ্যা ব্যবহার অন্যায় নহে। কিন্তু পাঠক! ইহাতে যেন এরূপ না বুঝিবেন যে, কোনরূপ সুখসাধনের জন্য মিথ্যা ব্যবহার করিতে হইবে। যেরূপ মিথ্যা বাস্তবিক মিথ্যা নহে, সত্যের নামান্তর ও সত্য প্রকাশের একমাত্র নিদান, সেই মিথ্যাই দোষাবহ নহে, তাহাকে বাস্তবিক মিথ্যাও বলে না। উহাকে ভাষান্তরে সত্য কথন কহে। তোমার পিতা ও শিক্ষক নিরত তোমাকে 'গরু' 'গাধা' প্রভৃতি নামে আহ্বান করিতেছেন। বাস্তবিক তুমি যখন চতুষ্পদযুক্ত, শৃঙ্গধারী গো, অথবা লম্বকর্ণ, সলাঙ্গুল গর্দ্দভ নহ তখন স্থূলতঃ বুঝিতে হইল বলিতে হইবে তোমার পিতা বা শিক্ষক মিথ্যা বলিতেছেন। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা কি মিথ্যা বলিতেছেন? কখনই নহে। কেন না তাঁহারা যাহা বলিতেছেন তাহার মর্ম্ম এই যে তোমার মনুষ্যযোগ্য বুদ্ধি নাই, তোমার বুদ্ধি গো বা গর্দ্দভ তুল্য। সুতরাং তাঁহাদের মিথ্যা বলা হইতেছে না। স্বর্গনরকাদিও ঐরূপ। ঋষি বলিলেন পরপীড়ন করিলে নরক ও পরোপকার করিলে স্বর্গলাভ হয়। তাহার অভিপ্রায় স্বতন্ত্র। স্বর্গ ও নরকের যে অদ্ভুত বর্ণনা তাঁহারা করিয়াছেন তাহারও অভিপ্রায় স্বতন্ত্র। তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই যে, অবাঙ্মনসোঃ গোচর ঈশ্বর ও তাঁহার কার্য্যের অভিপ্রায় আমরা বুঝি না, তাঁহার সদসৎ-কার্য্য প্রণালীরও অর্থ আমরা বুঝি না—কিন্তু যখন আমরা সদসৎ দুই প্রকার কার্য্য দেখিতেছি, তখন তাহার ফলও দুই প্রকার হইবে। কিরূপ কার্য্যের কি চরম ফল তাহা আমরা বুঝিতে পারি না—কিন্তু যাহা ভাল তাহাই যে, আমাদের কার্য্য ও যাহা মন্দ তাহাই আমাদের যে অকার্য্য ইহা আমাদিগকে বুঝিতে হইতেছে ও মন্দ কার্য্য না করিয়া ভাল কার্য্য করিতে বাধ্য হইতে

হইতেছে। তাহার চরম ফল কিরূপ ভাল ও কিরূপ মন্দ তাহা ঈশ্বর জানেন, আমরা জানি না। সেই অজ্ঞাত অদ্ভুত ফল স্বর্গ ও নরক। যেরূপ ভাষায় বর্ণন করিলে মানব তাহা বুঝিবে সেইরূপ ভাষায় তাহা বর্ণিত হইয়াছে। নতুবা বিষ্ঠার হ্রদ অর্থে যে বাস্তবিক বিষ্ঠারই হ্রদ বা চিরবসন্ত যে বাস্তবিকই চিরবসন্ত তাহা নহে। উহা দুঃখ ও সুখেরই নামান্তর মাত্র। দুঃখ ও সুখমাত্র বলিলে মানব বুঝিতে পারিবে না বলিয়া ঐরূপে মানবকে বুঝান হইয়াছে। বাস্তবিক উক্তরূপে না বুঝাইলে মানব বুঝিতেই পারে না, এই জন্য উহা মিথ্যা নহে, সত্য বুঝাইবার উৎকৃষ্ট উপায় মাত্র। যদি উক্তরূপ মিথ্যা ব্যবহার আদৌ না করা যায়, তাহা হইলে আদৌ সংসার চলে না। প্রথমতঃ দেখ বালকের জন্য যদি 'জুজু' বাক্য আরোপিত না হইত, তাহা হইলে বোধ হয় তাহাদের শিক্ষাই হইত না। ঐ যে শিশুটী নিয়ত চীৎকার ও দৌরাত্ম্য করিয়া সকলকে বিরক্ত করিতেছে—উহাকে কি সহস্রবার বারণ করিয়া ক্ষান্ত করিতে পার? কিন্তু যদি তাহাকে 'জুজু'র ভয় দেখান যায় তাহা হইলে এখনই শিশু শান্ত হইবে। ঐ যে শিশু ভাত দেখিয়া খাইব খাইব বলিয়া বিরক্ত করিতেছে, আর উহার মাতা "ও ভাতে পোকা খাইতে নাই" ইত্যাদি বলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিতেছে, উহা কি মিথ্যা? আর ঐ যে বালকটী হেঁদো করিতেছে—আর তাহার মাতা "শীঘ্র খাইয়া লও আমরা পূজা দেখিতে যাইব, বাজনা বাজিবে—শীঘ্র খাইয়া লও" ইত্যাদি বলিয়া তাহাকে শান্ত করিয়া অন্ন খাওয়াইতেছে তাহা কি মিথ্যা কথা! উহাকে যদি তুমি মিথ্যা বল তবে জগতের সমস্তই মিথ্যা।

ঐ দেখ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "লেখা পড়া করে যেই, হাতি ঘোড়া চড়ে সেই। লেখাপড়া যে না করে, সবে ঘৃণা করে তারে।" লেখাপড়া করিলেই কি হাতী ঘোড়া চড়িতে পায়? না লেখাপড়া না করিলে হাতী ঘোড়া চড়িতে পায় না? আমরা ত অনেক সময়ে দেখিতে পাই—উত্তমরূপ লেখা পড়া শিখিয়াও অন্নাভাবে কত লোক কষ্ট পাইতেছে, এবং যাহার "ক" অক্ষর মহামাংস এমত কত লোক মহা ধনী হইয়াছে, তাই বলিয়া কি গ্রন্থকার মিথ্যা লিখিয়াছেন? কখনই নয়। বাস্তবিক যে লোকের যেরূপ

ধারণাশক্তি তাহাকে সেইরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে। তুমি পণ্ডিত সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিলেই তুমি বুঝিতে পারিবে, যিনি সংস্কৃত বুঝেন না কিন্তু ভাল বাঙ্গালা বুঝেন তিনি বাঙ্গালা অনুবাদ পাঠ করিলে বুঝিবেন, আর যিনি তাহাও বুঝেন না তাঁহাকে প্রচলিত সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিতে হইবে। শিশুরা চীৎকার ও বিরক্ত করায় কি ক্ষতি, জ্বর হইলে আহার করায় কি ক্ষতি বুঝিতে পারে না—যেরূপে বুঝে সেইরূপেই তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে—সুতরাং জুজুর ভয়, সন্দেশের লোভ, বাজনা ও উপযোগী চাক্‌চিক্যশালী পদার্থ প্রদর্শনাদি দ্বারা তাহাদিগকে কার্য্য বিশেষ হইতে নিবৃত্ত ও কার্য্য-বিশেষে প্রবৃত্ত করিতে হয়। মানব বয়স্থ হইলেই যে তাহার শিশুপ্রকৃতি যায় তাহা নহে। তাহারা বড় হইয়া ক্রমে অভিজ্ঞ হইতে থাকে বটে কিন্তু এই বিশ্বব্যাপার এত দুরারোহ ও সংখ্যাশূন্য যে তাহার মর্ম্ম বোধগম্য হওয়া সাধারণ সাধ্য নহে। অনেক তপঃ, অনেক সাধনা করিয়া দুই এক জন মাত্র কিছু বুঝিতে পারেন, উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেও অপরে বুঝে না। কেন না জ্ঞান নিয়ত পূর্ব্ব জ্ঞানসাপেক্ষ। ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রতিজ্ঞা সকল যেমন পরপর পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা-সাপেক্ষ, জ্ঞানও সেইরূপ পরপর পূর্ব্বজ্ঞান-সাপেক্ষ তুমি কোন মূর্খ লোককে প্রথম অধ্যায়ের ৪৮ প্রতিজ্ঞা বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া যেরূপ বিফলপ্রযত্ন হও, কোন উচ্চ বিশ্বব্যাপারও সেইরূপ কোনও অনভিজ্ঞ লোককে বুঝাইতে গেলে নিষ্ফল হইতে হইবে। এই জন্য তাহাদিগকে সে সকল এরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হইবে যেন তাহারা বুঝে ও কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে। মিস্ত্রিরা মাটাম, ওলন প্রভৃতির মর্ম্ম না বুঝিয়াও বুঝে ও তদ্দ্বারা উত্তমরূপে কার্য্য সম্পন্ন করে। সাধারণ মানবের নিকট স্বর্গনরক বর্ণনাও ঐরূপ, উহারা বালকের 'জুজু' বাক্য প্রভৃতির ন্যায়, মিস্ত্রির মাটাম, ওলন প্রভৃতির ন্যায়, স্বর্গনরক বুঝিয়া কার্য্য সম্পন্ন করে। তদতিরিক্ত বুঝিবার তাহাদের সামর্থ্য নাই। যাহাদের সেরূপ সামর্থ্য হইয়াছে তাহারা স্বর্গনরকের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছে। অতএব যেরূপেই দেখা যাউক ধর্ম্মশাসনকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মানবের একমাত্র অবলম্বনীয় বলিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইবে।

এক্ষণে কেবল একটীমাত্র কথা থাকিতেছে। সে কথা এই, যে, ধর্ম্মমত সকল বাস্তবিক উত্তম নহে। যে সকল কার্য্য বাস্তবিক কর্ত্তব্য ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহা অকর্ত্তব্য এবং যে সকল কর্ম্ম বাস্তবিক অকর্ত্তব্য তাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তজ্জন্য অনেক সময়েই মানবের সমূহ অনিষ্ট সাধিত হয়। এবং সকলেই আপন ধর্ম্ম অ... পরস্পর বিপরীত ধর্ম্ম সকলকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া নিয়ত অন্যায়াচরণ করিয়া থাকে। ইহাতে জগতের এত অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, যে, তাহার সহিত তুলনায় রাজ-শাসনাদির অপকার অপকারই নহে বলা যায়। আমরা এ আপত্তির কিয়দংশ সত্য বলিয়া মনে করি, কিন্তু সে দোষ ধর্ম্মশাসন প্রণালীর নহে—মানবের কার্য্যপ্রণালীর দোষ। কেন না কি রাজশাসন, কি সমাজশাসন, কি ধর্ম্মশাসন সকলই মানবের প্রণীত। মানব পদে পদে ভ্রান্ত ও স্বার্থপর। তাহার উপর দেশকালপাত্রের ও প্রভুতা আছে। সুতরাং মানবকৃত ব্যবস্থা মাত্রই দোষযুক্ত ও চিরকাল সমানভাবে থাকিবার যোগ্য নহে। কি রাজনিয়ম, কি সমাজনিয়ম, কি ধর্ম্ম নিয়ম সকলেরই মধ্যে ঐ দোষ আছে, কোনটীই ঐ দোষ শূন্য নহে। সুতরাং উক্ত দোষ কেবল ধর্ম্ম শাস্ত্রের নহে। তবে তুমি বলিবে রাজনিয়ম দোষযুক্ত হইলেই তাহার পরিবর্ত্তন হয়, ধর্ম্মশাস্ত্রের নিয়ম সেরূপ নহে। আমরা বলি ধর্ম্মশাস্ত্রও ঐ নিয়মের অধীন। যে ধর্ম্মশাস্ত্র ঐ নিয়মের অধীন নহে তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রই নহে। এই জন্যই আমরা খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকে শাস্ত্র বলি না, হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রই প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র। উহা আদিমকাল হইতেই সংশোধিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহা বলিয়া কোন পাঠক যেন মনে না করেন যে রাজনিয়মাদি যেরূপে সংশুদ্ধ হয় ধর্ম্মশাসনও সেইরূপে সংশোধিত হইবে। উহার শোধন-প্রকার সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে নিয়ম হিন্দু ভিন্ন কেহই জানে না। সংক্ষেপে বলিতেছি—স্বয়ং ঈশ্বর ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচার করেন এবং স্বয়ং ঈশ্বরই তাহা শোধন করিয়া থাকেন। স্বেচ্ছাচারী বা অহংপরায়ণ মনুষ্যের ধর্ম্মশাস্ত্র শোধন করা কার্য্য নহে। ইহা আমরা বিস্তারিতরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এই সকল শ্লোকের স্থূল মর্ম্ম এই যে, সুখ সাধনই মানবের উদ্দেশ্য নহে, যে জন্য ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, যে প্রয়োজন সাধন জন্য মানবের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই প্রয়োজন সাধনই মানবের মূল উদ্দেশ্য এবং তাহা সম্পন্ন করিয়া সুখী হওয়াই মানবের একান্ত কর্ত্তব্য। অতএব সকলেরই কর্ত্তব্য যে সুখ সাধন বা সুখাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে—স্বার্থসাধন বা সুখাভিলাষের জন্য কার্য্য করিবে না, ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট ও নিত্য কর্ত্তব্য বলিয়াই কার্য্য করিবে। সুতরাং কার্য্য সফল হইলে সুখী বা নিষ্ফল হইলে দুঃখী হইবে না। ইহাই মাত্র দেখিবে, যে, যথানিয়মে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে কি না। যদি তাহা না হইয়া থাকে তাহা হইলে যাহাতে যথানিয়মে কার্য্য হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে, যদি যথানিয়মে কার্য্য হইয়া থাকে তাহা হইলে ফল প্রাপ্ত না হওয়ার জন্য দুঃখিত হইবে না—পুনরায় কার্য্য করিবে। কেন না ফলে মানবের অধিকার নাই, কেবল কার্য্যেই মানবের অধিকার। ঈশ্বর মানবকে কার্য্য করিতে বলিয়াছেন সুতরাং তাহাকে কার্য্যই করিতে হইবে। তিনি যাহাকে যে কার্য্য করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার তাহা করিয়াই সুখ হইবে। সুতরাং মানবের সামর্থ্যানুসারে কার্য্য করিয়া সুখী হওয়া উচিত। তাহাই মানবের কর্ত্তব্য ও তাহাই মানবের ধর্ম্ম। এই জন্য বলিতেছেন অল্পমাত্র ধর্ম্মও মহৎভয় হইতে পরিত্রাণ করে।

কার্য্যের ফল ফলিল না বলিয়া কাহার ও দুঃখিত বা ফল ফলিল বলিয়া কাহার ও সুখী হওয়া উচিত নহে, ঈশ্বর কার্য্য করিতেছি ভাবিয়াই সকলের সুখী হওয়া উচিত। কেন না কার্য্যফল কার্য্যকর্ত্তার নহে, ফল ঈশ্বরের বা বিশ্বের এবং কোন সময়ে কাহার দ্বারায় কিরূপ কার্য্যফল হওয়া উচিত তাহা মানব জানে না, ঈশ্বরই জানেন। কৃষকগণ হলচালন করিবে, ভূমিতে সার দিবে, বীজবপন করিবে, আবশ্যকরূপ সেচন করিবে, কীট ও ঘাস প্রভৃতি হইতে শস্যকে রক্ষা করিবে এবং যে যে কার্য্য করিলে ধান্য উৎপন্ন হয় তাহার চেষ্টা করিবে। কিন্তু তাহাতে যদি প্রচুর ধান্য প্রাপ্ত হয় তাহার জন্য নিতান্ত হৃষ্ট বা যদি ধান্য না জন্মে তাহার জন্য রুষ্ট হইবে না—কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছে ভাবিয়া আনন্দিত হইবে। কেন না ধান্য না হইলে কেবল মাত্র কৃষকের ক্ষতি হয় না, দেশের সকলের বা পৃথিবীর সকল লোকেরই ক্ষতি হয়। তবে কৃষক একাকী দুঃখ করিবে কেন? যদি বল ইহা কৃষকের অধিক দুঃখেরই কারণ হইতেছে, কেন না তাহার কার্য্য দোষে সে নিজে দুঃখ পাইল জগৎ শুদ্ধ লোকেরও দুঃখ হইল। যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে কার্য্যফল দুঃখের কারণ হইল কৈ? কৃষক করিল অবৈধ কার্য্য, তাহার ফলস্বরূপ দুঃখ পাইল মানব মাত্রই। কাযেই বলিতে হইতেছে কার্য্যফল সুখ দুঃখের হেতু নয়। যখন কার্য্য না করিয়াও দুঃখ পাইতে হইল, যখন কৃষকেরদোষে অন্যান্য লোকের কষ্ট হইল, তখন বুঝিতে হইবে যে, সকল সময়ে কার্য্যফল। সুতরাং সুখদুঃখ মানবের হস্তে নহে—ঈশ্বরের হস্তে। ঈশ্বর যে, সকল সময়ে ফল প্রদান করেন না তাহার অবশ্য কোন নিগূঢ় কারণ আছে—সুতরাং সেরূপ ফললাভ না হওয়াকেই ফললাভ বলিতে হয়। কেন না তাহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। অতএব যেখানে বিশেষ চেষ্টা করিয়া বা যথোপযুক্ত যত্ন করিয়াও ফল লাভ হইল না সেখানে বুঝিতে হইবে, যে তখন নির্দ্দিষ্ট ফললাভ না হওয়াই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য। সুতরাং সে সময়ে ফললাভ করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইলে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা করা হয়। তাহা যে নিতান্ত অকর্ত্তব্য তাহাতে আর কথা কি? মনে কর সকলেরই

জীবিত থাকিবার চেষ্টা করা উচিত ও তজ্জন্য যথোপযুক্ত খাদ্য ভোজন, উপযুক্ত ব্যায়ামানুশীলন, পীড়া হইলে ঔষধ সেবন প্রভৃতি করা আবশ্যক, কিন্তু সুনিয়মে এই সকল সম্পন্ন হইলেও মানবকে একদিন মরিতে হইবে। যদি মানব দুই শত বৎসর বয়সেও মরে তথাপি শেষ মৃত্যু নিবারণের জন্য তাহাকে চিকিৎসিত হইতে হয়, সেই চিকিৎসা বা জীবন রক্ষা করিবার চেষ্টা সফল হইল না বলিয়া কি মানব দুঃখিত হইবে? অবশ্য কখনই নহে। কেন না তখন মানবের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে—সেই ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট কালকে কেহই অতিক্রম করিতে পারিবে না। অকাল মৃত্যু সম্বন্ধেও সেইরূপ, অর্থাৎ যাহার অকালমৃত্যু সংঘটিত হয় তাহার শরীর রক্ষার জন্য যথোপযুক্ত চেষ্টা করা হইয়া থাকিলেও যদি তাহার জীবন রক্ষিত না হয়, তবে বুঝিতে হইবে, যে, তাহার অকালমৃত্যু ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট। সকল কার্য্যেরই এইরূপ নিয়ম জানিবে।

আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝি না, কেবল কতকগুলি কার্য্যের ফলমাত্র জানি। অর্থাৎ ঘটনা বিশেষের পরে কিরূপ ঘটনা বিশেষ সচরাচর ঘটিয়া থাকে তাহারই কতকগুলি জানি মাত্র, কিন্তু ঘটনা বিশেষের পরেও যে বরাবরই সেইরূপ ঘটনা বিশেষ হইবে এরূপ আমরা জানি না। আমরা অনেক সময়েই তাহার ব্যত্যয় দেখিয়া থাকি। ঐরূপ ব্যত্যয় হওয়া যে ঈশ্বরাভিপ্রেত। আমরা তাহা জানি না, আমরা উহাকে ঈশ্বরের অত্যাচার মনে করি বাস্তবিক অপারশক্তির যে কি গূঢ় উদ্দেশ্য আছে তাহা আমরা বিবেচনা করি না। যখন আমরা তাঁহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিনা—তখন তাঁহার উদ্দেশ্য কিরূপে বুঝিব? সুতরাং আমাদের ইহা জানিয়াই ক্ষান্ত থাকা উচিত যে, ঈশ্বর যে কার্য্য সাধন জন্য যে উপায়ের বিধান করিয়া দিয়াছেন, আমারা সেই উপায় অবলম্বনের চেষ্টা করিব—তাহাতে যদি সে কার্য্য সাধিত হয় ভাল, না হয় তাহাও ভাল। তাই কৃষ্ণ বলিতেছেন (১) অর্জ্জুন! ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি পরিত্যাগ কর অর্থাৎ সুখ বা ফল লাভ রূপ ব্যবসা করিবার জন্য কর্ম্ম করিও না। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা কার্য্য করিলে সমাধি লাভ হয় না (৪৭)। (২) যোগ অবলম্বন করিয়া কার্য্যকর,

সিদ্ধি অসিদ্ধি উভয়কে তুল্য জ্ঞান করিতে পারার নাম যোগ (৪৯) অথবা কর্ম্ম করার উৎকৃষ্ট কৌশলই যোগ নামে অভিহিত হয় (৫০)। ইহকালেরই হউক কি পরকালেরই হউক সুখ অভিলাষে কার্য্য করা—ব্যবসায়ই ধর্ম্ম ত্যাগ করাও ব্যবসায়। কেন না ফল পাইব না বৃথা কষ্ট করিব কেন ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকা ব্যবসায় ভিন্ন কি? উহাত দুঃখ পরিহার করিবার জন্য চেষ্টা বা কার্য্য। সুখ দুঃখ তুল্য জ্ঞান করিয়া কার্য্য করাকেই যোগ বলে।

কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম অবরোধ করা অত্যন্ত কঠিন। অদ্যাপি অনেকে ইহার মর্ম্মবোধে সমর্থ হয়েন নাই এইজন্য কেহ বলেন কৃষ্ণোক্তি সকল অত্যন্ত দুর্নীতি পূর্ণ ও কেহ বলেন ঐ সকল নাস্তিক্যময়। বাস্তবিক এমত সংক্ষেপে এই সকল বলা হইয়াছে যে ইহার মর্ম্মাববোধ হওয়া অত্যন্ত কঠিন। একতঃ ইহার মর্ম্ম ধারণ করা সাধারণের কর্ম্ম নয়, তাহাতে এ সকল গুলিই সাধারণ প্রচলিত মত ও বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং বুঝিতে না পারিয়া ইহাতে এত দোষ দর্শন করে। অধিক কি মহাপ্রাজ্ঞ অর্জ্জুনও সকল কথা বুঝিতে পারেন নাই, তাই তিনি মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অর্জ্জুন বাসুদেবকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহার উত্তর পাইলেন বটে, কিন্তু তাহা ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম না হওয়ায় পরিতৃপ্ত হইলেন না। এইজন্য পুনরায় কহিলেন—

স্থিত প্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিং। ৫৪।

হে কেশব? সমাধিস্থ প্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কি? তাঁহার বাক্য, অবস্থান ও গতি কি প্রকার? অর্থাৎ কি প্রণালীতে কার্য্য করিলে বুদ্ধি নিশ্চল হয়, ও কিরূপ অবস্থায় থাকিয়া কার্য্যাদি করিলে সমাধি লাভ হয় ও স্থিত প্রজ্ঞ হইতে পারা যায়।

ক্রমশঃ

পৌরাণিক সাকার উপাসনা।

প্রথম প্রস্তাব।

সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রের মত এই যে, সংসারস্থিত জীবমাত্রেই অজ্ঞানবশী-ভূত হইয়া উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট যোনিতে জন্ম লাভ করতঃ বিবিধ সুখ দুঃখ ভোগ করে; অবিদ্যার অঙ্গভূত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রয়ের দ্বারা আবৃত হইয়া নিয়তই সুখ দুঃখ মোহ এই সকলের অধীন হয়। পরন্তু বহুল হিন্দুশাস্ত্রের অভিমত এই যে, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই প্রাকৃতিক গুণ সম্বন্ধের দ্বারা জীব-ভাব প্রাপ্ত হইয়া উর্দ্ধাধোলোক সকল পরিভ্রমণ করতঃ বৃথা যন্ত্রণা ভাগী হইতেছেন। এইরূপ অনারোপিত তত্ত্ব অর্থাৎ এই সত্য সিদ্ধান্ত সাংসারিক জীবের বুদ্ধিতে ক্ষণকালের জন্যও উদিত হয় না। না হই-বার কারণ অবিদ্যার আচরণ। অবিদ্যার আচরণ ভঙ্গ ও দুঃখ প্রবাহের নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্তই সংসার। সংসারনিবৃত্তি ও অবিদ্যাবিনাশ তুল্য কথা। ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার ব্যতীত তাহা নিবৃত্ত হইবার উপায়া-ন্তর নাই। জীব নিরন্তরই রজস্তমোবৃত্তির দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া চঞ্চল ও আকুলিত হইয়া বুদ্ধিনৈর্ম্মল্য লোভে বঞ্চিত হইতেছে। সেই জন্যই বুদ্ধিমালিন্যে অভিভূত ও বিমোহিত মনুষ্য ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান নিতান্ত দুঃলভ্য বিবেচনা করে। পরম কারুণিক পরাৎপর পরম পিতা স্বপুত্রদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য সৃষ্টির আদিতে বেদবচনরূপ উপদেশ বা আদেশ রচনা করিয়াছিলেন। ঈশ্বরাদিষ্ট বেদের (হিন্দুমতে) উপদেশ এই যে, মনুষ্য যেন স্বাশ্রম-বিহিত-কর্ম্মে মনোযোগী হয়, অনন্তর মোক্ষ-

সাধন পক্ষে বিচরণ করে। নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও স্বাশ্রম-বিহিত সদাচারে রত থাকা ঈশ্বরের অনুমতি, ইহা বিশ্বাস করিয়া যিনি তত্তৎকার্য্যে রত থাকেন, কেবল তিনিই ব্রহ্মবিজ্ঞানলাভে সমর্থ হন। মনুষ্য যখন নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা বিশুদ্ধ চিত্ত হয়, রাগদ্বেষাদি-শূন্য হয়, ভোগলালসায় অনভিভূত বুদ্ধি হয়, তখন তাহার চিত্তে ব্রহ্মধারণা-সামর্থ্য প্রাদুর্ভূত হয়। এই অত্যুত্তম সময়ে কর্ম্ম রত না থাকিয়া ধ্যানরত হওয়াই উচিত। তাদৃশ অধিকারীর প্রতি ধ্যানের উপদেশ ও উপাসনার আদেশ। উপাসক প্রথমেই নিরালম্ব হইতে পারিবেন না, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি আকারাবলম্বন করিবার আদেশ আছে। সর্ব্ব-লোকপিতা পরমেশ্বর শুদ্ধচিত্ত অধিকারীর জন্যই উপাসনা বিধান করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ; তাই তিনি জানেন যে, মনুষ্য মাত্রেই বিষয় ভোগার্থ ব্যাকুল, সর্ব্বদা চঞ্চল, সুতরাং তাহাদের তাদৃশ চিত্ত নিতান্ত অশুদ্ধ, নিতান্ত মলিন; মলিন চিত্তে ব্রহ্মভাব প্রতিবিম্বিত হইবার সম্ভাবনা নাই, ধ্যানশক্তি উদ্বোধের নিমিত্ত তাহারা যখন তপোরত হইবে তখন প্রথমারম্ভে নিশ্চিত তাহারা নিরবলম্বহইতে পারিবে না। বস্তুতঃ জীব প্রথমে কোন এক অবলম্বন ব্যতীত চিত্ত স্থির করিতে পারে না, ধ্যান প্রবাহ বা একতানতা উত্থাপন করিতে পারে না। এই আমাদের বেদ-বচন, আমাদেরই হিতার্থ পরাৎপর পরমেশ্বর বিবিধ আকার উপদেশ করিয়াছেন; সেই সেই উপদিষ্ট গুণময় আকারে চিত্তাসমর্পণ পূর্ব্বক উপাসনায় রত হইবার অনুমতি করিয়াছেন। যদিও পরব্রহ্মের বিবিধ আকার মনুষ্যগণের উপাস্য বলিয়া বেদে বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি শিব, বিষ্ণু, শক্তি, সূর্য্য ও গণপতি প্রভৃতি কয়েক প্রকার মূর্ত্তি বিশেষ অস্মদ্দেশে উপাস্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই সকল উপাস্য মূর্ত্তির প্রকৃত মহিমা কিরূপ? তদ্দ্বারা উপাসনায় কি কি উপকার সাধিত হয়? কি প্রকারেই বা উহা সম্পন্ন করিতে হয়? এই সকল তথ্য কথা বলিবার জন্য আমরা "সাকার উপাসনা" নাম প্রদান করিয়া একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিব; ইহাই আমাদের প্রস্তাবোত্থাপক মুখ বন্ধ। মুখবন্ধ সমাপ্ত হইল,

এক্ষণে প্রস্তাবের আরম্ভ হইবে। এই প্রথম প্রস্তাবে আমরা "শিব" উপাসনা সম্বন্ধে বহুবিধ আলোচ্য কথা আনয়ন করিব; পাঠকগণ মনোনিবেশ করুন।

পরমেশ্বরের সংহার-শক্তি সমুত্থিত-মূর্ত্তিবিশেষের নাম "শিব।" পুরাণ-তন্ত্র, ও শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি বেদবিশেষে ইঁহার মহিমা বর্ণিত আছে। "জ্ঞান শঙ্করাদিচ্ছেৎ।" জ্ঞানকামী হইয়া, মোক্ষসাধক সদ্‌জ্ঞান লাভের উদ্দেশে শিবের উপাসনা করিবেক। ঐ সকল গ্রন্থে এইরূপে শিবোপাসনাবিধি উচ্চারিত হইয়াছে, এবং উপাসনায় প্রবৃত্তি আকর্ষণের জন্য মহাদেবকেই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা বলা হইয়াছে।

যুক্তি আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, খণ্ডবুদ্ধি অবলম্বনে উপাসনা করিলে অখণ্ড ফললাভের সম্ভাবনা নাই। বাস্তবিক পক্ষে অনুধাবন করিয়া দেখিলে পরমেশ্বরের খণ্ডতা ও পূর্ণতা কেবল উপাধি ভেদ প্রযুক্তই কল্পিত হইয়াছে, কেননা, পরিপূর্ণ ও অখণ্ডস্বভাব পরমাত্মা কল্পনার সাহায্য ব্যতীত উপাধির উল্লেখ ব্যতীত, অন্য কোনক্রমে খণ্ড বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন না। সর্ব্বব্যাপী আকাশ অখণ্ড, কিন্তু ঘট ও মধ্যে বহু বস্তু থাকায় তাহাদেরই উল্লেখে ইহা ঘটাকাশ, ইহা মঠাকাশ, ইত্যাদি প্রকারে অখণ্ড আকাশেরও খণ্ডতা ব্যবহার হইয়া থাকে। কেবল ব্যবহার নহে, তদনুরূপ জ্ঞান ও উল্লেখও হইয়া থাকে। এই যেমন দৃষ্টান্ত; তেমনি, সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর সর্ব্ববস্তুতে বিরাজিত থাকিলেও উপাধির পরিচ্ছিন্নতা অর্থাৎ খণ্ডতা থাকায় খণ্ড মূর্ত্তিরূপে প্রতীত ও উল্লেখিত হন। সংসারের সমস্ত দৃশ্যই মায়িক অর্থাৎ মায়াগুণের কার্য্য; উপাসক ইহা বিশ্বাস করিবেন; এবং অভ্যাসযোগের দ্বারা মায়াকল্পিত উপাধি সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক (ভুলিয়া গিয়া) সর্ব্বাত্মানুস্যূত এক অখণ্ডতত্ত্ব (ভূতভাব) অনুভব করিবেন। যে উপাসক পরমেশ্বরের উপাধি পরিত্যাগ করিতে অক্ষম, তিনি অনন্তভাব ভুলিয়া গিয়া কেবলমাত্র পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি বিশেষকে তদ্‌গত চিত্তে ধ্যান করেন, সেই অনুন্নত উপাসকেরই মনে অন্যের উপাস্য মূর্ত্ত্যন্তরের প্রতি বিদ্বেষ বৃত্তি উদিত হয়। বিদ্বেষ হইলেই তাহার কোন

পক্ষে যাওয়া হয় না; বরং তাহা হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়। এরূপ অনেক উপাসক আছে, যাহারা রামোপাসক হইয়া কালী প্রতিমা দেখিলে "রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে। রঘুনাথয়া নাথায় সীতা-য়াঃপতয়ে নমঃ।" বলিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে। তাহারা সমস্তই রাম-ময় দেখে, ঈশ্বরের অনন্তভাব তাহারা প্রত্যেক উপাধিতে অনুভব করি-বার প্রয়াস পায়। আবার এমন সাধকও আছেন, তাঁহারা বিল্বপত্র দেখিলে, "তেকড়কা পাতা" বলেন; শালগ্রাম দেখিলে মুদীর দোকানের বাঁট্‌কারা বলিয়া উপহাস করেন। এই সকল লোকে প্রকৃত উপাসক নহে। ইহার দ্বারা ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপী মহিমার বিন্দু বিসর্গও প্রস্ফুরিত হয় নাই।'

চিন্তাপ্রবাহ, ধ্যান, উপাসনা এসকল প্রায় তুল্য কথা। মন বহুক্ষণ ধরিয়া কোন এক পদার্থে বার বার বৃত্তিমান হইতে থাকিলে তাদৃশ বৃত্তি প্রবাহ ধ্যান ও উপাসনা নামে কথিত হয়। কিন্তু যদি তাদৃশ ধ্যান কোন নগন্য সাংসারিক জীব জন্তুতে উদ্ভূত হয় তাহা হইলে তাহা উপাসনা বা ধ্যান বলিয়া গন্য হইবে না—তাহা চিন্তা দুঃশ্চিন্তা বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। চিন্তাই হউক আর ধ্যানই হউক দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে চিত্তের তন্ময়তা অর্থাৎ ধ্যেয়-কারকতা জন্মে—এবং সুচিন্তার সুফল ও কুচিন্তার কুফল জন্মিতে দেখা যায়। শাস্ত্রোপদিষ্ট মনোরম মূর্ত্তি বিশেষে চিন্তা বা ধ্যান স্থায়ী হইলে ক্রমে তাহা হইতে চিন্তার সুফল ফলিয়া থাকে, জ্ঞানশক্তি বাড়ে, সদগুণ জন্মে, হিতা-হিত বিবেচনা হয়, শরীরের ও মনের কান্তি ও স্ফূর্ত্তি জন্মে ইত্যাদি অনেক প্রকার সুফল হইতে দেখা যায়। কিন্তু শাস্ত্র বহির্ভূত বহির্বস্তুতে চিন্তা প্রবাহ স্থায়ী হইলে ক্রমে তাহাতে অদ্ভুত চিত্তবিকার, নিতান্ত ক্লেশ দায়ক ব্যাধি, ইহ-পরলোকে নিন্দিত আচার ব্যবহার এরূপ অনেক কুফল ফলিতে দেখা যায়। কেহ পাগল হয়, কেহ জড় হয় কেহ খঞ্জ হয়, কেহ পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। এ সমস্ত বিকার কেবল চিত্ততন্ময়তার প্রভাবেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অবশ্যই আপনারা শৃগালদষ্ট ও কুকুরদষ্ট রোগী দেখিয়াছেন। মনে

করিয়া দেখুন মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহার জলে স্থলে সর্ব্বত্র কুকুর মূর্ত্তি যে যাহাকে দংশন করিয়াছে, দেখে এবং মরণ কালে কুকুর ডাক ডাকিয়া অথবা শেয়াল ডাক ডাকিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। ইহার বা উক্ত ঘটনার হেতু কি? এরূপ কেন হয়? ভাবিতে গেলে চিন্তার অথবা ভাবে সামর্থ্য ভিন্ন অন্য কোন কারণ উপলব্ধ হয় না। সে দংশন কালাবধি ভয়ব্যাকুলতা প্রযুক্ত দংশক জন্তুকে স্মরণ করিতে থাকে, মনে তুলিতে থাকে, ক্রমে তাহার চিত্ত তন্ময় হইয়া যায়, চিত্ত যখন তন্ময় হইয়া যায় তখন সে কুকুর বৈ আর দেখে না, আমি মনুষ্য এ জ্ঞানও থাকে না। সেই জন্য সে কুকুরের ন্যায় শব্দ করে সর্ব্বস্থানে কুকুর দেখে এবং কুকুর ডাক ডাকিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, মনুষ্য ভাবনামাত্রত্য প্রযুক্ত যে যে বিষয়ে তন্ময়তা লাভ করিয়া দেহান্তরিত হয় সে লোকান্তরে গিয়া তৎস্বরূপই প্রাপ্ত হয়। ইহা সত্য হইলে, অবশ্যই বলিতে পারি, কুকুর দষ্টব্যক্তি কুকুর হইয়া পর জন্ম গ্রহণ করিবে। দর্শনশাস্ত্রে এ সম্বন্ধে অনেক যুক্তিকথা আছে, বাহুল্য ভয়ে সে সকল কথা এই ক্ষুদ্র প্রস্তাব আনয়ন করিলাম না।

তৈলপায়িকা (তেলাপোকা) নামে একপ্রকার ক্ষুদ্র, পতঙ্গ আছে. তাহারা পেশকার নামক পোকা (কাঁচপোকার) দ্বারা আহৃত হইলে এ রূপ ভীত চিত্ত হয় যে দেখিলে বিবেচনা হইবে, তৈল পায়িকাটি মরিয়া গিয়াছে, বস্তুতঃ তাহারা তৎকালে মরে নাই, তাহাদের চিত্ত তৎকালে ঘাতুক কীটের মূর্ত্তিতে তন্ময় হইয়া যাওয়ায় জড়ের ন্যায় ও মৃতের ন্যায় নিপতিত থাকে, কালে তাহাদের দেহের গঠন পরিবর্ত্তিত হইয়া ধ্যেয় স্বরূপ হইয়া পড়ে; অর্থাৎ তাহাদের বাহ্য আকারও কাঁচপোকার আকারে পরিণত হয়।

এই সকল শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত ও প্রাকৃতিক উদাহরণ দ্বারা স্থির হয় যে, উপাসক (উপাস্যের ধ্যানকর্ত্তা) যদি উপাধি পরিত্যাগ না করিয়া কেবল মাত্র উপাধিপরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তিবিশেষকেই চিন্তা করেন তাহা হইলে উপাসককেই উপাস্য মূর্ত্তির উপাধির গুণ প্রাপ্ত হয়েন; নিরুপাধিক দেবগুণ প্রাপ্ত হন না। জড় ভাবনার ফল জাড্যতা, চেতন ভাবনার ফল চিন্ময়তা। খণ্ড ভাবনা করিলে খণ্ডফল, অখণ্ডভাবনা করিলে অখণ্ড বা অনন্ত।

যে উপাসক উপাসনা অথবা ধ্যানার্থ প্রতিমা অথবা মানস প্রতিমা অবলম্বন করিবেন তিনি যেন উপাস্যের অনন্তভাব মনে রাখেন; খণ্ডভাব যেন ভুলিয়া যান। অবলম্বিত মূর্ত্তিতে যে জড়াংশ থাকে তাহা যেন তাঁহার মনে উদিত না হয়, এই অভিপ্রায়ে আমাদের সর্ব্বহিতৈষিন শাস্ত্রে আদেশ করিতেছেন যে—

"গুরৌ মনুষ্য বুদ্ধিঞ্চ বর্ণবুদ্ধিং তথা মন্ত্রৌ।
প্রতিমায়াং শিলাবুদ্ধিং কুর্ব্যানো নরকং ব্রজেৎ,

গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি তাহা পরিত্যাগ কর, মন্ত্রে বর্ণ কিম্বা অক্ষরজ্ঞান করিও না, প্রতিমাতে প্রস্তর বুদ্ধি পরিত্যাগ কর, না করিলে নরক হইবে, পতন হইবে।

শিব উপাসনা প্রসঙ্গে এতদূর বলিলাম কেনে? পাঠক তাহা অবশ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রথমকালে অর্থাৎ প্রথমে বলা হইয়াছে যে, শিব মূর্ত্তিটী পরমেশ্বরের সংহার শক্তি সমদ্ভূত হইলেও তাহাতে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়, এই ত্রিবিধ কার্য্যের কারণভাব অনুস্যূত রাখিতে হইবে এবং চিন্ময় মহান্ ও ব্যাপীভাবও তাহাতে ধ্যান করিবেক। তাহা না করিলে, খণ্ড উপাসনা হইবেক সুতরাং তাহা সুফল প্রসব করিবে না। পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, সম্মুখে মৃণ্ময় মূর্ত্তি রাখিলাম, উত্তম রূপে উহা পর্য্যাবেক্ষণ করিয়া, চক্ষু নিমীলিত করিলাম, ভাবিতে লাগিলাম,—

"বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল ভয় হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং।"

ক্রমশঃ

শ্রীকালীবর বেদান্ত বাগীশ।

বেদরহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১ ম—শিক্ষা।

যে গ্রন্থে বেদের বর্ণ ও স্বরাদির উচ্চারণ করিবার রীতির উপদেশ দেওয়া আছে, তাহার নাম শিক্ষা। বেদের তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়ীরা উপনিষদের আরম্ভে এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন। "শিক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ।" আমরা শিক্ষা ব্যাখ্যা করিব। বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল, সাম ও সন্তান এই গুলি শিক্ষাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। অ, আ, ক, খ ইত্যাদিকে বর্ণ বলে। বেদের অঙ্গস্বরূপ শিক্ষাগ্রন্থে বর্ণের উচ্চারণ প্রণালী স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে।

"উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ স্বরাস্ত্রয়ঃ।
হ্রস্বোদীর্ঘঃ প্লুত ইতি কালতো নিয়মা অচি। ১০॥"

উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত এই তিনটিকে (শিক্ষা) স্বর বলে, ইহাও শিক্ষাগ্রন্থে কথিত হইয়াছে। এই তিনটি লৌকিক ব্যাকরণ রীত্যনুসারে হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুত এই ত্রিবিধ সংজ্ঞাদ্বারা কথিত হইয়া থাকে। স্বরবর্ণ বিষয়ে কালবিশেষে এই সকল নিয়ম হইয়াছে। মাত্রা কাহাকে বলে, তাহাও শিক্ষাপুস্তকে উক্ত হইয়াছে।

"একমাত্রো ভবেদ্ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতং জ্ঞেয়ং ব্যঞ্জনং চার্দ্ধমাত্রকম্॥"

যাহার একটী মাত্রা তাহাকে হ্রস্বস্বর, যাহার দুইটী মাত্রা, তাহাকে দীর্ঘস্বর, যাহার তিনটী মাত্রা, তাহাকে প্লুত এবং সমুদয় ব্যঞ্জন বর্ণকে অর্দ্ধমাত্র কহে।

বল শব্দের অর্থ স্থান ও প্রযত্ন। স্থান যথা:—

"অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুরঃ কণ্ঠশিরস্তথা।
জিহ্বামূলঞ্চ দন্তাশ্চ নাসিকোষ্ঠৌচ তালুচ। ১২।"
(শিক্ষা।)

উরস্ (বক্ষঃস্থল), কণ্ঠ, শিরস্ (মস্তক) জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ এবং তালু, এই আটটী বর্ণের উচ্চারণ স্থান, অর্থাৎ যাবতীয় স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ, এই আটটী স্থান হইতে উচ্চারিত হইয়া থাকে। প্রযত্ন যথা;—

"অচোঽস্পৃষ্টাযণস্ত্বীষন্নেমস্পৃষ্টাঃ শরঃ (লঃ) স্মৃতা।
শেষাঃ স্পৃষ্টা হলঃ প্রোক্তা নিবোধানু প্রদানতঃ॥ ৩৮।"
(শিক্ষা। ইত্যাদি)

মহর্ষি পানিনিমুনি স্বর ও ব্যঞ্জনকে লইয়া কতক গুলিন সূত্র প্রণয়ন করেন। সেই সূত্র সকল কেবল সাঙ্কেতিক চিহ্নে চিহ্নিত করেন। প্রথমতঃ স্বরকে অচ্ ও ব্যঞ্জনকে হল্ সংজ্ঞা প্রদান করেন। অচের (স্বরের) মধ্যে আবার অনেক গুলিন অবান্তর ক্ষুদ্র সংজ্ঞা আছে। হলেরও (ব্যঞ্জন-বর্ণের) স্বরবর্ণের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবান্তর সংজ্ঞা আছে। এই সকল সংজ্ঞা দ্বারা সন্ধি, সুবন্ত, তিঙন্ত (ধাতু), কৃদন্ত ইত্যাদি স্থলে সবিশেষ উপকার হইয়া থাকে। এস্থলে আমরা দুই একটী সাঙ্কেতিক কথার বা সংজ্ঞার উদাহরণ দেখাইতেছি। ইতিপূর্ব্বে যে শিক্ষাগ্রন্থের কবিতাটী উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার মধ্যে ণ, শরষ, ইত্যাদি সাঙ্কেতিক কথা উক্ত হইয়াছে। য,ব,র,ল ইহাকে যণ সংজ্ঞা বলে, শ,ষ,স ইহাকে শর্ সংজ্ঞা বলে ইত্যাদি। কিন্তু যবরল ও শষস ব্যঞ্জনবর্ণেরই অন্তর্গত। যাহা হউক অচ অর্থাৎ স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিতে হইলে অন্য বর্ণের স্পর্শ বা সাহায্য লইয়া উচ্চারণ করিতে হইবে না। এই জন্য অচ বর্ণ অস্পৃষ্ট। যণ (যবরল) কি শর্ (শষস) ইহারা যথাক্রমে ঈষৎ স্পৃষ্ট, অর্থাৎ সামান্যমাত্র পরের সাহায্যে উচ্চারিত হইবে, এবং শর্ সম্পূর্ণ রূপে অপরের স্পর্শ বা সাহায্য পাইয়া উচ্চারিত হইবে। ইহা ভিন্ন অবশিষ্ট আর যতগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ রহিল, তাহারা স্পৃষ্ট, বা পরসাহায্যে উচ্চারিত হইয়া থাকে। এই

সকল বর্ণ উচ্চারণ করিতে হইলে, কি উচ্চারণ করিবার কালে পাঠকের প্রযত্ন বা প্রকৃষ্ট যত্ন আবশ্যক করে। নতুবা সমুদয় ব্যঞ্জনবর্ণের একরূপ উচ্চারণ হইয়া উঠে। একরূপ হইলে বেদমন্ত্রের কালসিদ্ধি হয় না। বস্তুতঃ এখন উচ্চারণ দোষে বৈদিক কার্য্যের কালসিদ্ধি হইতে পারে না।

সামশব্দের অর্থ সাম্য বা সমতা, বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিবার সময় অতি-দ্রুত, অতি বিলম্বিত, গীত স্বর ইত্যাদি দোষ পরিহার পূর্ব্বক মাধুর্য্যাদি গুণ যুক্ত হইয়া বেদমন্ত্রের উচ্চারণ করিলে সাম্য বা সমতা হয়।

গীতি শীঘ্রী শিরঃকম্পী তথা লিখিতপাঠকঃ।
অনর্থজ্ঞোঽল্পকণ্ঠশ্চ ষড়েতে পাঠকাধমাঃ॥ ৩২।
"উপাংশুদষ্টং ত্বরিতং নিরস্তং বিলম্বিতং গদ্গদিতং প্রগীতম্।
নিষ্পীড়িতং গ্রস্ত পদাক্ষরঞ্চ বদেন্ন দীনং নতু সানুনাসাম্॥" ৩৫।

(শিক্ষা)

যে পাঠক গান গাইয়া পাঠ করেন, কি শীঘ্র শীঘ্র পাঠ করেন অথবা মস্তক কাঁপাইয়া পাঠ করেন কিম্বা যেরূপ লেখা আছে অবিকল সেইরূপ পাঠ করেন অথবা যে পাঠক অর্থবোধ না করিয়া পাঠ করেন এবং যে পাঠকের কণ্ঠস্বর অতি মৃদু পাঠকের মধ্যে এই ছয়জন অধম। নির্জ্জনে বসিয়া চর্ব্বণ করার মত অতি দ্রুত ভাবে কোন বর্ণপরিত্যাগ করিয়া অতিশয় ধীরে গদ্গদস্বরে গান করিবার মতন সারভাগ আকর্ষণ করিয়া পদ ও অক্ষররাশি গ্রাস করিয়া দুঃখিত ভাবে কিম্বা অনুনাশিক বর্ণের অধিক উচ্চারণ করিয়া কদাচ বেদমন্ত্রপাঠ করিবে না। এই গুলিন দোষ।

"মাধুর্য্যমক্ষর ব্যক্তিঃ পদচ্ছেদস্তু সুস্বরঃ।
ধৈর্য্যং লয় সমর্থঞ্চ ষড়েতে পাঠকা গুণাঃ॥"

(শিক্ষা।)

পড়িবার কালে মধুরতা থাকিবে, অক্ষর সকল অতি সুস্পষ্ট উচ্চারিত হইবে, পদ গুলিন ছেদ করিয়া দিতে হইবে, উত্তম স্বর থাকিবে,

ধৈর্য্য প্রকাশ তাহাতে বিদ্যমান থাকিবে, উপযুক্ত স্থানে থামিতে হইবে এই সকল সুপাঠের নিয়ম, এই ছয়টী পাঠকের গুণ।

সন্তান শব্দের অর্থ সংহিতা বা সন্ধি যথাঃ—

"বায়াবায়াহি" হে পবন! তুমি আগমন কর, এই স্থানে সন্ধি করিয়া আব্ আদেশ হইয়াছে। "ইন্দ্রাগ্নী আগতম্" হে ইন্দ্র! হে অনল! তোমরা দুই জনে আগমন কর। এই স্থানে প্রকৃতিভাব, অর্থাৎ ঈকার স্থানে য না হইয়া যেমন প্রকৃতি, তেমনই রহিল। সুতরাং শিক্ষাগ্রন্থে বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল, সাম ও সন্তান, এই ছয়টী বিশেষ উপকারক।

মন্ত্রো হীন স্বরতো বর্ণতো বা
মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
সবাগ্ বজ্রো যজমানঃ হিনস্তি
যথেন্দ্র শত্রু স্বরতোঽপরাধাৎ

(শিক্ষা।)

কোন বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিবার কালে যদি তাহার প্রকৃত স্বরের (যেস্থানে যেস্বর যথার্থ প্রয়োগ করা উচিত) ব্যাঘাত ঘটে কিম্বা প্রকৃত বর্ণের (যে স্থানে যে বর্ণের যথার্থ প্রয়োগ করা উচিত) কোন ত্রুটি হয়, কিম্বা মিথ্যাকরিয়া কোন বেদ মন্ত্রের প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে সেই বেদ মন্ত্র সেইস্থানে সেই অর্থ (যে অর্থ তথায় হওয়া আবশ্যক) প্রকাশ করিতে পারেনা। বস্তুতঃ এরূপ স্থলে ঐ বেদবাক্য বজ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া যজমানকে বধ করিয়া থাকে। এরূপ প্রবাদ আছে, "ইন্দ্রশত্রু" এই মন্ত্র দ্বারা আহুতি করিবার কালে যদি (স্বরের উদাত্ত স্থানে অনুদাত্তের ইত্যাদি) বৈপরীত্য ঘটে অর্থাৎ যদি (ইন্দ্র হইয়াছে শত্রু যাহার) এইরূপ বহুব্রীহি সমাস স্থলে "ইন্দ্রস্য শত্রু" ইন্দ্রের শত্রু এই ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস অন্য স্বরের উপস্থিতি দেখান যায় তবে তাহাতে যজমানের অবশ্য মৃত্যু হইবে; বহুব্রীহি স্থলে একপ্রকার স্বর, তৎপুরুষস্থলে আর প্রকার স্বর। কিন্তু হোমের সময় অন্য স্বরে আহুতি দিলে কোথায় ইন্দ্রশত্রু নিপাত করিবেন, না, তাহার পরিবর্ত্তে ইন্দ্রের নিপাত হইয়া থাকে।

পাঠক! ভাবিয়া দেখুন বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিবার কালে স্বর ও বর্ণের বৈপরীত্য হইলে কতই অনিষ্টপাতের সম্ভাব না? কতই বিপদ ঘটিতে পারে? অতএব স্বর, বর্ণ ইত্যাদি অপরাধ পরিহারার্থে অবশ্য শিক্ষাগ্রন্থের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ।

হিন্দুধর্ম্ম ও নাস্তিকতা।

আজি কালি আমরা একটী নূতন ভাবের বিকাশ দেখিতে পাইতেছি। হিন্দু ধর্ম্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাবটীর সমুত্থান হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের উদারতা দেখিয়া আজি কালি অনেকে হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যাতাদিগকে নাস্তিক উপাধি প্রদান করিতেছেন। শশধর তর্কচূড়ামণি, বঙ্কিম বাবু, নবজীবনের লেখক ও সম্পাদক এবং মানবতত্ত্ব প্রণেতা ও জাহ্নবী সম্পাদক এক্ষণে হিন্দু-ধর্ম্ম প্রচারে সমধিক যত্নশীল হইয়াছেন। তাঁহাদের কৃত হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা ও যুক্তির মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া অনেকে তাঁহাদিগকে নাস্তিকতা প্রচারক বলিয়া প্রকাশ করেন। এই সুযোগ পাইয়া নাস্তিকগণ বলিতেছেন যে যদি হিন্দুধর্ম্ম আস্তিকতা হয় তবে নাস্তিকতা ও আস্তিকতা একই কথা অথবা হিন্দুধর্ম্ম প্রচারকগণ প্রকৃত পক্ষে নাস্তিক হইয়াও মুখে আস্তিকতার ভাণ করিতেছেন, ঐ ভাণ পরিত্যাগ করিলেই তাঁহাদের সত্যপথে চলা হয়। নচেৎ তাহাদিগকে আস্তিক বলিলে নাস্তিক নাম জগতে থাকিতে পারে না। সমাজ মধ্যে এই ভাবের উদয় হওয়াতে যে সর্ব্বসাধরণের অনিষ্ট সম্ভাবনা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই জন্য অদ্য আমরা সেই ভ্রান্তি প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিব।

আরও আশ্চর্য এই যে, উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ এরূপও বলিয়া থাকেন, যে, কেবল উক্ত প্রচারকগণ নাস্তিক নহেন—হিন্দুধর্ম্মেরই মূল নাস্তিকতাময়। তাঁহারা বলেন শঙ্করাচার্য্য নাস্তিক, কপিল নাস্তিক, পাতঞ্জল ভিন্ন সমস্ত দর্শনকারই নাস্তিক এবং অনেক ঋষিও নাস্তিক—হিন্দুধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল যে ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে তৎসমস্তই নাস্তিক্যময়, সে সকল যুক্তি ও নাস্তিকের যুক্তি একই প্রণালীর। নাস্তিকগণ এইরূপ বলিয়া হিন্দুধর্ম্মকে সুতরাং আস্তিকতাবাদমাত্রকে এবং হিন্দুধর্ম্ম প্রচারক দিগকে দমন করিবার চেষ্টা করেন। উক্ত উপায় অবলম্বন ভিন্ন হিন্দুধর্ম্মের প্রবল অস্ত্রের নিকট নাস্তিকতা রক্ষা পায় না বলিয়া নাস্তিকেরা ঐ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। ব্রাহ্মগণও হিন্দুধর্ম্মের নিকট পরাজিত হইয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া ঐ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন—হিন্দুধর্ম্মকে পুনরায় মুখ উত্তোলন করিতে দেখিয়া নাস্তিক ও ব্রাহ্ম মিলিত হইয়াছেন।

পৃথিবীতে যত ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন তৎসমস্তই যুক্তির একান্ত বিরুদ্ধ। বিশ্বাস না করিলে কোন ধর্ম্মই টিকিতে পারে না, যুক্তির কাছে কোন ধর্ম্মই দাঁড়াইতে পারে না। হিন্দুধর্ম্মও ইদানীং ঐ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নাস্তিকতার এত প্রভুত্ব হইয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম যুক্তির ধর্ম্ম নাস্তিকতাও যুক্তিসম্ভূত। ইঁহারা কেহই বিশ্বাস মানেন না—জ্ঞান ও যুক্তিই ইঁহাদের মূল অবলম্বন। যখন খৃষ্টধর্ম্ম বলিল ঈশ্বর ছয়দিনে ছয় রকম সৃষ্টি করিয়া ৭ ম দিনে বিশ্রাম করিলেন, তখন নাস্তিক ও ব্রাহ্ম বলিলেন তাহার প্রমাণ কি? খৃষ্টান বলিলেন বাইবেল উহার প্রমাণ। নাস্তিক ও ব্রাহ্ম বলিলেন তোমার বাইবেল যদি প্রমাণ হয়, তবে মুসলমানের কোরাণও প্রমাণ, হিন্দুর বেদ, স্মৃতি, তন্ত্র, প্রভৃতিও প্রমাণ হইবে। কিন্তু তাহা হইলে তুমি যে বলিতেছ খৃষ্ট ভিন্ন পরিত্রাণ নাই তাহা সত্য হইলে কোরাণ ও বেদাদি মিথ্যা হয়। কিন্তু সেই সকল মিথ্যা ও বাইবেল সত্য তাহার যদি কোন বিশিষ্ট প্রমাণ না থাকে তবে কেবল মাত্র পুস্তকে লিখিত বলিয়া— পুরাতন পুস্তকে লিখিত বলিয়াই বাইবেলকে সত্য বলিতে পার না। কেন না তাহা হইলে কোরাণ ও বেদ প্রভৃতির সে দাবী

আছে। যখন তোমার বাইবেলের ন্যায় কোরাণ, বেদ প্রভৃতিও ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া খ্যাত ও যখন সে সকলের মতের সহিত তোমার বাইবেলের মতের ঐক্য নাই তখন কি প্রকারে বলিব যে, তোমার বাইবেলের কথা সত্য। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্ম ও নাস্তিকগণ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেরই অলীকত্ব প্রমাণ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে প্রমাণের বলে বাইবেলকে সত্য বলিতে হয়, সেই প্রমাণের বলে কোরাণ, বেদ প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রকেই সত্য বলিতে হয়; কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে উহার একটিকে সত্য বলিতে হইলে অন্যটীকে মিথ্যা বলিতে হয়, তখন ঐ প্রমাণ উহাদের সত্যতাজ্ঞাপক না হইয়া বিপরীতই প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং সে প্রমাণের বলে কোন ধর্ম্মশাস্ত্রকে সত্য বলিতে পারা যায় না, প্রত্যুত: মিথ্যা বলিতে হয়।

এইপর্য্যন্ত ব্রাহ্ম ও নাস্তিক একদলস্থ। ইহার পর হইতে নাস্তিকের সহিত ব্রাহ্মের মতভিন্নতা আরম্ভ হইল। ব্রাহ্ম বলিলেন কোন ধর্ম্মশাস্ত্রই ঈশ্বরের লিখিত নহে, ঈশ্বরাজ্ঞাসকল কোন গ্রন্থে লিখিত নাই, উহা প্রত্যেক মানবের মনে লিখিত আছে। নাস্তিক কহিলেন ব্রাহ্ম ভায়া! তুমি এ পর্য্যন্ত যুক্তি পথে চলিয়া এক্ষণে যুক্তিত্যাগ করিতেছ কেন? ঈশ্বর যে আছেন তাহার প্রমাণ কি? ব্রাহ্ম বলিলেন যেখানে কার্য্য সেইখানে কর্ত্তা দেখা যায়, সুতরাং বিশ্বকার্য্যের অবশ্য কর্ত্তা আছেন। নাস্তিক বলিলেন যেখানে কার্য্য ও কর্ত্তা দেখা যায়, সেই খানেই দেখা যায় কর্ত্তা শাস্তা নহে; তবে ঈশ্বরূপ কর্ত্তা; তোমার শাস্তা কেন? বিশেষতঃ যখন কর্ত্তা ভিন্ন কার্য্য হয় না বলিতেছ তখন কি ভাল কি মন্দ, কিন্যায় কি অন্যায় সমস্ত কার্য্যেরই কর্ত্তা আছে বলিতে হইবে; ঐ সকল কার্য্যের যদি একই কর্ত্তা হয় তবে সে কর্ত্তার কাছে ন্যায় অন্যায়ের বিচার হইবে কেন? কি জন্য মন্দ কার্য্যের কর্ত্তা মন্দ কার্য্যের ফল স্বরূপ আমাদিগকে দণ্ড দেন। অতএব ব্রাহ্ম ভায়া! তোমার যখন বুদ্ধি আছে, যখন তুমি যুক্তিপথ অবলম্বন কর তখন তুমি কেন শাস্তা ও পুরস্কার দাতা ঈশ্বর আছেন বলিয়া আপনার বুদ্ধির কলুষতা প্রকাশ করিতেছ? এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া নাস্তিক ব্রাহ্ম ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী আস্তিকদিগকে বিচারে পরাস্ত করেন।

আর এক কারণে নাস্তিকগণ আস্তিকদিগকে পরাজয় করিয়া থাকেন। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রকারই ঈশ্বরকে বিশ্বহইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহারা মানবকে দাস বা প্রজা এবং ঈশ্বরকে প্রভু বা ভূম্যাধিকারী রূপে বর্ণন করেন, অথবা ঈশ্বকে কর্ম্মকারের বিশ্বকে কারুজাত পদার্থের সহিত তুলিত করেন, অথচ দাস, প্রজা ও কারুপদার্থ যেমন প্রভু, ভূম্যধিকারী ও কর্ম্মকারের সৃষ্ট নয় অন্ততঃ উপকরণও সৃষ্ট নয়, বিশ্ব ও ঈশ্বরের বেলা তাঁহারা সেরূপ বলেন না—তাঁহারা বলেন সমস্ত পদার্থ, সমস্ত উপকরণ, সমস্ত শক্তি ঈশ্বরের সৃষ্ট। সুতরাং তাঁহারা যে ঈশ্বরকে বিশ্ব হইতে স্বতন্ত্র বলিতেছেন বাস্তবিক তাহা হইতেছে না। সমগ্র বিশ্ব ঈশ্বরের অংশ রূপে উদ্ভূত না হইয়া, ইচ্ছামাত্র জাত বলিলেও ঈশ্বরের অংশ হইতেছে। সুতরাং আমাদের সহিত তাঁহার দাস প্রভু প্রভৃতির ন্যায় সম্বন্ধ নিতান্ত অসম্ভব ও আমাদের তোষামোদে তিনি তুষ্ট, আমাদের কুবাক্যে তিনি রুষ্ট ইত্যাদি বলা নিতান্ত অসঙ্গত। সুনিয়ম কাহাকে বলে তাহা তিনি আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেন না, অথচ সুনিয়মে না চলিতে পারিলে আমাদের উপর এত ক্রোধ করেন, যে, শাস্তি দিয়া তাঁহার আশ মেটে না। নরকে বিষ্ঠার হ্রদে ফেলিতেছেন, আগুণে পুড়াইতেছেন, প্রহার করিতেছেন, বিচার দিনের অপেক্ষায় নিরাধার স্থানে জড়বৎ রাখিতেছেন, আবার বিচার করিয়া জজ বা মেজেষ্টার সাহেবের ন্যায় দণ্ডাজ্ঞা করিতেছেন। আমরা যেন নিতান্ত বিদ্রোহী প্রজা আর তিনি যেন দণ্ডধারী রাজা (Emperor)। আমরা যেন তাঁহার ‘পাকা ধানে মই দিয়াছি, তিনি রাগে গর গর করিয়া আমাদিগকে শাসন করিতেছেন। এ সকলই অসম্ভব। এরূপ অবিচারক নিষ্ঠুর প্রকৃতি সুখাভিলাষী ঈশ্বর যুক্তির কাছে টেকে না। তাই নাস্তিক আস্তিকদিগকে পরাজয় করিয়াছেন মনে করেন।

মহাসাগর তুল্য হিন্দুধর্ম্ম গোষ্পদের ন্যায় হইয়াছিল, তাই নাস্তিকগণ এই সকল তর্ক তুলিতে পারিয়াছিলেন। অন্য ধর্ম্মশাস্ত্র সকল পূর্ণ ধর্ম্ম নহে, সে সকলে ঈশ্বরের প্রকৃত লক্ষণ প্রকাশ নাই, তাই নাস্তিক আস্তিকদিগকে

পরাজিত করিয়াছেন মনে করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীগণ আপনাদের ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ করেন। আজি হিন্দুধর্ম্ম স্বীয় মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে উদ্যত হওয়ায় সকলেরই মস্তক অবনত হইয়াছে। তাই তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যাতাদিগকে নাস্তিক নামে নির্দ্দেশ করিয়া আপনাদিগকে পদস্থ রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন।

এরূপ বলিতে পারিবার কয়েকটী কারণ আছে। হিন্দুধর্ম্ম সকলকে ডাকিয়া বলিতেছে, তোমাদের সকলকার কথাতেই কিছু কিছু সত্য আছে অথচ সকলেই ভ্রান্তিসঙ্কুল। প্রকৃত বিজ্ঞ হিন্দু বলিতেছেন, ওহে খৃষ্টান! তুমি যে বলিতেছ যে, খৃষ্ট ভিন্ন তোমাদের পরিত্রাণ নাই, সে কথা সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু তুমি যে হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতিকেও বলিতেছ খৃষ্ট ভিন্ন পরিত্রাণের উপায় নাই, তাহা তোমার ভুল; ঈশ্বর দেশ বিশেষের নহেন, কাল বিশেষের নহেন। তিনি সর্ব্বকালে সর্ব্ব দেশে বিরাজিত। ওহে ব্রাহ্ম! তুমি যে বলিতেছ ঈশ্বরাজ্ঞা সকল পুস্তকে লিখিত নহে, মানব মনে নিহিত আছে, তাহা সত্য; কিন্তু তুমি যে বলিতেছ সকলেই আপন মন হইতে ঈশ্বরাজ্ঞা অবগত হইয়া কার্য্য করিবে তাহা তোমার ভুল। ওহে নাস্তিক! তুমি যে বলিতেছ স্বতন্ত্র সৃষ্টিকর্ত্তা নাই, তাহা সত্য কিন্তু তুমি যে ঐশী শক্তি স্বীকার কর না, স্বার্থসাধনই তোমার মুখ্য উদ্দেশ্য মনে কর সেটী তোমার ভুল। আর ওহে বিজ্ঞ সম্প্রদায়ীগণ! তোমারা যে বলিতেছ সকল মনুষ্য সমান, সকলের সুখ দুঃখও স্বত্ব অধিকার সমান, সকলেরই আপন বিবেচনা অনুসারে বলা উচিত; পদার্থ বা মানব বিশেষকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করা অনুচিত তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিময়। হিন্দু বলেন তুমি আমি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহি, কোন কার্য্যই এক কালীন অকর্ত্তব্য বা কর্ত্তব্য নহে, সকল পদার্থ, জীব ও মনুষ্য পরস্পর সমান নহে, সকলের স্বত্ব অধিকারও সমান নহে, বৈষম্যই বিশ্ব এবং পাপ পুণ্যের ব্যবস্থা সকল অবস্থায় সমান নহে। এই সকল কথা সাধারণ আস্তিকদিগের মতের বিরুদ্ধ তাই ব্রাহ্ম হিন্দুকে নাস্তিক বলেন এবং এই সকলকে যথেচ্ছাচারের পোষক মনে করিয়া নাস্তিকগণ আপনাদিগের সহিত তাঁহাদের এক মত বিবেচনা করেন। বাস্তবিক

উক্ত মত সকল যে নাস্তিকদিগের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত তাহা কিঞ্চিৎমাত্র বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে। হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃত মত সকল যে নাস্তিকতা ব্যাধির মহৌষধ তাহা আমরা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

প্রথমে বিবেচনা করা আবশ্যক নাস্তিক ও আস্তিককের লক্ষণ কি? সর্ব্বসাধারণ মত এই যে, যাঁহারা ঈশ্বর আছেন এই কথা স্বীকার করেন তাঁহারা আস্তিক ও যাঁহারা ঈশ্বর নাই বলেন তাঁহারা নাস্তিক। কিন্তু উহা উহার সম্পূর্ণ লক্ষণ নহে। স্পষ্ট করিয়া লক্ষণ করিতে হইলে এইরূপ বলিতে হয়, যাঁহারা আপন শক্তিকে সম্পূর্ণ জ্ঞান করেন তাঁহারা নাস্তিক ও যাঁহারা আপন শক্তিকে কোন মহাশক্তির সম্পূর্ণ অধীন মনে করেন তাঁহারা আস্তিক। অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি মনে করেন, যে, চেষ্টা করিলে সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিতে পারা যায় এবং আত্মতুষ্টিই যাহাদের সকল কার্য্যের মূল উদ্দেশ্য তাহারা নাস্তিক এবং যে সকল ব্যক্তি মনে করেন মহাশক্তির অনুমত না হইলে আমরা সহস্র চেষ্টা করিলেও কার্য্য করিতে পারি না, আত্মতুষ্টি আমাদের উদ্দেশ্য নহে, যে মহাশক্তির অধীনে আমাদের সমস্ত শক্তি পরিচালিত হইতেছে সেই মহাশক্তির উদ্দেশ্য সাধনই আমাদের ও বিশ্বের সকল পদার্থের মুখ্য উদ্দেশ্য তাঁহারাই আস্তিক। নাস্তিকগণ যত কেন সুস্বভাবাপন্ন হউন না, যত কেন শিক্ষিত হউন না, যত কেন পরোপকারী হউন না, তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য স্বার্থপরতা। তাঁহারা যে দরিদ্রদিগকে অর্থদান করেন, স্বদেশের জন্য প্রাণদান করেন, তাহা হয় স্বাভাবিক শক্তিপ্রেরিত হইয়া নতুবা অভ্যাস পরতন্ত্র হইয়া। তদিতর স্থানে যাঁহারা উক্তবিধ কার্য্য করেন তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য স্বার্থপরতা। পরের উপকার না করিলে আপনি উপকার পাইব না, দেশরক্ষা না করিলে আপনি কষ্ট পাইব ইত্যাদি যুক্তির অনুসরণ করিয়াই তাঁহারা ঐরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু হিন্দু সহস্রবার ঈশ্বর ও আমি এক বলুন, সকলে স্বত্ব ও অধিকার অসমান বলুন, তাঁহার মূল উদ্দেশ্য ঈশ্বরকার্য্য সাধন। যে উদ্দেশ্য সাধনজন্য মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ, জড়, অজড় সমস্ত পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্য হিন্দু কার্য্য করেন। তাঁহার কার্য্যে স্বার্থপরতার লেশমাত্র নাই—

সুখস্পৃহার চেষ্টামাত্র নাই। পৃথিবীতে যত ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা হিন্দু আস্তিক। কেন না সকল সম্প্রদায়ই আপন সুখের জন্য কার্য্য করেন, অন্ততঃ পরকালে সুখী হইবার আশায় কার্য্য করেন। কিন্তু হিন্দু তাহা করেন না। হিন্দু বলেন সুখ দুঃখ জানি না, আত্মপর জানি না, যাহা ঈশ্বরের কার্য্য তাহাই করিব এবং তাহা করিয়াই সুখী হইব। ঈশ্বরই সুখ, ঈশ্বরই সর্ব্বস্ব। এই মহৎ ভাব যাহার অন্তরে নিহিত তাহার সহিত কে তুলিত হইতে পারে?

নাস্তিক বলেন যখন হিন্দু বলিতেছেন, স্বতন্ত্র ঈশ্বর নাই বিশ্ব ও ঈশ্বর এক এবং সেই হিসাবে সকলেই আপনাকে সোঽহং বলিতেছেন, তখন আর পাপপুণ্যে প্রভেদ কি থাকিল? এবং তখন ঈশ্বর নিয়মে আমরা চলিতে বাধ্যই বা কি প্রকারে? ঈশ্বর স্বতন্ত্র হইতেন ও আমরা স্বতন্ত্র হইতাম তাহা হইলে কাযেই আমাদিগকে সর্ব্বশক্তিমানের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে হইত। কিন্তু তাহা না হইয়া তিনি সমষ্টি ও আমরা ব্যষ্টি অর্থাৎ অংশ মাত্র হইলে আমাদের তাঁহাকে ভয় করিতে হইবে কেন? আমাদের যে দুঃখ সে বাস্তবিক আমাদের নহে এবং আমাদের যে সুখ তাহাও আমাদের নহে; সমস্ত সুখ দুঃখই ঈশ্বরের তজ্জন্য আমরা চিন্তিত বা ব্যথিত হইব কেন? সুতরাং অদ্বৈত বাদী হিন্দুর ঈশ্বরে ভয় হইতে পারে না, তাহাহইলে আর উহা নাস্তিকতা হইতে ভিন্ন হইল কৈ? নাস্তিকেরাও ত তাহাই বলিতেছেন। তাঁহারা ত এরূপ বলেন না যে আমরা স্বকীয় শক্তি ও ইচ্ছা হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছি ও আমরা সকল সময়ে আপন শক্তি অনুসারে চলিতে পারি। নাস্তিকেরা যাহা বলেন তাহার মর্ম্মও ঐরূপ অর্থাৎ কোন নিত্য শক্তি বিশেষ বর্ত্তমান আছে, সেই শক্তিই সমস্ত পদার্থের উপাদান, সেই শক্তি আমাদিগকে যেরূপে উৎপন্ন করে আমরা সেইরূপে উৎপন্ন হই। কিন্তু সে শক্তির কোন ইচ্ছা বা সুখলালসা নাই, আমাদিগকে সে শক্তির উপাসনা করিতে হইবে না। সে শক্তির নিয়মে আমরা যাহাতে সুখী হই তাহা করাই আমাদের কর্ত্তব্য। সে শক্তিকে তুষ্ট করিবার জন্য আমাদিগকে ব্রত বিশেষ, তপস্যা বিশেষ করিবার আবশ্যক নাই। সুতরাং হিন্দু আস্তিকে ও নাস্তিকে আর সকলই

মিলিতেছে কেবল উপসনা ব্যাপারই মিলিতেছে না। কিন্তু সে উপাসনা উক্তরূপ আস্তিকদিগের পক্ষে "মাথা নাই তার মাথাব্যথার" তুল্য হাস্যাস্পদই হইতেছে মাত্র। কেন না তাঁহারা বলিতেছেন,—

"জানামিধর্ম্মং নচমে প্রবৃত্তি জানাম্যধর্ম্মং নচমে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়াঋষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

ধর্ম্ম যে কর্ত্তব্য তাহা জানিয়াও তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই এবং অধর্ম্ম যে অকর্ত্তব্য তাহা জানিয়াও আমি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারি না। কেন না হে ঋষিকেশ ঈশ্বর! তুমি আমার হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে যাহা করাও আমি তাহাই করি। কার্য্যকরণে আমার কোন প্রভুতা নাই।

ইহা যদি সত্য হইল তবে আমি কিজন্য ঈশ্বরকে ভয় করিব? যখন স্পষ্ট বুঝিলাম আমাদের কোন ক্ষমতা নাই, সকলই ঈশ্বর করান, তখন আর আমাদের পাপের ভয় থাকিল কৈ? তিনি আমাদিগকে পাপকরাইয়া আমাদিগকে দণ্ড দিবেন, একি সম্ভব কথা? তাহাহইলে কি ঈশ্বরের চরিত্র অতি ভয়ানক রূপে গঠিত হইল না? সুতরাং বলিতে হইতেছে, হিন্দু ঈশ্বরকে ভয় করেন না, পাপপুণ্য মানেন না। আমরা বলিতে পারি যে. তাঁহারা নাস্তিক হইতেও ভয়ানক জিনিস। কেন না নাস্তিক ঈশ্বরকে ভয় না করুন আপনার কার্য্যের দোষাদোষ আপনার স্কন্ধে নিক্ষেপ করেন। কোনও রূপ দুঃখ পাইলে আপনার দোষেই সে দুঃখ হইয়াছে বলেন, এবং যাহাতে ভবিষ্যতে সেরূপ না হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু হিন্দু তাহাও করার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। তিনি আপনার কৃত পাপের জন্য আপনাকে দায়ী মনে করেন না, আপন চেষ্টায় তাহার প্রতিকার হইতে পারে না বলেন, অথচ ঈশ্বর তাহার জন্য তাঁহাকে দণ্ড দিবেন এ কথাও বিশ্বাস্য হইল না। সুতরাং হিন্দু না করিতে পারেন এমত কর্ম্মই নাই। যাহার ঈশ্বর ভয় থাকিল না আপনারও দায়িত্ব থাকিল না তাহার আর ভয় কি? তিনি অতি মহাপাতক করিয়াও লোকের কাছে দোষী হইবেন না—বলিবেন আমার উহাতে ক্ষমতা নাই।

এইরূপ নানা প্রকার তর্ক করিয়া নাস্তিকগণ হিন্দুদিগকে নাস্তিক রূপে

প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করেন না, যে, হিন্দু ঐ সকল কথা উপরোক্ত অর্থে প্রয়োগ করেন না। তাঁহাদের গভীর অর্থ নাস্তিকদিগের হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা কি? আমরা তাহার বং কিঞ্চিৎ মর্ম্ম প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছি।

ক্রমশঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভগবান বাসুদেব অর্জ্জুনের কথার উত্তর আরও বিবদরূপে দিতেছেন। তিনি কহিলেন ;—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে। ৫৫।
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম্মুনিরুচ্যতে। ৫৬।
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভং।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ৫৭।
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ৫৮।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে পার্থ! যিনি সর্ব্বপ্রকার মনোগত কামনা পরিত্যাগ করেন, যাঁহারা আত্মা আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। যিনি দুঃখে অক্ষুব্ধচিত্ত, সুখে স্পৃহাশূন্য এবং অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ বিবর্জ্জিত সেই মুনি স্থিতপ্রজ্ঞ। যিনি সকল বিষয়ে স্নেহশূন্য সুতরাং

অনুকূল বিষয়ে অভিনন্দন ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ করেন না তাঁহারাই প্রজ্ঞা নিশ্চলা ও তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। কূর্ম্ম যেমন আপন অঙ্গসকল সংকোচন করে; সেই রূপ যিনি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় গণকে প্রত্যাহরণ করেন তাঁহারই প্রজ্ঞা নিশ্চলা ও তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

বাসুদেব যাগ কহিলেন, তাহার অর্থ পাছে কেহ এরূপ বুঝেন যে, বিষয় কার্য্য পরিত্যাগ করিলেই স্থিতপ্রজ্ঞ হয়, সুতরাং উন্মাদ, জড়, অক্ষম ও অনাহারে শীর্ণদেহ প্রভৃতিবা অক্ষমতা হেতু ও কপটাচারীগণ স্বার্থসাধন জন্য আপাততঃ যে বিষয় ভোগ করে না, ভাল মন্দ বিচার করে না ও প্রিয়াপ্রিয় ভেদ করে না, তাহারাও স্থিতপ্রজ্ঞ। তাই বলিতেছেন বিষয় ভোগ ত্যাগ করিলেই স্থিতপ্রজ্ঞ হয় না।

বিষয়াবিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে। ৫৯।

যিনি ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণ না করেন, বিষয়সকল তাঁহার নিকট হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে বটে কিন্তু তাহাতে বিষয়াভিলাষ বিনিবৃত্ত হয় না। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া বিষয়বাসনা হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া থাকেন।

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ না করিলে বিষয় নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু লালসা পরিত্যাগ হয় না। তবে সমস্ত অভিলাষ ঈশ্বরে অর্পণ করিতে পারিলে বিষয় অভিলাষ বিনিবৃত্ত হইতে পারে। কেন না;—

যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ। ৬০।
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্তআসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্যপ্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ৬১।
ধ্যায়তোবিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎসংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে। ৬২।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশোবুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি। ৬৩।

ক্ষোভজনক ইন্দ্রিয়গণ যত্নশীল বিবেকী পুরুষের চিত্তকেও বল পূর্ব্বক হরণ করে, এই নিমিত্ত যোগশীল ব্যক্তি তাহাদিগকে সংযমন পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া থাকিবেন। এই রূপ ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশীভূত থাকে, তাঁহারই প্রজ্ঞা নিশ্চলা ও তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। প্রথমে বিষয়চিন্তা, চিন্তা হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে অভিলাষ, অভিলাষ হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ উপস্থিত হয়।

অর্থাৎ দুরন্ত ইন্দ্রিয়গণ মোক্ষলিপ্সু ও বিবেকীগণেরও চিত্ত হরণ করে, সুতরাং তাহাদিগকে দমন করিয়া চিত্তকে ঈশ্বরাভিমুখে ধাবিত না করিলে বিষয় বাসনা পরিত্যাগ হয় না। যাঁহারা ঐরূপে ইন্দ্রিয় দমন করিয়া ঈশ্বরে চিত্তার্পণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদেরই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিতে হইবে। বিষয়ের অনুধ্যানই সকল দোষের মূল। কেন না বিষয় চিন্তা হইতে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কামনা জন্মে, কামনা জন্মিলে, কোন প্রকারে তাহার ব্যাঘাত হইলে তাহা হইতে ক্রোধ জন্মে, ক্রোধ হইতে মোহ ও মোহ হইতে স্মৃতি বিভ্রম উপস্থিত হয়। অর্থাৎ আপনি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি কোথায় যাইব, আমার উদ্দেশ্য কি, কর্ত্তব্য কি কিছুই জ্ঞান বা স্মরণ থাকে না। ঐ স্মৃতিবিভ্রম হইতেই বুদ্ধিনাশ হয়। যাহার কার্য্য জ্ঞান থাকিল না, স্মৃতি থাকিল না, তাহার আর বুদ্ধি কোথায়? বুদ্ধির আর কার্য্য কি? বুদ্ধি নাশ হইলেই মানবের নাশ হইল, অর্থাৎ বুদ্ধিশূন্য মনুষ্য মনুষ্য নামেরই যোগ্য নহে, সুতরাং তাহার মনুষ্য নাম জ্ঞাপক দেহ থাকিলেও তাহার মনুষ্যত্ব নাশ হইল। সে প্রকৃত মানব পদবাচ্য হইতে পারিল না। অতএব বিষয় অনুরাগই সমস্ত দোষের কারণ এবং ঈশ্বরে অনুরাগই সকল গুণের আকর। কিন্তু তাই বলিয়া বিষয়-ভোগ করাই যে দোষাবহ এবং বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করিলেই যে ধার্ম্মিক ও সুখী হয় তাহা নহে। বস্তুতঃ বিষয়ে অনুরাগ ও বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়াদির বিক্ষেপই দোষাবহ। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি করিবার জন্য বিষয় ভোগ করাই দোষাবহ। নতুবা,—

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি। ৬৪।
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসোহ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে। ৬৫।

যিনি আত্মারে বশীভূত করিয়াছেন, তিনি রাগদ্বেষবর্জ্জিত আত্ম-বশীভূত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয়োপভোগ করিয়াও আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, আত্মপ্রসাদ থাকিলে সকল দুঃখ বিনষ্ট হয়। প্রসন্নাত্মার বুদ্ধিই আশু নিশ্চল হইয়া উঠে।

অর্থাৎ রাগ দ্বেষাদির বশীভূত না হইয়া আত্মার অধীনে ইন্দ্রিয়গণকে রাখিয়া তদ্দ্বারা বিষয় ভোগ করিলে কোন দোষ নাই। প্রত্যুতঃ তাহাতেই প্রকৃত প্রসন্নতা লাভ হয়। প্রসন্নতা হইলেই সকল দুঃখের নাশ হয় বুদ্ধিরও স্থিরতা হয়। তদ্ভিন্ন প্রকৃত সুখ আর নাই। কেন না—

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখং। ৬৬।
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি। ৬৭।
তস্মাদ্যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ৬৮।
বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মোনিরহঙ্কারঃ সশান্তি মধিগচ্ছতি। ৭১।

অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির বুদ্ধি নাই; সুতরাং সে চিন্তা করিতেও পারে না; চিন্তা করিতে না পারিলে শান্তি হয় না; শান্তিহীন ব্যক্তির সুখ কোথায়? যে চিত্ত স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হয়, সে চিত্ত বায়ু কর্ত্তৃক সমুদ্রে ইতস্তত বিঘূর্ণায়িত নৌকার ন্যায় জীবাত্মার বুদ্ধিকে বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করে। অতএব হে মহাবাহো! যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে নিগৃহীত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিরই প্রজ্ঞা নিশ্চলা ও তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। যিনি কামনাসকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও

মমতাবিহীন হইয়া ভোগ্য বস্তুসমুদয় উপভোগ করেন, তিনি মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

অর্থাৎ যাহার বুদ্ধি স্থির নাই, বিবিধ প্রকার ইন্দ্রিয় যাহার বুদ্ধিকে একবার এদিকে আর একবার ও দিকে লইয়া গিয়া নিয়ত ব্যতিব্যস্ত করিতেছে, নানা প্রকার কামনা যাহার বুদ্ধিকে নানা দিকে লইয়া গিয়া নিয়ত চঞ্চল করিতেছে তাহার বুদ্ধির দৃঢ়তা থাকে না, মতির স্থৈর্য্য থাকে না ভাবনার দৃঢ় ভিত্তি থাকে না, সুতরাং সে কখন নিবিষ্টচিত্ত বা স্থির হইতে পায় না। যাহার চিত্তে স্থৈর্য্যজনিত ধ্যান নাই তাহার মনের শান্তি থাকে না। সে নানা প্রকার ইন্দ্রিয়ের প্রলোভন দ্বারা নিয়ত পরস্পর বিপরীত দিকে আকৃষ্ট হইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। নানা প্রকার বায়ু যেমন জলোপরিস্থ নৌকাকে নানাদিকে পরিচালিত করিয়া নিমগ্ন করিবার চেষ্টা করে, ইন্দ্রিয়গণও সেইরূপ তাহাকে নানাদিকে চালিত করিয়া বিনাশ করিবার চেষ্টা করে। অতএব যিনি চাঞ্চল্যজনক ইন্দ্রিয় সকলকে দমন করিতে পারেন, কামনা সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হইতে পারেন তাঁহারই প্রজ্ঞা স্থির হয় ও তিনিই প্রকৃত সুখী হয়েন। কিন্তু ;—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ। ৬৯।

অজ্ঞান-তিমিরাবৃতমতি ব্যক্তিদিগের নিশাস্বরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠাতে জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ জাগরিত থাকেন ; এবং প্রাণিগণ যে বিষয়নিষ্ঠাস্বরূপ দিবায় প্রবোধিত থাকে, আত্মতত্ত্বদর্শী যোগীদিগের সেই রাত্রি।

অর্থাৎ সাধারণের যাহা নিশা অর্থাৎ যে প্রকৃত সূক্ষ্ম ব্যাপার সকল সাধারণে বুঝিতে পারে না—সেই আত্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব সকল সংযমী মুনিগণ দিবাভাগের ন্যায় সম্পষ্ট বুঝিতে পারেন। এবং সাধারণের যাহা দিবা অর্থাৎ যে বৈষয়িক সুখ সকল বহিশ্চক্ষুদ্বারা দেখিয়া সাধারণে আকৃষ্ট হয়, মুনিগণের পক্ষে তাহা নিশা অর্থাৎ তাঁহারা তাহা দেখেন না। তাঁহাদের প্রজ্ঞাচক্ষুই চক্ষু। তাঁহারা বিষয় ও বিষয় সুখ সকল দেখিতে পান না, অর্থাৎ ঐ সকল যে প্রকৃত সুখের ব্যাপার নহে তাহা বুঝিয়া

যে প্রকৃত তত্ত্ব সাধারণের দৃষ্টি বহির্ভূত তাহা দর্শন করিয়া সেই প্রকৃত সুখের সুখী হয়েন। বিষয় কামনা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না।

এক্ষণে একটী কথা হইতেছে। একবার বলা হইল, যে, মুনিগণ রাগ দ্বেষাদির বশীভূত না হইয়া বিষয় ভোগ করেন। আবার বলা হইল যে, তাঁহারা বিষয় সকল দর্শনই করেন না। কিন্তু যখন বিষয় আদৌ দর্শন হইল না তখন কি প্রকারে তাহার ভোগ হইতে পারে? অতএব এই দুই কথা পরস্পর নিতান্ত অসঙ্গত। তাই বলিতেছেন;—

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎকামায়ং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।৭০।

যেমন নদীসকল সর্ব্বদা পরিপূর্ণস্থিরপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রে প্রবেশ করে,ভোগসকল সেইরূপে যাঁহারে আশ্রয় করে, তিনিই মোক্ষ লাভ করেন; ভোগার্থী ব্যক্তি তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে না।

অর্থাৎ পরিপূর্ণ স্থির সমুদ্র যেমন জলান্তরের আগমন প্রার্থনা না করিলেও চতুর্দ্দিক হইতে জল তাহাতে আইসে এবং সমুদ্রও সেই সকল জলের স্থান প্রদান করে, সেইরূপ বিষয় সকল স্বভাবতঃ তাঁহাদিগকে আশ্রয় করে; তাঁহারাও তাহা গ্রহণ করেন; কিন্তু তাহাতে কামনা বিশিষ্ট হয়েন না। কর্ত্তব্য অনুরোধে প্রাপ্ত বিষয়ের নিষ্কাম উপভোগ করেন মাত্র।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি। ৭২।

হে পার্থ! ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা এই প্রকার; ইহা প্রাপ্ত হইলে সংসারে আর মুগ্ধ হইতে হয় না। যিনি চরম সময়েও এই ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠায় অবস্থান করেন, তিনিও পর ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন।

অর্থাৎ ইহারই নাম ব্রহ্মনিষ্ঠা বা কর্ত্তব্য। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কারণ যে জন্য আমাদিগের সৃষ্টি বা ভিন্নাবয়বে পরিণত করিয়াছেন, এইরূপে কার্য্য করিলেই তাহা সম্পন্ন হইবে। তাহারই নাম মুক্তি, সুখ ও উদ্দেশ্যের সফলতা।

ক্রমশঃ

বেদরহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

২য়—কল্প।

আশ্বলায়ন, আপস্তম্ব, বোধায়ন প্রভৃতি বৈদিক কালের ঋষিগণ বেদোক্ত কার্য্য সুচারুরূপে অনুষ্ঠান করিবার জন্য যে সকল সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার নাম কল্প। ক্লৃপ্ ধাতু হইতে কল্প শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। যে গ্রন্থে যাগ যজ্ঞাদির প্রয়োগ বা অনুষ্ঠান প্রণালী কল্পিত অথবা সমর্থিত হইয়াছে, তাহার নাম কল্প। বেদোক্ত যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে হইলে কল্প সূত্রের প্রয়োজন হইয়া থাকে। সুতরাং শিক্ষার ন্যায় কল্পগ্রন্থ ও বৈদিক কর্ম্মে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া জানিতে হইবে।

৩য়—ব্যাকরণ।

প্রকৃতি ও প্রত্যয়াদির উপদেশ দ্বারা পদ, পদস্বরূপ, পদার্থ নিশ্চয়ের জন্য ব্যাকরণের আবশ্যকতা। নতুবা বেদে বা বেদমন্ত্রে যে সকল পদ পদার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের কিছুতেই অর্থ বোধ হইতে পারে না। ঐন্দ্রবায়বগ্রহ ব্রাহ্মণে এইরূপ পঠিত হইয়াছে। যথা—

"বাগ বৈ পরাচী অব্যাকৃতা বদত্তে দেবা ইন্দ্র মব্রুবন্নিমাং নো বাচং ব্যা কুর্ব্বিতি। সোহব্রবীদ্ বরং বৃণৈ মহ্যং চৈবৈষ বায়বেচ সহ গৃহ্যতা"

এই বেদমন্ত্রে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ব্যাকরণ জ্ঞান না হইলে "ঐন্দ্র বায়বার্থ" পদটী কিরূপে হইয়াছে, তাহা জানা যায় না। উক্ত বেদমন্ত্রের অর্থ যথাঃ—ইন্দ্র মধ্য হইতে বাণীকে (বাক্যকে) আক্রমণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া-

ছিলেন। অতএব এই বাণীকে ব্যাকৃত(ব্যাখ্যাত) বাক্য কহে। বস্তুগত্যা "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্" ইত্যাদি সমুদয় বেদভারতী পুরাকালে সমুদ্রাদির ধ্বনির ন্যায় একাত্মিকা অর্থাৎ একই প্রকার ছিল। এইটী পরাটী শব্দের অর্থ। অব্যাকৃত শব্দের অর্থ প্রকৃতি,প্রত্যয়,পদ বাক্য ইত্যাদি বিভাগ কারী গ্রন্থ রহিত। বস্তুতঃ পূর্ব্বে বেদ বাক্যের কোন বিভাগ ছিল না। তৎকালে দেবগণ ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করেন। ইন্দ্র এক পাত্রে আপনার বায়ুর সোমলতার রস গ্রহণরূপ বরে সন্তুষ্ট হয়। এক পাত্রে আপনার ও বায়ুর সোম রস গ্রহণ রূপ বরে তুষ্ট হইয়া সেই অখণ্ডা ভারতীকে মধ্যে ছেদ করিয়া সকল স্থানে প্রকৃতি ও প্রত্যয়াদি দ্বারা বিভাগ করেন। অতত্রব এই বাণী সম্প্রতি পানিনি প্রভৃতি মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক ব্যাকৃত বা ব্যাখ্যাত হওয়াতে সর্ব্বসাধারণে পাঠ করিয়া থাকে। অব্যাকৃত(অবিভক্ত) বাক্যের ব্যাকার বা বিভাগের নাম ব্যাকরণ। বররুচি, এরূপ ব্যাকরণের কি কি প্রয়োজন, তাহা বার্ত্তিক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন। রক্ষা, উহ, আগম, লঘু ও অসন্দেহ, এই কয়টী ব্যাকরণের প্রয়োজন। মহর্ষি পাতঞ্জলি, এই কয়টী প্রয়োজন ও অন্যান্য প্রয়োজন সকল পানিনিয় ব্যাকরণের মহাভাষ্যে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। বেদের রক্ষার জন্য কোন বর্ণের লোপ, কোন বর্ণের আগম, কোন বর্ণের বিকার, সন্ধি প্রভৃতি দ্বারা পদ সকলের লঘূকরণ, এবং সমুদয় সন্দেহ নিরসনের জন্য ব্যাকরণ পাঠ সর্ব্বথা উচিত। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি লোপ, আগম, বর্ণবিকার অব্যাত আছেন, তিনি সম্যকরূপে বেদ সকল পরিপালন করিতে সমর্থ হইবেন, এবং বেদের অর্থ নিশ্চয় করিতে পারিবেন। এই সমস্ত কারণে ব্যাকরণ পাঠ সর্ব্বথা আবশ্যক। নচেৎ বেদের পদ পদার্থের বোধ হইতে পারে না। পদ পদার্থের বোধ না হইলে বেদপাঠ নিস্ফল মাত্র।

৪র্থ—নিরুক্ত।

নির পূর্ব্বক বচ ধাতু ক্ত প্রত্যয় করিয়া নিরুক্ত পদ সিদ্ধ হইয়াছে নির শব্দের অর্থ নিরপেক্ষ। অর্থাৎ বেদের অর্থ বোধ বিষয়ে নিরপেক্ষা

ভাবে যে গ্রন্থে পদ সকল উক্ত হইয়াছে, তাহার নাম নিরুক্ত। গো, গ্মা, জমা, ক্ষ্মা, ক্ষা, ক্ষমা ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া বসু, বাজি, দেব পত্নী এই সমস্ত পদ পাঠ তাহাতে কথিত হইয়াছে। নিরুক্ত গ্রন্থে বৈদিক পদের বোধের নিমিত্ত অন্য গ্রন্থের অপেক্ষা হয় না। অর্থাৎ বেদে যতগুলি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা মধ্যে কতকগুলিন শব্দ প্রকৃতি প্রত্যয় নিষ্পন্ন। অবশিষ্ট পদ গুলির অর্থ কি? তাহার জন্য অমরকোষ, হেমচন্দ্র প্রভৃতি লৌকিক আভিধানিকদিগের সাহায্যে বেদের পদবোধ হয় না। এতগুলি পৃথিবীর নাম এতগুলি হিরণ্যের নাম নিরুক্ত গ্রন্থে এইরূপে শব্দ সকল স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে।

"আদ্যং নৈঘণ্টুকং কাণ্ডং দ্বিতীয়ং নৈগমংতথা।
তৃতীয়াং দৈবতং চেতি সমাম্নায় স্ত্রিধা মতঃ॥"

নিরুক্তের মধ্যে তিনটী কাণ্ড আছে। প্রথম নৈঘণ্টুক, দ্বিতীয় নৈগম, এবং তৃতীয় দৈবত কাণ্ড। যেস্থানে একার্থ বাচক পর্য্যায় শব্দ সমূহ প্রায়ই উপদিষ্ট হইয়া থাকে, তথায় নিঘণ্টু শব্দ বিখ্যাত। তাহাদের মধ্যে অমর সিংহ, বৈজয়ন্তী, হলায়ুধ ইত্যাদি দশখানি নিঘণ্টু, ব্যবহার আছে। এখানে প্রথম কাণ্ডে পর্য্যায় শব্দ সমূহ উপদিষ্ট হওয়াতে ইহার নাম নিঘণ্টু। প্রথম কাণ্ডে তিনটী অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে পৃথিবী স্বর্গ প্রভৃতি লোক ও দিক্, কাল ইত্যাদি দ্রব্যের নাম আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মনুষ্য মনুষ্যের ও অবয়ব ইত্যাদি দ্রব্যের নাম। তৃতীয় অধ্যায়ে উভয় দ্রব্যাস্থিত শরীরের বহুত্ব, হ্রস্বত্ব ইত্যাদির নাম আছে। নিগম শব্দের অর্থ বেদ। দ্বিতীয় কাণ্ডে (নৈগম কাণ্ডে) চতুর্থ অধ্যায়ে বেদের প্রকৃত বিষয় বর্ণিত হওয়াতে দ্বিতীয় কাণ্ডকে নৈগমকাণ্ড বলে। তৃতীয় কাণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে দৈবত্ব স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। মহর্ষি যাস্ক দ্বাদশ অধ্যায়ে নিরুক্ত গ্রন্থ নির্ম্মাণ করেন। এক একটী পদের যথা সম্ভব অবয়বার্থ সকল নিঃশেষে উক্ত হইয়াছে বলিয়া, এই বুৎপত্তি দ্বারাও নিরুক্ত শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, যে,বেদের অর্থ বোধের জন্য নিরুক্ত গ্রন্থের আবশ্য-

কতা হইতে পারে কি না। নিরুক্ত গ্রন্থকে উপেক্ষা করিলে বেদের অনেক শব্দের অর্থ বোধ হইতেই পারে না। সুতরাং বেদের অর্থ বোধের নিমিত্ত অবশ্য নিরুক্ত গ্রন্থ প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ।

শরীরের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ইহাদ্বারা স্পষ্টই জানা গেল যে, অন্ন, পান ও তেজ দ্বারা আমাদের শরীর জীবিত থাকে। ইহার কোন অংশ পরিত্যাগ করিলে, অর্থাৎ কেবল অন্ন খাইলে, কি কেবল জল পান করিলে শরীর থাকে না। কারণ, যাহাদ্বারা মল,মূত্র, রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, মন, প্রাণ ও বাক্য শক্তি পরিস্ফুট থাকিবে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে কদাচ শরীর রক্ষা হয় না। আমরা যে কেবল ক্ষুধানিবারণের জন্য অন্ন, ও তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জল পান করিয়া থাকি তাহা নহে, কিন্তু শরীরের বলবীর্য্য সাধন ও মনপ্রাণ রক্ষা করিবার জন্য অন্নপানের প্রয়োজন হইয়া থাকে। মন প্রাণ যদি শরীরে না থাকে তবে শরীর ধারণের ফল কি ?। মন প্রাণ ও বাক্য এই তিনটিই শরীরের মূলাধার। যদি অন্ন পানে বঞ্চিত হওয়া যায়, তবে শরীরের মূলচ্ছেদ করা হয়। মন প্রাণ থাকাতেই শরীরের জগৎ সংসারের সমুদয় বস্তুর সহিত সম্বন্ধ থাকা বলা হইল। বেদান্ত মতে "সঙ্কল্প বিকল্পান্তঃকরণ বৃত্তি র্মনঃ"

নানাপ্রকার কল্পনা, কিম্বা হাঁ কি না, এইরূপ অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম মন উক্ত হইয়াছে। ভাল মন্দ সমুদয় কার্য্য মনের অধীন। ঐ মন প্রাণ আবার আত্মার আশ্রিত, আত্মার সাহায্য করিবার জন্য মনস্তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। মন সদসৎ কার্য্যের চিন্তা করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু সৎকার্য্যের পরিণামে যে আনন্দ জন্মে, কি অশুভকার্য্যের শেষে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় সেই হর্ষ ও দুঃখের সহিত মনের কোন সম্বন্ধ নাই। কেবল আত্মাই সুখদুঃখের অনুভবকর্ত্তা। আত্মা নির্লেপ হইলেও—কাহারও সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও জীবভাবে বা জীবাত্ম রূপে দেহ সম্বন্ধ হওয়াতে জীবাত্মারই কেবল সুখদুঃখের সম্বন্ধ হয়। পরমাত্মার সহিত সুখদুঃখের একেবারে সংস্রব নাই। যখন অহরহঃ সুখদুঃখের পরিণাম দেখিয়া আত্মসুখই পরমসুখ আত্মদুঃখ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য বলিয়া আপামর সর্ব্বসাধারণের একরূপ অনুভূত ও প্রত্যক্ষবৎ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, তখন আত্মাশ্রিত শরীর ধারণ করিয়া, সতত যাহা করিলে পুনরায় না দুঃখে পতিত হইতে হয়, অথবা নিরবচ্ছিন্ন আত্ম-সুখ লাভ করিয়া ক্ষণভঙ্গুর শরীরের কল্পান্তস্থায়ী কীর্ত্তিকলাপ অথবা গুণগরিমা উপার্জ্জন করিতে পারা যায় সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সেই জন্যই আর্য্য ঋষিগণ দান, ধ্যান, পুণ্য, অহিংসা, বেদাদিশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও তদনুসারে কার্য্য করা, পরের উপকার, সত্য বাদ প্রভৃতি কার্য্য সমুদয়কে ধর্ম্মের সিংহাসনে বসাইয়াছেন, এবং প্রকারান্তরে উহাদিগকেই ধর্ম্ম সংজ্ঞাদ্বারা আহ্বান করিয়াছেন। যেমন স্বয়ং ক্ষুধার্ত্ত হইলে আহারান্তে তৃপ্তিসুখ অনুভব করা যায়, তদ্রূপ মধ্যাহ্নে ক্ষুধিতব্যক্তিকে অন্ন দান করিলে ঐ ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিও সেইরূপ পরিতৃপ্তি লাভ করিবে। সুতরাং দীন, অনাথ ও অভ্যাগত ব্যক্তিকে অন্নদান করিলে যে ধর্ম্ম হয়, ইহা স্বীকার করিতে বোধ-হয় আর কাহারও আপত্তি হইবে না। এখন স্পষ্টই জানা গেল যে, শরীর-ধারী পুরুষ ভিন্ন কখনই আর কোন বস্তু দ্বারা ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধারোগ প্রশমিত হইতে পারেনা। যেশরীর মৃত, যে শরীরে আত্মা নাই, তাহার কাছে কেহ কখন কোন পদার্থ ভিক্ষা করে না। তবে শরীর ধারণ করিয়া অবস্থানুসারে সাধ্যানুসারে, কিঞ্চিৎ দান করা যে শরীরধারী পুরুষের কর্ত্তব্য, তাহা

এখন আর কি করিয়া বলিব? বলিলেই বা আমার কথা লোকে শুনিবে কেন? শরীর ধারণ করিলে দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং শরীরধারী পুরুষ দান করিতে অবশ্যই বাধ্য। কারণ, আমি যদি বিদেশস্থ হইয়া, কি কোন বিপদে পড়িয়া ক্ষুধার সময় কোন গৃহস্থের গৃহে উপস্থিত হই, এবং ঐ গৃহস্থ যদি আমাকে অন্নপানে বঞ্চিত করেন, তবে তখন তাহাকে কি করিতে ইচ্ছা হয়? তাহাকে বধ করিলেও ক্রোধের উপশম হয় না, তাহাকে অভিসম্পাত করিয়া থাকি, উচ্চৈঃস্বরে চক্ষের জল ফেলিয়া জগদীশ্বরের কাছে ঐ পাপিষ্ঠ গৃহস্থের সাধ্যানুসারে অন্নদান না করা বা প্রবঞ্চনা অপরাধের জন্য এক অভিযোগ করিয়া থাকি। যদি আমি এইরূপ করিলাম তবে তোমার পক্ষে তাহা খাটিবে না কেন? নিয়ম চিরকাল এক, অর্থাৎ আমি অপরের গৃহে গিয়া যেমন আহার করিব, সেইরূপ তুমিও যদি কোন গৃহস্থের গৃহে উপস্থিত হও, তুমিও সেইরূপ আহার পাইবে। আমি খাইয়া বেড়াইব, কিন্তু অপরকে কখন খাওয়াইব না, এরূপ নিয়ম নিয়মই নহে।

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥,,

(হিতোপদেশ)

কিছু না থাকিলেও আসনের জন্য তৃণ, বসিবার স্থানের জন্য একটু ভূমি, পদপ্রক্ষালনের জন্য একটু জল এবং প্রিয় ও সুমিষ্ট বাক্য ইহা দ্বারাও অতিথি সেবা করিবে'। বোধ হয় এ কয়েটি পদার্থের অভাব কোন গৃহস্থের হইতে পারেনা। যদি তৃণ, ভূমি, জল ও সত্য বাক্যের অভাব থাকে, তবে সে গৃহস্থের মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

যখন এমন উৎকৃষ্ট মানবজন্ম আর হইবে না, তখন ক্ষণভঙ্গুর দেহ ধারণ করিয়া, অমূল্য জ্ঞান রত্ন পাইয়া, তাহার অপব্যয় করা সতত অকর্ত্তব্য। এই জন্য আর্য্য ঋষিগণ প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগকার্য্য দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাসকে অধীনে রাখিয়া অনন্তকাল জীবনরক্ষা করিবার, বা জীবন থাকিবার জন্য অসীম ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন। শেষে যোগের অবসানে অবশ্যই একদিন স্থূল

শরীর পরিত্যাগ করিতে হইবে সত্য, কিন্তু তাহাতে কোন কষ্ট বা দুঃখের ভাগ দেখা যায় না। ইচ্ছামাত্র দেহত্যাগ করিয়া চর্ম্মচক্ষের অগোচর একরূপ আতিবাহিক দেহ ধারণ করা যাইতে পারে। তৎকালে সেই যোগী ঈশ্বর সাযুজ্য পাইবার উপযুক্ত। স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে লিঙ্গশরীরে গমন করিতে পারিলেই যোগসিদ্ধ হইয়া থাকে। আর্য্যঋষিগণ স্থূল দেহধারীদিগকে ইহকালে দান, ধ্যান, অর্চনা, পুণ্য প্রভৃতি সৎকার্য্য করিতে উপদেশ দিয়া, অবিনশ্বর আত্মায় পারত্রিক ব্যাপারের বিষয় প্রকাশ করিয়া কতই মঙ্গল করিয়াছেন। পারত্রিকের বিষয় বলিবার কথা অনেক আছে, কিন্তু সে এপ্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে বলিয়া আর অধিক বলা যাইবে না।

"বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্ম্মস্তন্নিবোধত॥" মনু। ২।১।

মনু, ধর্ম্মের এই সাধারণ লক্ষণ করিয়াছেন। বেদবিৎ ধার্ম্মিকেরা রাগদ্বেষ-শূন্য হইয়া মনোদ্বারা যাহা প্রত্যক্ষবৎ জানিয়া থাকেন, তাহারই নাম ধর্ম্ম। হে ঋষিগণ! তোমরা আমরা নিকটে তাহা শ্রবণ কর।

ক্রমশঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ।

হিন্দুধর্ম্ম ও নাস্তিকতা।
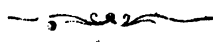
(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সংক্ষেপে বলিতে হইলে নাস্তিক ও বিধর্ম্মীগণ অদ্বৈতবাদী হিন্দুর প্রতি নিম্ন লিখিত কয়েকটী দোষারোপ করেন। ১ম—তাঁহারা আপনাদিগকে ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র মনে করেন না; ২য়—তাঁহার ইচ্ছা ও শক্তি সম্পূর্ণ ঈশ্বরীয়ত্ব,

সুতরাং আপনাদের কার্য্যের দোষ গুণেরভাগী তাঁহারা আপনারা নহেন। ৩য়—ভালমন্দ সকলই ঈশ্বরের সৃষ্ট ও সেই জন্য যে যাহা করে অর্থাৎ আপন পিত্রবলম্বিত কার্য্য যতই মন্দ হউক না কেন তাহাই তাহার কর্ত্তব্য। প্রকৃত কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য জগতে নাই। ৪র্থ—এই সকল হেতুতে হিন্দু ঈশ্বরকে ভয় করেন না।

এই গুলি বাস্তবিক হিন্দুর দোষ কি গুণ তাহা যাঁহারা বুঝেন না, তাঁহারা হিন্দুকে নাস্তিকের সহিত তুলনা করেন। যাঁহারা অপার মহিম পরমেশ্বরের মাহাত্ম্য বুঝেন না তাঁহারাই হিন্দুদিগকে নাস্তিক বলেন— যাঁহারা যুক্তির প্রকৃত মার্গে গমন করেন নাই তাঁহারাই হিন্দুর আশ্চর্য্য গবেষণার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা এক বিষয়ে নাস্তিকের সহিত হিন্দুর ঐক্য দেখিয়া হিন্দুকে নাস্তিকের সহিত তুলিত করেন। তাঁহারা নাস্তিকের 'প্রকৃতি' ও হিন্দুর 'ঈশ্বরকে' ভিন্ন শব্দে ব্যবহৃত একই পদার্থ মনে করেন। তাঁহারা বলেন প্রকৃত হিন্দু যেমন অদ্বৈতবাদী অর্থাৎ হিন্দু যেমন বলেন ঈশ্বর ভিন্ন কিছুই নাই নাস্তিকও সেইরূপ বলেন প্রকৃতি ভিন্ন কিছুই নাই। কিন্তু তাঁহারা বুঝেন না যে হিন্দুর অদ্বৈতবাদ ও নাস্তিকের অদ্বৈতবাদ কত ভিন্ন। আমি তুমি যত ভিন্ন তত ভিন্ন। নাস্তিক বলেন ঈশ্বর নাই আমরা আছি, হিন্দু বলেন আমরা নাই ঈশ্বর আছেন। এ দুয়ের কত প্রভেদ তাহা কি পাঠক বুঝিতে পারিয়াছ? আলোক ও অন্ধকারে যে প্রভেদ, তাপে ও হিমে যে প্রভেদ, শুক্ল ও কৃষ্ণে যে প্রভেদ, হাঁ ও নাএ যে প্রভেদ সেই প্রভেদ। নাস্তিক কহেন অন্ধকার হইতে আলোকের উৎপত্তি, হিম হইতে তাপের উৎপত্তি, কৃষ্ণ হইতে শ্বেতের উৎপত্তি, না হইতে হাঁর উৎপত্তি, ইচ্ছা, জ্ঞান বুদ্ধি রহিত প্রকৃতি হইতে ইচ্ছা-বুদ্ধি-জ্ঞান-সম্পন্ন জীবের উৎপত্তি। হিন্দু কহেন অন্ধকার, হিম, কৃষ্ণ, না ও জীব কিছুই নহে আলোকের অল্পতা বা অভাব অন্ধকার, তাপের অল্পতা বা অভাব হিম, বর্ণের অল্পতা বা অভাব কৃষ্ণ, হাঁর অল্পতা বা অভাব না, ঈশ্বরের অল্পতা বা অভাব জীব বা বিশ্ব। যত ঐশীভাবের আধিক্য তত উৎকৃষ্ট জীব, যত ঐশী-

ভাবের অল্পতা তত অপকৃষ্ট পদার্থ, ঐশীভাবের সম্পূর্ণ অভাব কিছুই না। এই গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়াই নিতান্ত যুক্তিহীন নাস্তিকতার সহিত সম্পূর্ণ যুক্তিমূলক হিন্দুধর্ম্মের তুলনা হইয়াছে।

হিন্দু ঈশ্বরকে ভয় করেন না সা[illegible] কিন্তু ঈশ্বর ত ভয়ানক পদার্থ নহেন। খৃষ্টান, মুসলমান, ব্রাহ্ম ঈশ্বরকে ভয় করিয়া কার্য্য করেন, কিন্তু হিন্দু তাহা করেন না। কারণ ঈশ্বর ভয়ের সামগ্রী নহেন, তিনি প্রীতি ও ভক্তির পাত্র। হিন্দু ঈশ্বরের সালোক্য সারূপ্য, সাযুজ্য চায়—ঈশ্বরের সহিত মিশিতে চায়, ঈশ্বরকৃত দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চায় না। হিন্দু স্বর্গ মানে না, নরক মানে না—আপনার কোন কামনা স্বীকার করে না—আপনার অস্তিত্বই স্বীকার করে না। নিষ্কামতাই তাহার ধর্ম্ম। উন্নত হইবে—অন্ধকার আলোকে পরিণত হইবে, হিম তাপে পরিণত হইবে—জৈব আত্মা ঈশ্বরে মিলিত হইবে ইহাই তাহার বাসনা—আপনার জৈব বাসনাকে তাহারা ভ্রান্তি মনে করে। এই জন্য হিন্দু ঈশ্বরকে ভয় করে না। ঈশ্বরকে ভয় করে না বলিয়া হিন্দু যথেচ্ছাচারী নহে। আপন চেষ্টায় কার্য্য হয় না ঈশ্বরই সমস্ত করান সুতরাং মানব যাহা করে তাহার জন্য মানব দায়ী নহে, দণ্ডিতও হইতে পারে না ইহা বলিয়া হিন্দু দুষ্কর্ম্মান্বিত নহে—প্রকৃত সৎকার্য্যান্বিত। নাস্তিক যেমন মনে করেন আপন সুখের জন্য পরের সুখের হানি করিব হিন্দু তাহা করেন না। হিন্দু বলেন ঈশ্বরাভিপ্রায় না থাকিলে আমি সহস্র চেষ্টা করিলেও সুখ পাইব না। তবে কেন আমি পরের সুখ নাশের চেষ্টা করিব? যখন আপন চেষ্টা মাত্রে সুখ হয় না ও জীবের সুখ সুখই নহে তখন যাহাতে অন্যের সুখের হানি বোধ হয় তাহা আমি করিব কেন? এই মহৎ ভাব কি নাস্তিকের জঘন্য ভাবের সহিত তুলিত হইতে পারে? বিশেষতঃ ভয় করিয়া কার্য্য করা প্রকৃত মানবের পক্ষে শোভা পায় না। ইতর প্রাণীর শোভা পায়। যে পুত্র পিতা মারিবেন বা খাইতে দিবেন না বলিয়া পিতার নির্দেশবর্ত্তী হয়, তাহার পিত্রনুবর্ত্তনের প্রশংসা নাই; যে পুত্র পিতাকে হিতকারী ভাবিয়া অথবা পিতামাতা লালন পালন জন্য অনেক

কষ্ট করিয়াছেন ভাবিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্য পিত্রানুবর্ত্তী হয় সে পুত্রেরও তত প্রশংসা নাই। কিন্তু যে পুত্র পিতা মাতাই সর্ব্বস্ব ও তাঁহাদের নিদেশ পালন করাই এক মাত্র কর্ত্তব্য জ্ঞানে কিনা বিচারে বিনা স্বার্থ কামানায় পিতা মাতার নিদেশবর্ত্তী হয়েন সেই পুত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রকৃত মানব পদবাচ্য। সেইরূপ খৃষ্টান প্রভৃতি যাঁহারা দণ্ড ভয়ে বা পরিত্রাণ পাইবেন না এই আশঙ্কায় ঈশ্বরপরায়ণ হয়েন তাঁহারা নিকৃষ্ট ধার্ম্মিক ব্রাহ্ম প্রভৃতি যাঁহারা ঈশ্বর আমাদের সুখের জন্য নানা উপায় করিয়াছেন ভাবিয়া তাঁহারা প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য ঈশ্বরপরায়ণ হয়েন তাঁহার মধ্যবিধ ধার্ম্মিক, এবং যে হিন্দু ঈশ্বরই সর্ব্বস্ব ও ঈশ্বর কার্য্যই একমাত্র কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে ঈশ্বর পরায়ণ হয়েন। তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক ও প্রকৃত মানব পদবাচ্য। সুতরাং ঈশ্বরকে ভয় না করা হিন্দুর কলঙ্ক নহে, উহা হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্বেরই একটী কারণ।

হিন্দু আপনাকে ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র মনে করেন না সত্য কিন্তু তিনি তাহাতে গর্ব্বিত নহেন। আপনাকে ঈশ্বরের তুল্য ক্ষমতাবান বলিয়া মনে করিয়া তিনি অন্য ব্যক্তি বা জীবকে তুচ্ছজ্ঞান করেন না, প্রত্যুতঃ তিনি আপনাকে অকিঞ্চিৎকর ভাবেন—অতি নিকৃষ্ট জীবকেও আপনার সহিত তুলিত বিবেচনা করেন, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে আপনাতে কিছুই থাকে না বলেন, ও সেই জন্য ঈশ্বরকার্য্যকেই আপনার একমাত্র কার্য্য বিবেচনা করিয়া তথাবিধরূপে আপনার সত্ত্ব প্রয়োজন ও পরিচয় প্রদান করেন। ঈশ্বর ও আমি এক ইহা ভাবিয়া হিন্দু কখনও যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়েন না। এরূপ ভাবার মূল উদ্দেশ্য এই যে আমরা বুঝিব ঈশ্বরে কার্য্য করিলেই আমাদের কার্য্য করা হইল, তদ্ভিন্ন আমাদের আর স্বতন্ত্র কার্য্য নাই। সুতরাং ঈশ্বর হইতে আপনাকে ভিন্নজ্ঞান করা হিন্দুর দোষ নহে—উহা মহৎগুণেরই কারণ।

হিন্দু বলেন বটে যে কি উৎকৃষ্ট কি নিকৃষ্ট সকল পদার্থই ঈশ্বরের সৃষ্ট সুতরাং কোন পদার্থই একেকালে নিকৃষ্ট বা কোন পদার্থ এক কালে

উৎকৃষ্ট নহে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহারা এমন কথা বলেন না, যে, ভাল মন্দ দ্রব্য সর্ব্বত্রই সমান, সৎকর্ম্ম অসৎকর্ম্ম সর্ব্বত্রই সমান। তাঁহারা যাহা বলেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে, তোমার অবস্থা ভাল নয় ভাবিয়া কি তুমি উৎকৃষ্ট দেহ, উৎকৃষ্ট বুদ্ধি ও উৎকৃষ্ট অর্থ প্রভৃতি প্রাপ্ত হও নাই বলিয়া দুঃখ করিও না। যাহা পাইয়াছ তাহাকে ঈশ্বরদত্ত শ্রেষ্ঠ পদার্থ মনে করিয়া ঈশ্বরকার্য্য কর। কেন না কোন পদার্থ ঈশ্বরের অনভিমত বা বিদ্বিষ্ট নহে। যাহাকে যাহা দিতে ভাল হইবে, তিনি বিবেচনা করেন তাহাকে তিনি তাহাই দিয়াছেন। সুতরাং তুমি বড় লোকের পুত্র না হইয়া দরিদ্রের পুত্র হইয়াছ ভাবিয়া দুঃখ করিও না। দরিদ্রও ঈশ্বরের সৃষ্ট। অক্ষম, নিম্ন শ্রেণীরও দুঃখী লোকদিগের ইহা অল্প সান্ত্বনার কথা নহে।

সকলে বলিতে পারেন যে যাহা যাহা বলা হইল তৎসমস্ত মৌখিক বাক্য মাত্র ও সকলই অসম্ভব। কেননা যে ব্যক্তি জানিল যে ঈশ্বর ও আমি অভিন্ন সে আপন সুখের চেষ্টা করিবেনা কেন? সে কেন ভাবিবে না যে তাহার যাহাতে সুখ হইবে তাহাতেই ঈশ্বরের সুখ বা ইচ্ছাসাধন হইবে? যে, জানিল যে আমার ইচ্ছা ও চেষ্টা সকলই ঈশ্বর দ্বারা নিয়মিত সে কেন কর্ত্তব্য কার্য্য করিবার জন্য চেষ্টা করিবে? সে ত অনায়াসেই ভাবিতে পারে যে তাহা দ্বারা যে কার্য্য হইবে তাহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা সুতরাং কর্ত্তব্য। যে জানিল ভাল মন্দ সকলই ঈশ্বরের সৃষ্ট ও ঈপ্সিত সে কেন ভাল হইবার জন্য চেষ্টা করিবে? সে ত অনায়াসে ভাবিতে পারে যে আমি কেন ভাল হইবার জন্য এত শ্রম ও চিন্তা করি, মন্দ যখন তাঁহার বিদ্বিষ্ট নয়, তখন আমি মন্দ হইলে ক্ষতি কি। সুতরাং অদ্বৈত বাদীর ঈশ্বরপরায়ণ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ। এরূপ ঈশ্বরও যুক্তির একান্ত বিরুদ্ধ। এরূপ ঈশ্বর বুদ্ধিতেই স্থান পায় না। যিনি স্রষ্টা তিনিই সৃষ্ট, যিনি শাস্তা তিনিই শস্ত, যিনি নিয়ন্তা তিনিই নিয়ম পালক, যিনি কার্য্য করাইতেছেন তিনিই কার্য্য করিতেছেন একথার অর্থ কি? বিশেষতঃ যিনি ভিন্ন আর কিছুরই সত্তা নাই তাঁহার আবার শ্রেষ্ঠত্ব কি? কাহার সহিত তুলনায় শ্রেষ্ঠ? কে তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিবে? তাঁহার প্রয়োজনই বা কি? এ সকল

কি মানব ধারণাও করিতে পারে? কখনই না। সুতরাং হিন্দুর অদ্বৈতবাদ নিতান্ত ভ্রান্তি সঙ্কুল।

আমরা স্বীকার করিলাম যে, অদ্বৈতবাদীগণের ঈশ্বরের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি যে দ্বৈতবাদীগণের ঈশ্বর কি সহজ বোধ্য? তাঁহারা কি একমাত্র ঈশ্বরের অবস্থান স্বীকার করেন না? তাঁহারা কি বলেন না যে সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বর একাকী ছিলেন? তখনকার ঈশ্বর কি শ্রেষ্ঠপদবাচ্য নহেন? তাহা যদি হয় তবে তখন কাহার সহিত তুলনায় তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ প্রভৃতি বল? হে দ্বৈতবাদিন্ তুমিত বলিতেছ পূর্ব্বে একমাত্র ঈশ্বর ছিলেন আর কিছুই ছিল না, পরে তাঁহার ইচ্ছা হইতে বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে। ঐ সৃষ্টি কালও অধিক নহে। খৃষ্টান বলিতেছেন ছয় হাজার বৎসর মাত্র সৃষ্টি হইয়াছে, অন্যান্য জাতিরা কেহ কিছু বেশি কেহ কিছু কম কাল পূর্ব্বে সৃষ্টি হইয়াছে বলেন যিনি যত অধিক পূর্ব্বেই সৃষ্টির কাল নির্দ্দেশ করুন অনাদি অনন্ত কাল বর্ত্তমান ঈশ্বরের কালের সহিত তুলনা করিলে তাহা কিছুই নহে। মহাসাগরের সহিত সামান্য জল কণার যে তুলনা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত বালুকা কণার যে তুলনা, অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের কালের সহিত সৃষ্টিকালের সে তুলনাও হয় না। সেই অনন্তকাল বর্ত্তমান ঈশ্বরের একমাত্রত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ভাব যদি আমরা ধারণা করিতে পারি তবে সৃষ্টিকালের পরে বর্ত্তমান সে ভাবটী আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না কেন? এ বিষয়ে দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর মতের প্রভেদ কি? বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে দ্বৈতবাদী বলিতেছেন ঈশ্বর কয়েক সহস্র বা লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে একাকী ছিলেন এক্ষণে আর তিনি একাকী নহেন। অদ্বৈতবাদী বলিতেছেন তিনি পূর্ব্বেও যেমন একাকী ছিলেন এখনও সেই রূপ একাকী আছেন কেননা ঈশ্বরের উন্নতি, অবনতি, হ্রাস বৃদ্ধি প্রভৃতি কোন প্রকার বিকার নাই। শেষোক্ত বাক্যটীও দ্বৈতবাদী স্বীকার করিয়া থাকেন, অথচ তিনি ঈশ্বরের একত্বনিবারণ রূপ উন্নতি হইয়াছে বলিতেছেন। অদ্বৈতবাদী সেই অসম্ভব ও অর্থশূন্য পূর্ব্বাপর বিরোধী বাক্যটী স্বীকার করিতেছেন না। সুতরাং অদ্বৈত বাদীর ঈশ্বর দ্বৈতবাদীর ঈশ্বর

অপেক্ষা অধিক কিম্ভুত কিমাকার হইতেছে না বরং অধিকতর স্পষ্টই হইতেছে।

দ্বৈত বাদীর সহিত অদ্বৈত বাদীর আর প্রভেদ এই যে, অদ্বৈতবাদী বলিতেছেন বিশ্ব ও ঈশ্বর স্বতন্ত্র নহে, বিশ্ব ঈশ্বরের অঙ্গ, দ্বৈত বাদী বলিতেছেন বিশ্ব ঈশ্বরের অঙ্গ নহে, উহা ঈশ্বরের নির্ম্মিত। কিরূপ নির্ম্মিত? উহার উপকরণ নির্ম্মিত—যে উপায়ে যে পদার্থ প্রস্তুত করিতে হয় সে উপায় নির্ম্মিত—সমস্ত প্রকরণই ঈশ্বরের নির্ম্মিত। ওরূপ নির্ম্মাণ ও নির্ম্মিত পদার্থ কি বাস্তবিক ঈশ্বর হইতে ভিন্ন? যদি তৎসমস্তকে ভিন্ন বলিতে হয় তবে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বলিতে হয়, স্বয়ং ঈশ্বরকেও ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বলিতে হয়। যখন তুমি জল ও তজ্জাত বরফকে ভিন্ন পদার্থ বল না তখন ঈশ্বর ও তজ্জাত সৃষ্টিকে ভিন্ন বল কি প্রকারে? যখন তুমি বলিতেছ সমস্ত পদার্থেরই এক মাত্র উপাদান ঈশ্বর তখন তুমি কি প্রকারে বিশ্ব ও ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বল? অদ্বৈতবাদী ঐ অসম্ভব ও অর্থশূন্য বাক্য না বলিয়া বিশ্বকে ঈশ্বরের অঙ্গ মাত্র বলিয়া পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিতেছেন।

অদ্বৈতবাদী যে বলিতেছেন যে, কি ভাল কি মন্দ সকলই ঈশ্বরের অভিপ্রেত দ্বৈতবাদী তাহারও প্রতিবাদ করিতেছেন, কিন্তু তিনিও যে বাস্তবিক উহাই বলিতেছেন তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। কেন না তিনি যখন বলিতেছেন, পূর্ব্বে কেবল মাত্র ঈশ্বর ছিলেন আর কিছুই ছিল না, পরে ঈশ্বর সমস্ত সৃষ্টি করিলেন, তখন কি ভাল কি মন্দ সমস্তই যে ঈশ্বরের সৃষ্ট সুতরাং অভিপ্রেত একথা পরিষ্কাররূপেই বলা হইল। কেননা মন্দ যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত না হইত তাহা হইলে তিনি কখনও তাহার সৃষ্টি করিতেন না। যদি বল মন্দ পদার্থাদি ঈশ্বরের সৃষ্ট নয়, কুলোকাদি কর্ত্তৃক উহা উদ্ভূত, তাহা হইলেও তাহা ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে। কেননা কুলোক কাহার সৃষ্ট এবং কুলোক যে মন্দ পদার্থের উদ্ভব করিতে পারে সে নিয়ম কাহার? যখন স্পষ্ট বলা হইল সমস্ত পদার্থ, সমস্ত শক্তি ঈশ্বরের সৃষ্ট তখন কি সাক্ষাৎভাবে কি পরোক্ষ ভাবে উৎপন্ন সমস্তকেই ঈশ্বরের সৃষ্ট বলিতে

হইবে। সুতরাং দ্বৈতবাদীদের মতেও সদসৎ সমস্ত পদার্থ ঈশ্বরের সৃষ্ট। তবে তাঁহারা সেটী স্পষ্ট স্বীকার করেন না—অদ্বৈত বাদীরা স্বীকার করেন এই প্রভেদ মাত্র।

সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, দ্বৈ... কয়েকটী ঈশ্বরের সম্বন্ধে গোলের কথা, তাহা অদ্বৈতবাদী যেরূপ বলিতেছেন দ্বৈতবাদীও সেইরূপ বলিতেছেন। মাঝে হইতে দ্বৈতবাদী গোঁজামিল করিয়া বুঝাইতে গিয়া একেবারে খিচুড়ি করিয়া ফেলিয়াছেন। দ্বৈতবাদীগণ ঈশ্বরের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে সামান্য সম্রাটের ন্যায়, সামান্য বিচারকের ন্যায়, সামান্য দাতার ন্যায়, সামান্য গৃহের কর্ত্তার ন্যায় করিয়া ফেলিয়াছেন। অধিক কি তাঁহারা তাঁহাকে ভয়ানক হইতেও ভয়ানক, অত্যাচারীর শিরোমণি, পক্ষপাতীর শ্রেষ্ঠ, নিষ্ঠুরের চূড়ামণি, স্বার্থপরের শেষ ও তোষামোদপ্রিয়ের দৃষ্টান্তস্থল করিয়া ফেলিয়াছেন। মানবতত্ত্বে সে বিষয়ের সুন্দর বিতর্ক করা হইয়াছে, এই জন্য এখানে তাহার আর পুনরবতারণা করিলাম না। তবে সংক্ষেপে কিছু না বলিলে উপস্থিত বিষয় বুঝাইবার একটু গোল পড়ে বলিয়া তাহার দুই একটী উদাহরণ দিতে বাধ্য হইলাম।

সামান্য সম্রাটের যেমন প্রজাগণের নিকট কর পাওয়া আবশ্যক, সেই জন্য যে কর না দেয় তাহাকে তিনি দণ্ড প্রদান করেন, ঈশ্বরও সেইরূপ যে সৎকার্য্য না করে তাহাকে দণ্ড দেন। যেন লোকের নিকট হইতে সৎকর্ম্ম না পাইলে তাঁহার চলে না। তিনি সামান্য বিচারকের ন্যায় মানবের সদসৎ কার্য্যের বিচার করেন ও যাহার যেমন কর্ম্ম তেমনি দণ্ড স্বরূপ নরকাদি ও পুরস্কার স্বরূপ স্বর্গাদির ব্যবস্থা করেন। অত্যাচারী রাজার মন না পাইয়া যেমন মানব নিয়ত তাঁহার ভয়ে শশব্যস্ত থাকে, ঈশ্বরের ভয়েও সেইরূপ বা ততোধিক শশব্যস্ত থাকে। কোন্ কার্য্য করিলে তিনি তুষ্ট বা রুষ্ট হইবেন তাহা মানব বুঝিতে পারে না অথচ না বুঝিলেও ঈশ্বরের ভয়ানক দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় নাই, কাযেই মানব ফাঁপর হইয়া কিসে তাঁহার নিষ্ঠুর দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবে তাহার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে। ইহার তুল্য বিভীষিকা, অত্যাচার

ও নিষ্ঠুরতা আর কি হইতে পারে? ঈশ্বর যখন সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্ব স্রষ্টা তখন তিনি দুঃখের সৃষ্টি না করিলেই পারিতেন; যদি করিলেন তবে যাহাতে সকলে দুঃখ না পায় তাহার উপায় অর্থাৎ মানব মাত্র যাহাতে বুঝিতে পারে, এই কার্য্য দুঃখজনক ঈশ্বরানভিপ্রেত তাহার উপায় করিতেন। তিনিএমন স্বাধীনতা মানবকে কেন দিলেন যে, যে স্বাধীনতার সুব্যবহার করিতে না পারিয়া মানব দুঃখ পায়? এ সকল যখন তিনি করেন নাই—যখন দুঃখ তাঁহারই সৃষ্ট অর্থাৎ যে কার্য্য করিলে যেরূপ দুঃখ হইবে তাহার নিয়ম তাঁহারই কৃত ও যখন সেই দুঃখ পরিহার করিতে পারিবার উপযুক্ত কোন সুদৃঢ় উপায় করেন নাই বলিয়া মানব দুঃখ পায় তখন তাঁহাকে নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী না বলিব কেন? আবার যে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাই সে ঈশ্বর নিয়ত মানবের নিকট আপনার প্রশংসা শুনিতে ভাল বাসেন বলিলে তাঁহাকে অতি জঘন্য স্বার্থপর ও তোষামোদ প্রিয় না বলিয়া কি বলিব? ইহাতে কি স্পষ্ট বোধ হয় না যে তিনি একাকী থাকিয়া বিরক্ত ও ক্লিষ্ট হইয়া আপনার তোষামোদ বাক্য শ্রবণসুখের জন্য ও বালক যেমন পাখীর ঠ্যাং ভাঙ্গিয়া দিয়া আমোদ বোধ করে সেইরূপ মানবকে যন্ত্রণা দিয়া আমোদ করিবার জন্য মানব সৃষ্টি করিয়াছেন? হে দ্বৈতবাদিন্! এ সকল কি যুক্তির কথা? না বুদ্ধিপ্রধান মানবের কথা! অদ্বৈতবাদী এ সকল অসম্ভব কথা বলেন না। দ্বৈত্যবাদী সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী ঈশ্বরের যে প্রকৃত ও সম্ভব ভাবের বিষয় বর্ণন করেন অদ্বৈতবাদী অধুনা বর্ত্তমান ঈশ্বরকেও সেইরূপে বর্ণনা করেন। তাহাতে দ্বৈতবাদীরই কথা সপ্রমাণ হইতেছে। কেননা তাঁহারা ঈশ্বরকে নির্ব্বিকার বলিতেছেন,কিন্তু সৃষ্টির পরে যদি ঈশ্বরের অন্য অবস্থা হয় তাহা হইলে তাঁহাদের সে কথা অর্থশূন্য হয়। ফলতঃ যদি যুক্তি অবলম্বনে ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার ও তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে হয়, তাহা হইলে অদ্বৈত্যবাদীর কথাকেই অধিক যুক্তিমূলক বলিতে হয়, দ্বৈতবাদীর কথায় যুক্তির লেশমাত্রও নাই।

হয় ত এই সকল কথা শুনিয়া নাস্তিক বলিবেন যখন কি দ্বৈতবাদী কি অদ্বৈতবাদী কেহই ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারিলেন না

ও ঈশ্বর আছেন স্বীকার করিতে হইলে উভয়কেই যখন কিছু না কিছু যুক্তি-বিরুদ্ধ পথে চলিতে হয়, তখন ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া এত গোল কেন? ঈশ্বর নাই বলিলে ত আর যুক্তিহীন কথা বলিতে হয় না। কিম্বা তাহাতে যদি কোন দোষ হয় তবে ঈশ্বর আছেন কি না জানি না বলিলেই সব দোষ কাটিয়া যায়। আমরা বলি এ কথা আরও যুক্তিবিরুদ্ধ। কেন না আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি আমরা স্বয়ং উৎপন্ন বা মৃত হই না, কোন শক্তির জন্ম দিতে বা নাশ করিতে পারি না এবং কোন ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হই না। সুতরাং কেবল আমাদের অস্তিত্ব আছে তদরিক্ত সর্ব্ব-শক্তিমান কিছু নাই বলার তুল্য যুক্তবিরুদ্ধ বাক্য আর কি আছে? দ্বৈতবাদীগণের মূর্খতা নাশের জন্যই এই নূতন মূর্খতার উৎপত্তি হইয়াছে। দ্বৈত্যবাদীগণের যুক্তিবিরুদ্ধ কথা খণ্ডন করিবার জন্যই নাস্তিকতারূপ আর এক প্রকার যুক্তিবিরুদ্ধ কথার উৎপত্তি হইয়াছে। অদ্বৈত-বাদ এই পরস্পর বিপরীত ও যুক্তিহীন কথার মীমাংসা। ঐ উভয় মতে যে যে দোষ সংঘটিত হইয়াছে অদ্বৈতবাদদ্বারা সেই সকল দোষ সংশোধিত হইয়াছে। কেন না অদ্বৈতবাদী ঈশ্বর আছেন স্বীকার করিতেছেন অথচ দ্বৈতবাদীর ন্যায় তাঁহাকে অসম্ভব গুণসম্পন্ন বলিতেছেন না।

দ্বৈতবাদী বলেন যে অদ্বৈতবাদে বিশ্বাস থাকিলে মানবের ঈশ্বরপরায়ণ হইতে প্রবৃত্তি হয় না। সেটীও তাঁহাদের ভুল। কেন না অদ্বৈতবাদী এটী বুঝিতে পারেন যে তাঁহারা ঈশ্বরের অঙ্গ বিশেষ মাত্র। সুতরাং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল আত্মা হইতে স্বতন্ত্র না হইয়াও যেমন স্বতন্ত্র তাঁহারাও সেইরূপ ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র না হইয়াও স্বতন্ত্র। যেমন কার্য্যবিশেষ সাধন জন্য মানবের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ আছে, আমরাও সেইরূপ ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ কার্য্যসাধক অঙ্গ মাত্র। হস্ত, পদ, উদর, রক্ত, মেদ, কাম, ক্রোধ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি অঙ্গ সকল প্রকাশতঃ আত্মা হইতে ভিন্ন হইলেও বস্তুতঃ যেরূপ ভিন্ন নয়, সেইরূপ প্রস্তর, মৃত্তিকা, তরু, লতা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মানব প্রভৃতি পূর্ণ ঈশ্বর হইতে প্রত্যক্ষতঃ ভিন্ন হইলেও বাস্তবিক ভিন্ন নহে। হস্তপদাদি অঙ্গ সকল যেমন আত্মাপরায়ণ হইয়া আপন আপন কর্ম্ম করিতে বাধ্য

আমরাও সেইরূপ ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে বাধ্য। সুতরাং ঈশ্বরে অভিন্নজ্ঞান ঈশ্বরপরায়ণ হইবার প্রতিবন্ধক নহে। প্রত্যুত উহা ঈশ্বরপরায়ণ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। বিশেষতঃ অদ্বৈত বাদী যখন আত্মার স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেননা তখন তাঁহাকে [illegible]মাত্র ঈশ্বরপরায়ণ হইতে হইবে। কেননা মানব যদি,আত্ম পরায়ণ (স্বার্থপর) না হইল তবে তাহার অবলম্বন কি থাকিল? বিনা অবলম্বনে মানব কখনও থাকিতে পারেনা। সুতরাং অদ্বৈতবাদীর কেবল মাত্র ঈশ্বরই অবলম্বন হইবে। দ্বৈতবাদীর আপন পর জ্ঞান আছে, অভিলাষ আছে, বিশেষ প্রকার রুচি অনুযায়ী সুখ দুঃখ জ্ঞান আছে, সে সকলের জন্য তাঁহাকে আত্মপর হইতেই হইবে।

সর্ব্বশেষে দ্বৈতবাদী বলিতে পারেন যে, ঈশ্বরকে ভিন্ন জ্ঞান না করিলে উপাসনা হয় না। আমরা বলি লোভ ও ভয়ের পরতন্ত্র হইয়া দ্বৈতবাদীগণ যেরূপ উপাসনা করেন, ভিক্ষুক যেমন ধনীর উপাসনা করে, দাস যেমন প্রভুর উপাসনা করে, প্রজা যেমন রাজার উপাসনা করে, সেরূপ উপাসনা অদ্বৈতবাদীগণ করিতে পারেন না বটে কিন্তু তাঁহারা যেরূপ নিষ্কাম উপাসনা করিতে পারেন তাঁহারা যেরূপ যোগে মত্ত হইতে পারেন সেরূপ কেহই পারে না। তাই শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অদ্বৈতবাদীগণ ঈশ্বরপ্রেমে মাতিয়া ঈশ্বর সেবাতেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। তাই রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি সাধকশিরোমণি নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

যদি কেহ বলেন যে রাম প্রসাদ সেন অদ্বৈতবাদী ছিলেন না,তিনি দ্বৈতবাদী ছিলেন—শাক্ত পৌত্তলিক ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রণীত কয়েকটী সংগীত আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ঐ সঙ্গীতগুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে রামপ্রসাদ আপনাকে ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র মনে করিতেন না, দুঃখ কি মৃত্যুকে ভয় করিতেন না, শুচি, অশুচি ও ধর্ম্মাধর্ম্মের ভেদ পর্য্যন্ত মানিতেন না এবং আপন শক্তিতে বা আপন ইচ্ছায় কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না,ঈশ্বর যাহাকে যেরূপ কার্য্য করান সে তাহাই করে এই বিশ্বাস তাঁহার মনে দৃঢ় বদ্ধ ছিল। পৌত্তলিকতা তাঁহার হৃদয়ে স্থানই পাইত না। এরূপ রামপ্রসাদ যদি পরমভক্ত হইতে পারেন তবে অদ্বৈতবাদী উপাসক

হইবেন না কেন? ফল কথা অদ্বৈতবাদীগণ জানেন ঈশ্বরের স্বরূপ, মহিমা ও উদ্দেশ্য মানবের জ্ঞানাতীত ও তিনি ভক্তি শ্রদ্ধার একমাত্র পাত্র। এই জন্য তাঁহারা ঈশ্বরপ্রেমে এত মাতোয়ারা হয়েন। যাঁহারা তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলেন তাঁহারা ঈশ্বরের মর্ম্ম ও যুক্তির ম[illegible]ই বুঝেন নাই। গীত, যথা—

আয় মন বেড়াতে যাবি।

কালী কল্পতরুমূলে গিয়া, চারি ফল কুড়ায়ে খাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
(ওরে) বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তত্ত্ব কথা তায় সুধাবি॥
অশুচি শুচিকে লয়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে প্রীতি হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা রে তোর, পিতা মাতায় তাড়ায়ে দিবি।
যদি মোহ গর্ত্তে টেনে আনে, ধৈর্য্য খোঁটা ধরে রবি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ হেড়ে বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ তবে, জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি।
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূরে রইতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান সিন্ধু মাঝে ডুবাইবি॥
প্রসাদ বলে এমন হলে, কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর! মনের মতন রতন পাবি॥

ছি ছি মন তুই বিষয় লোভা।
কিছু জান না, মান না, শুন না, কথা॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থোবা।
ওরে, জ্ঞান খড়্গে বলি দান করিলে কৈবল্য পাবা॥
কল্যাণকারিণী বিদ্যা, তার বেটার মত লবা।
ওরে, মায়া সূত্র, ভেদ সূত্র, তারে দূরে হাঁকায়ে দেবা॥
আত্মারামের অন্নভোগ, দুটো সেই মাকে দিবা।
রামপ্রসাদ দাসে কয় শেষে, ব্রহ্মরসে মিশাইব॥

বল দেখি ভাই কি হয় মোলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেহ বলে সালোক্য পাবি, কেহ বলে সাযুজ্য মেলে॥
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে।
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মান্য করে সব খেয়ালে॥
এক ঘরেতে বাস করিছে, পঞ্চজনে মিলে জুলে।
সে যে সময় হলে আপনা আপনি, যে যার স্থানে যাবে চলে॥
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই, তাই হবি রে নিদান কালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে।

(তারা) আমি অত খেদে খেদ করি।
তুমি মা থাকিতে আমার, জাগা ঘরে হয় চুরি॥
মনে করি তোমার নাম করি, আবার সময়ে পাশরি।
আমি বুঝেছি পেয়েছি আশয়, জেনেছি তোমার চাতুরি॥
কিছু দিলে না, পেলে না, নিলে না খেলে না, সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে, দিতাম খওয়াইতাম তোমারি।
যশঃ অপযশঃ সুরস কুরস, সকল রস তোমারি।
ওগো রসে থেকে রস ভঙ্গ, কেন কর রসেশ্বরী॥
প্রসাদ বলে মন দিয়াছ, মনেরি আঁকঠারি।
ও মা তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া, মিষ্টি বলে ঘুরে মরি।

মন গরিবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা, যেমনি নাচাও তেমনি নাচে॥
তুমি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, মর্ম্ম কথা বুঝা গেছে।
ওমা, তুমি ক্ষিতি তুমি জল, ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে॥
তুমি শক্তি তুমি ভক্তি তুমিই মুক্তি শিব বলেছে।

ওমা তুমি দুঃখ তুমি সুখ, চণ্ডীতে তা লেখা আছে॥
প্রসাদ বলে কর্ম্ম সূত্র, সে সূতার কাটনা কেটেছে।
মায়া সূত্রে বেঁধে জীব ক্ষেপা ক্ষেপি খেলা খেলিছে॥

আমি কি, দুঃখেরে ডরাই।
ভবে দেও দুঃখ মা আর কত তাই॥
আগে পাছে দুখ চলে মা, যদি কোন খানে যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে, দুঃখ দিয়ে মা বাজার মিলাই॥
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের কৃমি মা গো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী, বোঝা নাবাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে, আমি করি দুঃখের বড়াই॥

মন তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তা চেয়েও দেখলে না॥
ওরে, ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি মন তাও জান না।
মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়ে মন তাঁর করতে চাওরে উপাসনা॥
জগৎকে সাজাচ্ছেন্ যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোণা।
ওরে, কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয়, দিয়ে ছার ডাকের গহনা॥
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে কোন লাজে খাওয়াইতে চাস্ তাঁর, আলোচাল আর বুট ভিজনা॥
ত্রিজগৎ যে মায়ের ছেলে, তাঁর আছে কি পর ভাবনা।
তাঁরে তুষ্ট করতে চাও মন হত্যা করে ছাগল ছানা॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মন্ত্র কেবল রে তাঁর উপাসনা।
তুমি লোক দেখানে করবে পূজা মা ত আমার ঘুষ খাবে না॥